ব্রাহ্মণ্যবাদের সদর দপ্তরে কামান দাগো

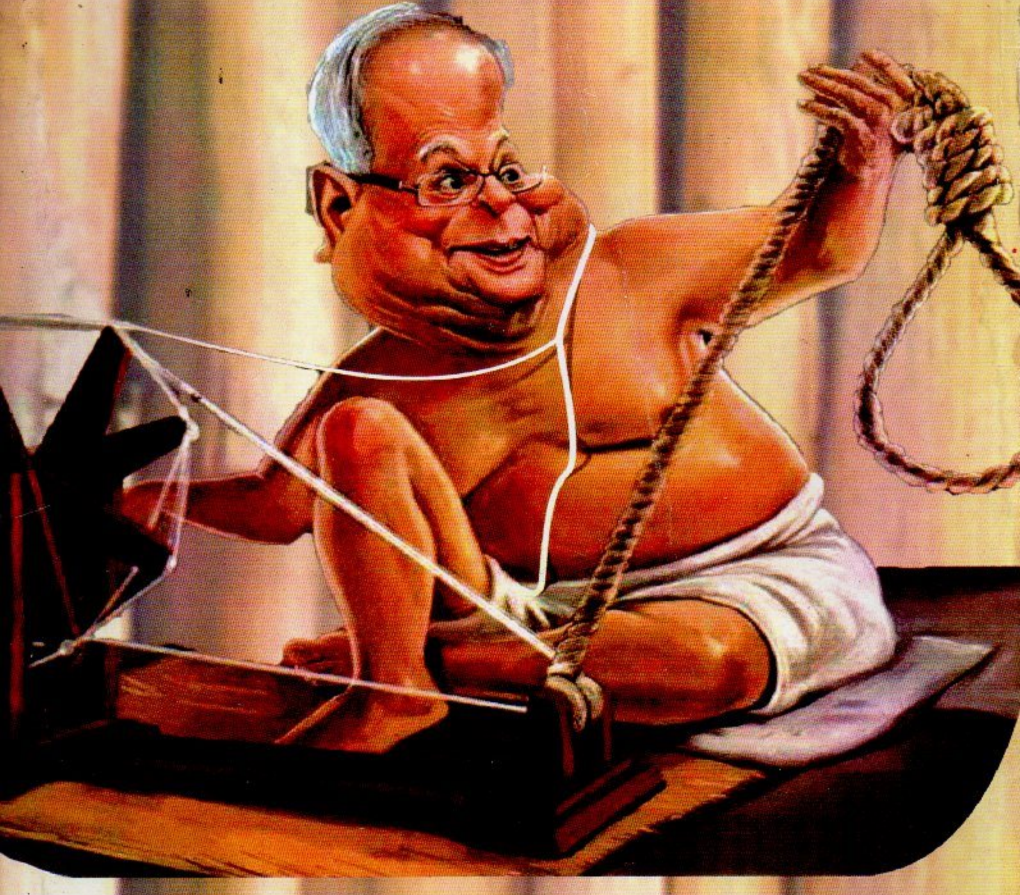

অনন্ত আচার্য

উৎসর্গ

আমার মা (৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৫- ১৩ জুন,২০১৭), আমার বাবা (৩ জানুয়ারি, ১৯১৮- ১৯ অগস্ট, ২০১৭) ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় সংগঠক খোকন মজুমদার @ আবদুল হামিদ (১৯২৯ - ২৯ মে, ২০১৭)- যাঁদের সংগ্রামী জীবনকথা- আমাকে স্বপ্ন হতে দেয়নি।

BRAHMANYABADER SADAR DAPTARE KAMAN DAGO

ব্রাহ্মণ্যবাদের সদর দপ্তরে কামান দাগো

প্রথম এবং শেষ প্রকাশ ঃ ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্বঃ অমল বিমল কমল এবং ইন্দ্রজিৎ
(এই পুস্তকের যে কোনো অংশ প্রয়োজনবোধে যে কেউ ব্যবহার,
মুদ্রণ করার জন্য প্রকাশক ও লেখকের সম্মতির প্রয়োজন নেই)

সংকলক ও প্রকাশকঃ শেখ আমানুল্লা
প্রযত্নেঃ ডাফোড্বাম
৩০/২, এন.পি. রোড
কলকাতাঃ ৭০০০৫৫
dafodwam.dafodwam@gmail.com
Phone: 7044703872

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস ঃ টুটুন মুখার্জী

বিনিময় (মূল্য) — ০ (শূন্য) অথবা অমূল্য কৃত্রিমতাহীন বন্ধুত্ব

পূর্বভাষ
মনোরঞ্জন ব্যাপারী

অনন্ত আচার্যের সাথে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। প্রথম যেদিন ওনাকে দেখি, আর কিছু দেখিনি, দেখেছিলাম তার ফাটা চটা রুক্ষ দুটো পা। ওই পা দেখেই বুঝেছিলাম হাজার মাইল পথ না হাঁটলে পায়ের অবস্থা এমন হতকুচ্ছিত হতে পারে না। বহু পথের ধুলো লেগে আছে ওই পায়ে। বহুবার আঘাতে-ঠোক্করে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে রক্ত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পথ হাঁটতে হয়েছে।

আর সেটাই সত্যি। বহু বছর ধরে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের জন্য অক্লান্ত হেঁটে চলেছেন এক শোষণমুক্ত– জাতপাত ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় মুক্ত এক মানবিক সমাজ গঠনের জন্য। নকশালবাড়ি রক্তে ভেজা পথ থেকে শুরু করে ছত্তিশগড়ের এবরো খে বরো পাহাড়ি পথ বেয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জংগলমহল-নোনাডাঙা ভাঙর-তিলজলা– যেখানে অন্যায় অবিচার অত্যাচার, যেখানে প্রতিবাদ প্রতিরোধ পথে নেমেছে মানুষ– প্রতিটা মানুষের সংগ্রামের নীরবে পথে হেঁটে চলেছেন তিনি।

প্রতিদিন সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার সময় উনি ঘর থেকে বের হন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কোন ঋতুতেই এর কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এই যে মাত্র কয়েকদিন আগে মাথার মধ্যে একটা অপারেশন হল, ডাক্তার বলেছে চিন্তামুক্ত হয়ে বিশ্রামে থাকতে– আজও সেই বিশ্রামে যাবার কথা ভাবছেন না। বাড়ি থেকে বের হবার সময়ে কাঁধে থাকে একটা বড় ভারি ব্যাগ যে ব্যাগে বোঝাই করা থাকে এক গাদা বই। যাদের যাদের উনি মনে করেন এই বই পড়া দরকার, পড়লে কিছু পাবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসেন। সেই যে একজন বলে গেছেন– মেহনতি মানুষ বই পড়ো, ওটা হাতিয়ার। উনি দ্বারে দ্বারে সেই হাতিয়ার জোগান দিচ্ছেন।

যদিও আমাদের মত পথও এক ছিল, একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই গন্তব্যের দিকে হাঁটছিলাম আমরা দুজনেই– কিন্তু একজন এগিয়ে থাকায় একজন সামান্য পিছিয়ে পড়ায় দেখা সাক্ষাৎ হতে পারেনি। দরকার ছিল কারও একটু জোরে হাঁটা বা কারও সামান্য পিছিয়ে আসা। তবেই একসাথে চলা যেতো। জানি না কে এগিয়ে গেলো

আর কে পিছিয়ে ছিলো, তবে শেষ পর্যন্ত দেখা আমাদের হোল বছর পনের ষোল আগে, আর তখন থেকে শুরু হল এক সাথে পথ চলা। দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পার হয়ে এলাম। এমন নয় যে মনোমালিন্য হয়নি– তর্ক বিতর্ক বিরোধ বাধেনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মতান্তর হলেও মনান্তর হয়নি। তাই আমরা আছি এক সাথে এক পথে।

অনন্তদা যেমন গণ আন্দোলনের মিছিলে হাঁটেন সভা সমিতি করেন আবার দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির জগতে আছেন। *‘চেতনা লহর’* নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করে থাকেন, যেটি বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের দলিত জীবনের শোষণ বঞ্চনা প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক রচনায় অনেকের মতে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। *চেতনা লহর* ছাড়াও অনন্তদা অন্য অনেক পত্রিকায় নিয়মিত সামাজিক সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে লিখেছেন। তবে এতদিন তাঁর নিজস্ব কোনও বই ছিল না। অনেক আগেই যেটা হওয়া উচিত ছিল। তেমন কোনও উদ্যোগই নেননি তিনি। কোনও ব্যাপারেই উনি নিজেকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার কখনও কোনও আকুলতা দেখাননি। কলকাতা শহরে যেখানে যত শোষণ শাসন বিরোধী জনগণের নিজস্ব ক্ষমতাকেন্দ্র-প্রতিবাদ আর প্রতিরোধী মানুষের সভা সমাবেশ– তার প্রায় প্রত্যেকটায় অনন্তদাকে পাওয়া যাবে। শত অনুরোধেও মঞ্চে উঠবেন না, মালা গলায় নেবেন না, বক্তৃতা দেবেন না, ফোটো তোলাবেন না। হলের শেষ বেঞ্চিতে বসে খালি নীরব উপস্থিতি রেখে জানিয়ে যাবেন– সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, জাতপাত, পুঁজিবাদ, পুরুষ আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে আমি আছি, আমৃত্যু থাকবো।

আনন্দ সংবাদ এটাই যে– পাঠকের দাবি মেনে এই প্রথম তাঁর একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশিত হতে চলেছে। যার ভূমিকা লেখার ভার সমর্পিত হয়েছে আমার উপর।

ঘটনাচক্রে মাত্র দিন কয়েক আগে এবারে শারদীয়া সংখ্যায়– ‘নতুন পথ, এই সময়’ পত্রিকায় আমার *‘জন্ম রহস্য’* নামে একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছে। যেটা অনন্তদার জীবনের উপর আধারিত। যে জীবনের কথা উনি আমাকে বলেছিলেন। যে জীবনের কথা ওনার নিজের একটা লেখায়ও পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা মহাকাব্যের নায়ক শ্রী কৃষ্ণের জন্মকথা জানি। যার জন্ম হয়েছিল কারাগারের কালো কুঠুরিতে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অনন্তদা-র জীবনেও। কমিউনিস্ট মা বাবার মার্কসবাদে আস্থাশীল সন্তান অনন্ত আচার্যেরও জন্ম হয়েছিল কারাগারের কালো কুঠুরিতে। মা মায়া আচার্য জেল হাসপাতালে জন্ম দেন তাঁর প্রথম সন্তানের। যেন জন্মের মধ্যেই সেদিন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর আগামী জীবন ও কর্ম। যাঁর জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এমন চরম অভিশাপ– বলা

বাহুল্য তাঁর কথা এবং কাজ অনেকের ভালো লাগবে– অনেকের লাগতে পারবে না। যাদের ভালো লাগবে না, তাঁরা নিন্দা কুৎসা বিরূপ সমালোচনার পাথর নিয়ে ঝাঁপাবে। কিন্তু যাঁর পাবার কোনও আকাংখা নেই, হারাবার কোনও আশংকা নেই– মাত্র পথ চলাতেই আনন্দ– পথের দুধারে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে যাওয়ার আনন্দ– নিন্দা মন্দ সমালোচনা তাঁর গতি কি রোধ করতে পারবে?

এই সংকলনে প্রতিটা লেখায় পাওয়া যাবে সেই মানুষটার নিজস্ব দর্শন যা পুঁজিবাদ আর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল জেহাদ নিয়ে সদম্ভে উন্নত। অনন্তদা মনে করেন যে ক্লাশের মধ্যে কাষ্ট আছে, কাষ্টের মধ্যে ক্লাশ আছে। এই দুই গোষ্ঠী-র বিরুদ্ধেই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। যার জন্য ব্যবহার করতে হবে মার্কসবাদ ও আম্বেদকরের চিন্তাধারার। তিনি মনে করেন যে, মার্কসবাদ আর আম্বেদকরের মতবাদের মধ্যে কোনও চিনের প্রাচীর তোলা নেই। ভারতবর্ষে সত্যি করে শোষণমুক্ত জাতপাত বর্ণবাদ পুরুষতন্ত্রমুক্ত সমাজগঠন করতে হলে ওই দুই মহান মানবের দর্শনের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে।

আশা করি এই সংকলনটি পাঠকের বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, ভাবনার একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সমর্থ হবে।

সংকলকের দু-চার কথা

বহুজন-এর চোখের মণি, স্বল্পজন-এর চোখের বালি, এই আমাদের বন্ধু অনন্ত — অনন্ত আচার্য। সেই কতদিন আগে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে শপথ নিয়েছিলাম— বাকি জীবন একসাথে পথ চলবো। আমাদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক ধর্ম, আর্থিক অবস্থার ভিন্নতা থাকলেও কোনোদিন হাত ছাড়িনি। আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল অনন্ত-এর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো দুই মলাটের মধ্যে আটকে রাখা অর্থাৎ একটি বই ছাপানো। ওকে বোললেই উড়িয়ে দিত- ''নিউজ প্রিন্টের দাম বাড়ছে, অপব্যয়ের কোনো মানেই হয় না''। বন্ধু সুতপ (ভট্টাচার্য) মৃত্যুশয্যায় বলেছিল— ''তোর একটা বই দেখে যেতে পারলাম না''। অনন্ত-এর চোখে কি তখন জল দেখেছিলাম? গতবছর (২০১৬) অগস্ট মাসে ব্যাঙ্গালোর থেকে চিকিৎসা করে ফেরার পর ওকে বেশ বিধ্বস্ত লাগছিল। ও বলেছিলঃ- ''ডাক্তাররা যাই বোলুক আমার ওয়ারেন্টি পিরিয়ড পার হয়ে গেছে''। এর আগেও ওকে অন্যমনস্ক বিমর্ষ দেখতাম। সদারসিক সদানন্দ অনন্ত-এর পরিচিত চেহারাটা যেন বদলে যেত। সুতপ ওকে ঠিক মাপতে পারত। একদিন সুতপ আমাদের সকলের সামনে ওকে চেপে ধরল- ''আবার বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিস? জীবনে কতবার বলবি- এট্ টু ব্রুটাস! (ব্রুটাস- তুমিও!) আমি নিশ্চিত- ইউ আর উইলিং টু বি মোস্ট মিসআন্ডারস্টুড পার্সন। যাদের অসুবিধায় পাশে দাঁড়াস তাদের বেশিরভাগই কাজ ফুরোলে গ্লানিবোধে তোকে ছুরি মারে।'' অনন্ত-এর স্বগোতোক্তি- ''হাড় পাঁজরা জমা দিয়ে তো বন্ধুত্ব করি। রাতারাতি ভাঙব কী করে? তবুও বলতে পারি রামের বজ্রবাণ ঠেকিয়েছি কিন্তু বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি সহ্য হয় না।'' আবার ওর লেখাগুলি বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা জানাতে ও বলেছিলঃ- ''ছোটবেলা থেকে ডায়েরি লেখার অভ্যেস আছে। ওটা গত কয়েক বছর যাবৎ আত্মজীবনী আকারে তৈরী করেছি। ওতে এমন সব তথ্য আছে যা অনেক নেতার 'প্যান্ট হলদে' করে দেবে। এমন কিছু রাজনৈতিক নথি আছে যা পুলিশ মহাফেজখ

ানাতেও নেই”। কিন্তু আমরা তো ওর লেখা প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নাটক চাইছিলাম। ও এমন সব শর্ত দিল যা মানা বেশ কঠিন।

১. বই-এর প্রকাশক হবে ডাফোড্বাম (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন ফোরাম অফ দলিতস, ওমেন অ্যান্ড মাইনরিটিস)। ডাফোড্বাম সম্মতি দেবে, ছাপার খরচ দেবে না।

২. ওর লেখাগুলি আজকাল, খেলা, অরিত্র, তিস্তা তোর্সা, কবিমন, সন্ত্রাস, তরাই ডুয়ার্স, হেতুবাদী, জনমন, চয়নপত্র, অন্যমনে এবং সর্বোপরি ওর সম্পাদিত চেতনা লহর থেকে আমাদেরই সংগ্রহ করতে হবে।

৩. বই-এর কোনো গ্রন্থস্বত্ত্ব থাকবে না কারণ স্বত্ত্ব শব্দটির পেছনে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানার ইঙ্গিত থাকে।

৪. বইটি থেকে কোনো দাম বা বিনিময় মূল্য নেওয়া যাবে না। কারণ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে জল, অক্সিজেনের মতো ফুল ও বই-এর কোনো মূল্য নির্দ্ধারিত থাকা উচিত নয়।

সব কঠিন শর্ত মেনে আমরা কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়লাম এক প্রায় অসম্ভব কাজে। ওর রচনার ১/৪ অংশও জোগাড় করতে পারিনি। যা পেয়েছি তাই ছাপিয়ে তুলে দিচ্ছি আমাদের পরিচিত মহলে। ওর আত্মজীবনীর সূচনা পর্ব ছাপিয়েছি। এইটুকু পড়ে ওর যন্ত্রণার কিছুটা ভাগীদার হতে পারলেই আমাদের বন্ধুত্বের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারব।

রচনার কালানুক্রমের প্রতি বিশ্বস্ততা রাখা যায় নি। অনন্তকে সমস্যা জানালে ও নির্দ্বিধ ভঙ্গিতে বলেছিলঃ- “রবীন্দ্রসংগীত শুনলে জানতে চাও নাকি যে কোন্ সালে লেখা হয়েছিল”?

পুনশ্চঃ- পুণ্ডরিকাক্ষ পুরকায়স্থ সহ বিভিন্ন ছদ্মনামে ওর লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ওর কথায়ঃ- পরিবার প্রদত্ত নাম পদবী বারবার ছাপা অক্ষরে দেখা এক ধরণের রোগ। আমরা পরবর্তী সংকলনে ওর অন্য রচনাগুলির সাথে পাঠকদের সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করবো। দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে আমাদের পরিবারের সদস্য মনে করি, তাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবো না।

আত্মজীবনী - সূচনা পর্ব

যিশু-এর শরীরে কতগুলি পেরেক পোঁতা হয়েছিল জানিনা। কিন্তু আমার শরীরে জহ্লাদদের ছোঁড়া সবকটা তিরের ক্ষত এখনও আছে। সব কটা তিরের ডগায় লাগানো ছিল মারাত্মক বিষ। তিরের ফলায় কুৎসা মাখানো ছিল। কী করে কুৎসা সহ্য করে এগোনো যায় তা শিখেছি আমার দুই শিক্ষকের কাছ থেকে। দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম হিরণ্ময় (ঘোষ) দস্তিদার। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা, ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর কাছ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের অ আ ক খ শিখতে গিয়ে ওনার কয়েকটি বাক্য চিরকাল মনে রাখবো— ''যে রাস্তায় হাঁটতে চাইছো সেখানে কাঁটায় ভরা। শীতকালে ঘরের বাইরে বেরোলে ঠাণ্ডা লাগে, গরমকালে ঘাম ঝরে, বর্ষায় ভিজে যাবার কথা। তবুও গৃহবন্দী জীবন ছেড়ে এই পথে চললে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে। মনে রেখো প্রশংসা প্রজাপতির মতো ধীর গতির, কুৎসা বোলতা ভীমরুলের মতো দ্রুতগতির''। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তথ্যচিত্র নির্মাতা সৌমিত্র (ঘোষ) দস্তিদার-র বাবা হিসেবেই হিরন্ময়দার পরিচয়)

এই কুৎসাবাজদের অনেকেই আমার কাছ থেকে তাদের বিপদের দিনে সহায়তা পেয়েছে। এ কথার সমর্থনে বিদ্যাসাগর-এর কোনও উদ্ধৃতি দিচ্ছি না।

১ম শিক্ষক আমার মা—

নিয়তিবাদে বিশ্বাস করি না তবুও আমি নিশ্চিত আমার মরার পরেও আমাকে ঘিরে কুৎসা বা বিতর্ক থাকবেই। ভূমিষ্ঠ হবার আগেও ছিল। মৃত্যু তার ইতি টানতে পারবে না। আমি যখন মাতৃগর্ভে এলাম, মা কে নানাবিধ প্রশ্নর সামনে পড়তে হয়েছিল। কে এই সন্তানের জন্মদাতা ? আমার বাবা রাজনৈতিক কারণে ফেরার। তাঁর দল বে-আইনি ঘোষিত হয়েছিল সেই সময়। বাড়িতে তিনি প্রায় দেড় বছর থাকতে পারেন নি। মার কাছে পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, পুলিশের একই জিজ্ঞাসা— কে এই সন্তানের জন্মদাতা ? মা-এর কাছে দুটি জবাব দেওয়ার মতো ছিল—

১. কোনও গোপন আশ্রয়স্থলে বাবা মা মিলিত হয়েছিলেন।

২. ইন্দ্রিয় সুখের টানে মা কোনো এক 'পরপুরুষ'-এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

মা-এর নীরব থাকায় সন্দেহ কুৎসা দ্রুত ছড়াতে লাগল। মা-এর বাবা জলপাইগুড়ির ব্রিটিশ চা বাগানের ম্যানেজার, দু-হাতে রোজগার। গর্ভবতী কন্যার প্রতি অনাদর তিনি সহ্য করতে না পেরে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মা রাজী হয় নি। আমার ছোট মামার ছাত্র সমরেশদা (সমরেশ মজুমদার - সাহিত্যিক) এ ঘটনা শুনেছিলেন। কালবেলার মাধবীলতা তো আমার মায়ের ছায়া। না-না, মাধবীলতা তো ৭-এর দশকের চরিত্র। মাধবীলতাকেও মার মতো যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। এক যুবতী শুধুমাত্র হিরণ্ময় নীরবতার দেওয়াল তুলে রুখে দিয়েছিল সমস্ত চিৎকৃত কুৎসাকে। কিছুদিন বাদে বাবা গ্রেফ্তার হলো। জেলখানা থেকে সিগারেটের বাক্সর মধ্যে তাঁর মার কাছে চিঠি লিখলোঃ– ''মা, তুমি ঠাকুমা হতে যাচ্ছ। তোমার বউমার দিকে নজর দিও। বাজে কথায় কান দিও না''। জেল থেকে মা-এর কাছে আর একটা চিঠি এলো। তখন মহিলা সমিতি প্রায়শঃই রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির দাবিতে আইন অমান্য করতো। এরকম এক মিছিলে পূর্ণ গর্ভবতী মা সামিল হলো। পুলিশ গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি জেলের উঠোনে সবাইকে নিয়ে গেল। রেণু চক্রবর্তী, অলকা চট্টোপাধ্যায়, গীতা মুখার্জী, ইলা মিত্র, বিদ্যা মুন্সী দের অবাক করে মা আইনি কাগজে (বন্ড) সই না করে জেলের ভিতরে চলে গেল। ১৯৪৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর লেডি ডাফরিন হাসপাতালে পুলিশী পাহারায় আমি জন্মালাম। হ্যামলেট, কৃষ্ণ নাকি জেলে জন্মেছিল, জানি না। কিছুদিন বাদে মা আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাবাও তার কয়েকমাস বাদে। অভাবের সংসার, বাড়িতে একসময় খাদকের সংখ্যা ১২। অনিয়মিত রোজগারে বাবার পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠল। বাবার হিসাব নিকাশ-এ পাকা হাত ছিল। শোনা যায় এক সাথে টাকা, আনা পাই-এর লম্বা লম্বা যোগ করতে পারত। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে আধ সের দুধ আসতো। ওটা আমার ঠাকুরদার জন্য বরাদ্দ ছিল। অথচ আমার এক ছোট ভাই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ঠাকুরদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কয়েক বছর কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। চেহারা মানুষের মত অথচ কোনো মানবিক আচরণ নেই— এরকম একজনকেই পেয়েছিলাম আমার ঠাকুরদার মধ্যে। আমার বারো বছর বয়সে আর এক অঘটন ঘটলো। আমার এক মামা লণ্ডনে থাকতেন, তিনি আমাকে তাঁর সাথে লণ্ডনে নিয়ে গেলেন। ওখানে ভর্তি হলাম একটি স্কুলে যার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় সবই এশিয়ান, শিক্ষকরা সাদা এবং বর্ণ-বিদ্বেষী। মামার সাথে এক বড় বাড়ির বেসমেন্টে থাকতাম। মামার এক শ্বেতাঙ্গ

বান্ধবী হঠাৎ হঠাৎ চলে আসতেন। আমাকে ঘরের বাইরে ঠাণ্ডায় দুঘণ্টা বসিয়ে রেখে ওঁরা প্রেম করতেন। ওঁরা দুবছর বাদে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমাকে দেশে ফিরতে হলো। লণ্ডনের স্কুলে খেলাধুলোকে আবশ্যিক করাতে এখানে এসে চুটিয়ে ফুটবল ক্রিকেট খেলতে শুরু করলাম। জেলা স্কুলের দলে ফুটবল ক্রিকেট দুটিতেই নির্বাচিত। প্রেমপত্র পাওয়া শুরু হলো। একটিতে লেখা ছিল— ভালবাসি কারণ তুমি ইংরিজী আবৃত্তি লেখো। পরীক্ষায় সব বিষয়ে ভালো নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও বাংলায় কোনরকমে পাশ করতাম। বাড়িতে অভাবের সংসারে মাঝেমধ্যে বাবার এক বন্ধুকে আসতে এবং দশ-পনেরো দিনের জন্য থাকতে দেখতাম। ঠাকুমার ঘরে মেঝেতে মাদুর পেতে শুতেন। অদ্ভুত আচরণ— আমাদের প্রায় বস্তি বাড়ির বারো ঘর এক উঠোনে দুটি মাত্র পায়খানা এবং কুয়ো ঘেরা স্নান ঘর। ঐ ভদ্রলোক শেষরাতে উঠে প্রাতঃকৃত্য-স্নান সেরে নিতেন। মাকে ওনার পরিচয় জানতে চাইলে বকা খেতাম। ভদ্রলোক চলে যাবার পর একদিন ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করি— ঐ ভদ্রলোক কে? ফিসফিস করে ঠাকুমার উত্তর— ও তো স্বদেশী। আমাদের ভাই-বোনদের প্রশ্ন— এখন আবার কীসের স্বদেশী? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। ঠাকুমাঃ— স্বাধীন হইছে না ছাই হইছে। তগো মুখে দুধ জোটে না। আমার গোপালের জন্য তর বাপ ক্যাবল গুজিয়া নিয়া আসে। স্বাধীনতা না ছাগলের মূত।

যে মাঠে খেলি সেই ক্লাবের ডাকে সকলে মিলে মোহনবাগান মাঠে যেতে হয়েছিল। ওখানে কী কারণে যেন প্রফুল্ল সেনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। বদলে ক্লাবকে কিছু সরকারি অনুদান দেবে। সেদিন হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি। পাঁঠা ভেজা ভিজে, সারাদিন কিছুই না খেয়ে বাড়ি ফিরে বাবার হাতে জীবনের প্রথম এবং শেষবার পিটুনি খেলাম। আমার বস্তুবাদের প্রতি আগ্রহের পিছনে বাবার কিছু রাজনৈতিক বই-এর ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমার ঠাকুরদার কাছে মনুস্মৃতি, বেদ, গীতা, উপনিষদ-এর ইংরাজী ভাষায় মূল্যায়নের কিছু বইও ছিল। তা পড়ে বুঝলাম আমার পক্ষে ব্রাহ্মণ তো নয়ই হিন্দু হয়ে থাকাটাই অসম্ভব। নানারকম ছেলেমানুষী শুরু করলাম। মজা করে বন্ধুদের বলতাম— হাফ প্যান্ট আর ব্রাহ্মণত্ব একসাথে ত্যাগ করলাম। বন্ধু স্বপন-এর সাথে গোমাংস খেতাম। বন্ধু ডোম ঘনঘনাইয়ার মা-এর হাতে সুস্বাদু শুয়োরের মাংস খেতাম। একদিন স্থানীয় কালী মন্দিরের মালিক পুরোহিত গণেশ কাকা বিষণ্ণ মুখে জানালেন— 'মন্দিরটা পুরনো হয়ে গেছে। পেছনে অনেক গর্ত হয়ে গেছে। ইঁদুরের উপদ্রব। মা-এর চুল ইঁদুরে খেয়ে নিচ্ছে'। আমার চটজলদি উত্তরঃ- 'আপনার মা এতগুলো মানুষ মেরে তাঁদের মুণ্ডুগুলো গলায় ঝোলাতে পেরেছে আর ইঁদুর মারতে পারছে না? সেলুন থেকে ডাকুদাকে ডেকে আপনার 'মা'এর চুল কেটে দিন। সপ্তপদীর

রিনা ব্রাউন (সুচিত্রা সেন)-এর মতো লাগবে’। গণেশ কাকা আমার পুরনো ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন— এসব বলবি তো, বেজন্মা কোথাকার!

পরে বহুবার বহু জায়গায় বলতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে জানিয়েছি— হিন্দু হতে গেলে হয় ঘৃণক বা ঘৃণিত হতে হয়। এই বাক্যটার কোনো পেটেন্ট রাইট নেই তাই যখন শুনি ইদানীং আমাদের এক প্রিয় শিক্ষক বিভিন্ন সভায় এই বাক্যটি লোকজনকে বলছেন তখন খুশীই হই। যত লোক জানে তত ভালো।

কোনো এক হঠাৎ বৃষ্টির দিনে স্কুলে ‘রেইনি ডে’র ছুটি হয়েছে। পাড়ার সব পুকুর ভর্তি হয়ে রাস্তায়, নালায় জল ভর্তি। কেউ একজন নালায় মাছ ধরার জন্য ‘খেচি’ পেতেছে। সেই ‘খেচি’ তে দুটো সাপ আটকে পড়েছে। আমরা সাপ দুটোকে বের করে একটা মাইলো-র ব্যাগে পুরে নিলাম। তখন পি.এল. ৪৮০’র কল্যাণে এদেশে মাইলো আসছে। লোকে ছড়ায় বলত—

ঘোড়ায় নাকি মাইলো খায়
খাক না তাকে ক্ষতি কী
প্রফুল্ল সেনের রাজত্বে দাদা
ঘোড়ায় মানুষে তফাৎ কী?

বন্ধু গৌর একটি পরিকল্পনা করলো এবং সেই অনুযায়ী কাজও করলাম। সেদিন দু-তিন মাইল দূরে একটা মাঠে জনসভা ছিল। বক্তা প্রফুল্ল সেন। পুরনো অপরাধের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ করতে হবে। বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রা কমে গিয়েছিল। দুজনে চাদর জড়িয়ে ব্যাগে ভর্তি দুটো সাপ নিয়ে ঐ জনসভায় গেলাম। মাঝেমধ্যে দেখতাম সাপ দুটো বেঁচে আছে কিনা। নেহাতই হেলে সাপ। সভা শুরু হলো। প্রফুল্ল সেন ভাষণ শুরু করলেন। আমরা চাদরের মধ্যে থেকে ব্যাগটা কিছুটা বের করে হেলে সাপ দুটোকে ছেড়ে দিলাম। সাপ দুটো দুর্বল ছিল। আমরাও সভায় দর্শদের পেছেন দিকে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরই মঞ্চের সামনে থেকে বেশ কয়েকজনের চিৎকার— সাপ-সাপ-মর গিয়া ম্যায়। বাঁচাও বাঁচাও। সভা বাতিল হলো। পরিকল্পনা সফল। আনন্দ সহকারে পাড়ায় ফিরলাম। পরের দিন বাজারে কার্তিক কাকুর বক্তৃতা শুনলামঃ- ‘‘প্রফুল্ল দার বুকের সামনে কেউটে সাপটা ফণা তুলতে ছোবল মারতে আসছিল। আমি বললাম— আমাকে না মেরে তুই প্রফুল্ল দাকে কাটতে পারবি না’’। যেভাবেই হোক কদিনের মধ্যে জানাজানি হলো যে একাজ কারা করেছে। মাঠ থেকে খেলে ফিরছি। এলাকার দুই কুখ্যাত গুণ্ডা ডাকলো। কাঁপতে কাঁপতে সামনে গেলাম। সজোরে একটা থাপ্পড় মারল। বাঁ কান থেকে রক্ত পড়তে শুরু করলো। অনেকদিন ব্যথা ছিল। মাঝে একদিন কমরেড

গোপাল দা ডেকে বললেন— মহামতি লেনিন তোমাদের এই ধরনের কাজকম্মো সম্পর্কে একটা বই লিখেছেন তার নাম ইন ফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার। আমি লেনিনের নাম শুনেছি মাত্র। ঐ বই পড়িনি। তবুও আমিও নাছোড়বান্দা। আমি .... disorder is order of the day ...উদ্ধৃতিটা শুনিয়ে দিলাম। মহামতি লেনিন-এর ঐ ছাত্র গোপাল দা পরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারপার্সন হয়েছিলেন এবং জনশ্রুতি কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। কয়েকদিন বাদে আর এক কমরেড নিতাই কাকু তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যায় যেতে বললেন। সেখানে অনেক লোকজন ছিল। কম্ গোপাল দা ছিলেন তেমনই আমাদের ঠাকুমার ভাষায় স্বদেশী ভদ্রলোকও (পরে শুনেছি ওনার নাম শান্তি ঘটক)। ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন— ‘তোমার মা কি এখন লাউ চিংড়ি রাঁধেন? দুবার খেয়েছি। এখনো মুখে লেগে রয়েছে’। গোপাল দাকে দেখে মাথা এমনিতেই গরম ছিল। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম- কেন ডেকেছেন? উনি বললেনঃ- ‘তোমাদের সাপ নিয়ে মজা করার কথা শুনলাম। এও শুনলাম যে মার খেয়েছে। তোমার বাবা আমার কমরেড, একসাথে জেল খেটেছি, তোমাদের বাড়িতে বহুদিন কাটিয়েছি। তোমার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা যায়। তোমার বাবা-মা কেমন আছেন? তোমার মা-এর মতন মহিলা আমাদের সমাজে দুর্লভ’। আমার উত্তরঃ- ‘আমার কথা ছাড়ুন। এখানে মহামতি লেনিন-এর একমাত্র ছাত্র কম্ গোবিন্দ দা আছেন। তিনি আমাদের কাজকে ছেলেমানুষী বলেছেন। ওনাকে একটু বইপত্তর পড়তে দিন। বোধবুদ্ধির অভাব আপনাদের দলে অনেকেরই আছে। আমি চললাম’।

দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে ভূদেব সেন নামে এক ছাত্র পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। পরদিন সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার পাঁড় কংগ্রেসী। স্কুলের বাইরে ছাত্র-যুব নেতারা স্লোগান দিচ্ছেন— বন্ধুগণ, বেরিয়ে আসুন। হেড স্যারের প্ররোচনায় উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা উত্তরে বলছেঃ- বেরবো না, বেরবো না। সেদিন আমার একটা ফাইনাল ম্যাচ খেলার কথা ছিল। ছুটি বা বন্ধ হলে ভালোই হয়। দারোয়ান মঘা দাকে কাছাকাছি দেখছি না। আমি মঘাদার ঘর থেকে হাতুড়ি বের করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম আর দৌড়ে প্রস্রাবখানায় ঢুকে পড়লাম। নীচের ক্লাসের ছেলেরা, যারা গেটের কাছে ভীড় করেছিল তারা বীরবিক্রমে গেট ভেঙ্গে দিল। বন্ধ সফল হলো। আমি ফাইনাল ম্যাচ খেলতে চলে গেলাম। দুটো গোল করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হলাম।

খাদ্য আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিগর্ভ। নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। আমরা বাস পোড়ানোর কাজে নামলাম। কয়েকটা পোড়ানোর পর পুলিশের হাতে ধরাও পড়লাম। থানায় হাতে পায়ে লাঠির মার শেষই হয় না।

পরদিন কোর্টে দেখলাম পাড়ার বন্ধুরা এসেছে। বয়স্ক কয়েকজন এসেছেন। কোনো কমরেড আসেনি। দিন দশেক বাদে জেলা আদালত থেকে জামিন পেলাম, পাড়ায় বীরের সম্মান পেলাম। কমরেডরা ইনফ্যান্টাইল ডিসঅরডার বলে যেতে লাগলো। ছাত্র সংগঠনের একটি ঘরোয়া সভায় এসব নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হলো। একদিকে ছাত্র নেতারা আর একদিকে আমাদের মতো নবাগত। ছাত্র সংগঠনকে দলের তরফ থেকে যে পার্টি নেতা দেখভাল করতেন সেই কম্ অমিয় দা তীব্র ভাষায় আমাদের কাজকর্মকে সমালোচনা করতে শুরু করলেন। কম্ অমিয় দা যখন বিতর্ককে খেউড়-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চলেছিলেন তখন উপস্থিত ৩৭জন ছাত্রের মধ্যে ২৫ জন আপত্তি করলাম এবং মিটিং-এ 'মিনিটস'-এ সবিস্তারে লিখতে বললাম, তখন আমাকে লক্ষ্য করে কম্ অমিয়দার কথা— 'দ্যাখো, জাহাজের খালাসীরাও বিদেশে যায়, বিদেশে গেলে মাথায় পাঁচটা শিং গজায় না। আমি আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে জর্জিয়া যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। জন্ডিস হওয়াতে যেতে পারিনি। পড়াশুনা বা খেলাধুলাতে পারদর্শিতার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আর তাছাড়া তোমার জন্মরহস্যও এখনো তদন্তের অপেক্ষা রাখে। তোমার বাবা যদিও এখন দলের সদস্য নয় তবুও তিনি বি.টি. রণদিভে-এর ভুলকে ভুল বলে মানতে রাজী নন। তোমার ডি. এন.এ. পরীক্ষা করলে কিন্তু নূতন কাহিনী বেরিয়ে আসবে। তারপর কি তুমি লোকজনের সামনে মুখ দেখাতে পারবে'? আমরা সকলে বিস্মিত। দলের এক বয়স্ক নেতার মুখে এতো নিম্নরুচির কথা!

মনে আছে মার কাছে শুনেছিলাম আমার ছোটবেলায় পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা তার বোনকে নিয়ে আমাকে দেখতে এসে বলেছিলেন— ''একেবারে মার মত মুখ। বাবার মতো কিছুই পাই নি''। একথা বলে তাঁরা মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন।

সিদ্ধান্ত নিলাম ছাত্র সংগঠনের কাজ করবো তা স্থানীয় ভাবে নয়। ইতিমধ্যে আমার লণ্ডনের মামা কয়েকদিনের জন্য সস্ত্রীক দেশে এসেছেন। আমার সাথে দেখা হলো। উনি লন্ডনে বামপন্থী সংগঠন ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে রোজা লুক্সেমবার্গ, গ্রামশি সম্পর্কে কিছু জানলাম। হিরণ্ময় ঘোষ (দস্তিদারের) কাছ থেকে বেশ কিছু মার্কসবাদীদের অবশ্য পাঠ্য বই পড়ে নিয়েছি, ফলে একটু 'ল্যাজমোটা' হয়েছে। কলেজ ইলেকশনের প্রচারে বলার সময় গ্রামশি, রোজার কথা বলছি। 'পেছন পাকা'র মতো আচরণ আর কি। কদিন বাদে এক ছাত্র নেতা বললেনঃ- ''লক্ষণ ভট্টাচার্য তোমার সাথে কথা বলতে চান। উনি বরাহনগর তথা

সারা জেলার বর্ষীয়ান নেতা। কিন্তু আমাকে তলব কেন? আমি তো তাঁকে চিনিই না। একদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গেলাম। বাড়ির উঠোনে দেখলাম এক ভদ্রলোক খালি গায়ে একটা পাজামা পরে দাঁত মাজছেন, গলায় মোটা পৈতে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ- ‘‘আমাকে কমঃ লক্ষণ ভট্টাচার্য দেখা করতে বলেছেন’’। আমাকে চূড়ান্ত বিস্মিত করে মোটা পৈতে পরা লোকটি বললেনঃ- ‘‘আমিই লক্ষণ ভট্টাচার্য। তুমি কে হে?’’ আমার কথাঃ- ‘‘না - মানে - আপনি আমাকে স্বদেশদার মাধ্যমে ডেকেছিলেন’’। লক্ষণঃ- ‘‘তুমি নাকি কলেজে লেকচারে গ্রামচি শহরচি, রোজা না মোজা কীসব বলছ। এরা কারা’’?

আমিঃ— এদের নাম শোনেন নি?

লক্ষ্মণ ঃ- না, না। দরকার কী? রোজা তো মুসলমানদের ব্যাপার। —

আমিঃ- গ্রামশি ইতালীর বিখ্যাত কমিউনিস্ট। ওনার *প্রিজন নোটবুক*-এর কথা সকলের জানা উচিত। রোজা - জার্মানীর স্পার্টাক্যুশ দলের নেতা। মাস পার্টি না ভ্যানগার্ড পার্টি এ নিয়ে তাঁর সাথে লেনিনের সুস্থ বিতর্ক পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল।

লক্ষণঃ- তোমাকে বাপু এখানে রাখতে পারবো না। তুমি বরং দিল্লীতে গিয়ে পার্টির ইংরাজী তাত্ত্বিক পত্রিকার দায়িত্ব নাও। আমাদের মতো অশিক্ষিতদের সাথে তোমার পটবে না।

আমিঃ- আপনার মতো লোকজন তো দলের স্তরে স্তরে।

এরপর সিদ্ধান্তে এলাম মার্কসবাদে দ্বিধাহীন আস্থা রেখে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবো। যারা গান্ধি-নেহেরু-শ্যামাপ্রসাদ-ডাঙ্গে-জ্যোতি বসুদের দেখে রাজনীতিতে এসেছে তারা তাদের কু-কাজ চালিয়ে যাক। আমি খাদ্য আন্দোলনের শহীদ নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত-এর রক্ত দেখে পথ চলব। কুৎসা, কাজে বাধা, ষড়যন্ত্র সবই যুগে যুগে ছিল, আছে, থাকবে। কোনও অভিযোগ যদি তথ্যপ্রমাণ যুক্ত হয় তবে তা সমালোচনা। যদি তা তথ্যপ্রমাণ সহ না হয় তবে সে অভিযোগ কুৎসা ছাড়া কিছুই নয়। রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে কোনও মতভেদ হলে তা আদর্শভিত্তিক বিতর্ক সাধারণত হয় না। পরিবর্তে এক পক্ষ অপর পক্ষকে তা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হোক না কেন, বিনা দ্বিধায় 3 W এবং রাষ্ট্রের চর আখ্যা দেয়। 3 W মানে Wine Women Wealth। অর্থাৎ তুমি বা তোমরা কেবলমাত্র সরকারি গুপ্তচর নয়, একইসাথে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র এবং অনৈতিক অর্থসংগ

অনাহার অপমানের কারণ জানলে বিপ্লবের প্রথম পাঠ হয়ে যায় - খোকন মজুমদার

অনন্ত আচার্য ঃ সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে নক্সালবাড়ি আন্দোলনের বিষয় নিয়ে ইংরাজিতে ১৫০০-র বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সহ আঞ্চলিক ভাষায় এই বিষয়ে কয়েক লক্ষ ম্যাগাজিন, বই প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েক'শ গবেষক এই আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন, করছেন। আপনার নাম বারবার এসেছে। এমনকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *পূর্ব পশ্চিম* উপন্যাসে আপনার নাম পাওয়া যায়। আপনি নিজে *বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ* লিখেছেন যা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আপনার প্রাক-রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানতে অনেকেই আগ্রহী যা কোথায়ও ছাপা অক্ষরে পাওয়া যায় না।

খোকন মজুমদার ঃ দেশের হাজার হাজার গরিবগুর্বোরা যেভাবে বেঁচে থাকে তেমনই টিকে ছিলাম।

অনন্ত আচার্য ঃ আবদুল হামিদ থেকে খোকন মজুমদার হয়ে ওঠার কাহিনী অনেকের জানা নেই।

খোকন মজুমদার ঃ বলতে পারি তবে তা আমি বেঁচে থাকতে ছাপা যাবে না। কথা দিতে হবে।

অনন্ত আচার্য ঃ আপনি কবে মারা যাবেন সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করা তো কঠিন কাজ।

খোকন মজুমদার ঃ তাহলে বাদ দ্যাও।

অনন্ত আচার্য ঃ ঠিক আছে কথা দিলাম, শুরু করুন।

খোকন মজুমদার ঃ বরিশালের উজিরপুরের এক অজ গ্রামে আমার জন্ম। সাল ঠিক

মনে নেই। সাল ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০ বা ১৯৩১-এর মধ্যে যে কোনও একটা হতে পারে। আমার যখন ৮ বছর বয়স তখন আমাদের গ্রামের একমাত্র স্কুলে (মক্তব) ক্লাস ওয়ানে পড়ছি। আমার বাবা মারা যান। তিনি টিবি রোগী ছিলেন। বিড়ি বেঁধে আমাদের ভাত জুটতো। বহুদিন না খেয়ে দিন গেছে। দুই সন্তান সহ এক বিপত্নিক ব্যক্তির সাথে আমার মার বিয়ে হয়। ও লোকটি সুবিধার লোক ছিল না। আমরা বিড়ি বেঁধে বা মাঠে 'জন' খেটে যা রোজগার করতাম উনি তা কেড়ে নিতেন। আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন 'ব্যাগার খাটা' নামে একরকম ব্যবস্থা ছিল যা আমার খুব পছন্দ ছিল। মজুরি দিত না বটে তবে একবেলা গরম ভাত, সাথে তরকারি, লংকা, আচার জুটতো। 'জন' খাটার চেয়ে ওই কাজে আমার বেশি আগ্রহ ছিল। টাকা হাতে না পাওয়াতে আমার নতুন বাবা আমাকে একদিন খুব মারলেন। পরের দিন মাকে বলে কলকাতা পালিয়ে এলাম। তখন আমার ভালো ক'রে গোঁফ গজায়নি। শিয়ালদহ স্টেশনে চেকার ধরল। কান্নাকাটি করায় একজন চেকারবাবু শিয়ালদহ'র কাছে একটা বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে চাকরের কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেখানেও নানা যন্ত্রণা। ছাদে পায়রাদের খাঁচার পাশে একটু মাথা ঢাকা যায় এমন একটা জায়গায় আমাকে থাকতে দিত। আমি মুসলমান বলে কলাপাতায় ভাত, ডাল, সবজি উপর থেকে ঢেলে দিত। মারধোর প্রায় জুটতো। ঐ পাড়ায় আর এক বাড়ির চাকর সিকান্দরের সাথে আলাপ হল। ও আমার মতোই কানমলা, জুতাপেটা খেতো। তবে ও আমার মতো ভোদাই ছিল না। চালাকচতুর ছিল। কয়েক ক্লাস পড়াশুনাও করেছিল। ও একদিন প্ল্যান করে আমাকে জানায় যে, ওই দুই পরিবারের ঘরের সব থালাগ্লাস চুরি ক'রে পালালে ওই দুই পরিবারের লোকজনকে অন্তত একবেলা কলাপাতায় খেতে হবে। আমরা তাই করলাম। ইচ্ছা ক'বলে অন্য দামী জিনিষ নিতে পারতাম। শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে একটি চোরাই মাল কেনাবেচার দোকানে বাসনপত্র বেচে দক্ষিণ কলকাতার দিকে হাঁটা লাগালাম। হাতে টাকা ছিল। একটা দোকানে ঢুকে

মাংস ভাত খেলাম। অন্য দোকান থেকে মিষ্টিও খেলাম। এসব বহুদিন পেটে পড়েনি। এরপর লেকের ধারে একটা বাড়ি তৈরির কাজে আমরা দু'জনে হেল্পারের কাজে লেগে পড়লাম। ওখানে কয়েকজন ডাক্তারের সাথে আলাপ হল, যারা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ছিলেন। আমার লেখা বইতে এঁদের মধ্যে একজনের নাম বাদ পড়ে গেছে তিনি হলেন, ডঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত (সতুবদ্যি)। কমিউনিস্ট পার্টি যখন বেআইনি সেই সময় টালিগঞ্জে একটা পুলিশ ভ্যানে বোমা মারতে গিয়ে ধরা পড়লাম। স্নেহাংশু আচার্য আমার উকিল ছিলেন। হাকিম আমাকে কলকাতার বাইরে থাকার অর্ডার দিয়ে জামিন দিলেন। আমি আর সিকান্দার কলকাতা ছেড়ে পার্টির চিঠি নিয়ে উত্তরবঙ্গে এলাম। ব্যাস— এরপর যা জানতে চাও আমার বইতে পাবে।

অনন্ত আচার্য ঃ কলকাতা শহরের দেওয়ালে লেখা হত, 'যে যত পড়ে সে তত মুর্খ হয়'। এর সাথে নাকি আপনাদের সাথে মাও সে তুং-এর কথা বিনিময়ের যোগসূত্র আছে?

খোকন মজুমদার ঃ ওইসব লেখা, মূর্তি ভাঙ্গা, স্কুল পোড়ানো এসব কলকাতার কিছু চ্যাংড়া'র (উত্তরবঙ্গে চ্যাংড়া শব্দটি বালক-কিশোরদের বলা হয়) কাজ। সারা দেশে অন্য কোথাও ঘটেনি। তার আগে একটা কথা বলি। ইংরাজিতে বলব। ভুল হলে ঠিক করে নেবে। এডুকেশন ক্যান ওয়েট, স্বরাজ ক্যান নট (শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বাধীনতা পারে না)— এই কথা গান্ধী বলেছিলেন তবুও তিনি মহাত্মা আর এডুকেশন ক্যান ওয়েট রেভলিউশন ক্যান নট (শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, বিপ্লব নয়) বলে চারুদা দূরাত্মা হয়ে গেলেন। অদ্ভুত ব্যাপার তো।

অনন্ত আচার্য ঃ জানতে চাইছি এই কথাগুলির সাথে আপনাদের সাথে মাও সে তুং-এর বাক্যালাপের যোগসূত্র কী?

খোকন মজুমদার ঃ চিনে থাকাকালীন একদিন আমাদের মাও সে তুং-এর সাথে ডিনারের নেমন্তন্ন হল। আমরা তো আনন্দে লাফাচ্ছি। খাবার টেবিলে নানা কথার পরে মাও সে তুং আমাদের কে কতদূর

পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি তা জানতে চান। কানুবাবু (সান্যাল) বললেন যে, তিনি আইএসসি পাশ। দীপক জানালো ও বি এ পাশ, আমি শুকনো মুখে বললাম, আমি এক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি। খুদন (মল্লিক) বলল, আমাদের ঘরের দশ মাইলের মধ্যে কোনও স্কুল ছিল না। স্কুলে ভর্তিই হতে পারিনি। তখন মাও সে তুং বলেছিলেনঃ- ''আমাদের দেশেও বিপ্লবের আগে শহরগুলিতে অনেক পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে কৃষক ও শ্রমিকরা তারাও তোমাদের দু'জনের মতো স্কুলে পড়বার সুযোগ পায়নি''। মাও সে তুং-এর এই কথা পাল্টাতে পাল্টাতে কলকাতার চ্যাংড়াদের কাছে ওইভাবে পৌঁছয়। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-র একটা বইয়ে পড়লাম যে মার্কস কোনওদিনই বলেননি যে, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি মার্কসবাদী নই।

অনন্ত আচার্য ঃ আপনার সাধের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এখন ভাঁটার যুগ। বাম দলগুলি বহু বিভক্ত। আপনার কি মনে হয় না যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার দলের বাইরে কোনও অনুরাগীর বাড়িতে থেকে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন।

খোকন মজুমদার ঃ শুনছি মঙ্গলগ্রহে মানুষ যাচ্ছে এবং সেখানে বসবাস করা যাবে। তোমাকে যদি দশ কুইন্টাল চাল আর ২ ডজন খাসি ধরিয়ে দিয়ে কেউ বলে যে আপনি মঙ্গলগ্রহে থাকুন, তুমি কি যাবে?

অনন্ত আচার্য ঃ নতুন প্রজন্মের কাছে আপনার কী উপদেশ দিতে চান?

খোকন মজুমদারের শেষ সাক্ষাৎকার - ১.১.২০১৭

তিস্তা তোর্সা - শরৎ সংখ্যা '১৭

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতা- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ঃ আগেই বলে রাখি যে কোনও রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেবো না।

অনন্ত আচার্য ঃ কিন্তু আমাদের পত্রিকা তো ফিল্ম ম্যাগাজিন নয় যে গসিপ দিয়ে ভর্তি করব।

সৌমিত্র ঃ তা হলে কিছু করার নেই। দীপা (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনসঙ্গিনী) খাবার তৈরি করছে। খেয়ে কেটে পড়্।

অনন্ত ঃ এখন ক'টা ছবির কাজে জড়িয়ে আছেন?

সৌমিত্র ঃ গোটা ছয়েক তো বটেই।

অনন্ত ঃ আপনাদের পরের প্রজন্মের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে কাকে যোগ্য ব'লে মনে হয়।

সৌমিত্র ঃ অনেকেই। নাম বলি আর যাদের নাম ব'লব না তাদের গালাগালি খাই আর কি!

অনন্ত ঃ উত্তমকুমার-এর সাথে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

সৌমিত্র ঃ বহুবার বহু জায়গায় বলেছি। জ্বালাস না তো?

অনন্ত ঃ টেকনিশিয়ানদের আন্দোলনের সময় তো সম্পর্ক তিক্ত ছিল।

সৌমিত্র ঃ মোটেই না। ঘটনাচক্রে উত্তমদা স্টুডিও মালিকদের পক্ষে ছিলেন আমি আর আরও বেশ কয়েকজন টেকনিশিয়ানদের পক্ষে ছিলাম। ভানুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাদের নেতা ছিলেন। আর তোরা ছাত্ররা মিলে একটা কনভেনশন করেছিলিস– সেখানে গিয়েছিলাম।

অনন্ত ঃ সেখানে তো আপনি নাম না করেও উত্তমকুমারের সমালোচনা করেছিলেন।

সৌমিত্র ঃ (গম্ভীর) পরের প্রশ্নে যা।

অনন্ত ঃ আপনার কবিতা রচনায় আগ্রহের কথা সবাই জানে। এর পেছনে রহস্য

কী?

সৌমিত্র ঃ কফি হাউসের আড্ডা, এক্ষণ পত্রিকা। বেশ কয়েকজন কবিবন্ধু থাকাতে মনে হল কবিতা লেখার চেষ্টা করলে কেমন হয়, চেষ্টা করলাম। কী দাঁড়াচ্ছে জানি না।

অনন্ত ঃ রবীন্দ্রোত্তর যুগে কবি জগতে পছন্দের ৩জন কবির নাম বলবেন?

সৌমিত্র ঃ ১) সমর সেন, ২) জীবনানন্দ দাশ, ৩) বিনয় মজুমদার।

অনন্ত ঃ কী আশ্চর্য, বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল-শক্তি বাদ।

সৌমিত্র ঃ প্রথম ৩জন বলেছিলি তো? ওনারা পরে আসবে।

অনন্ত ঃ সামাজিক সমস্যা নিয়ে আপনি কখনও আলোড়িত থাকেন না?

সৌমিত্র ঃ আবার নিজের লাইনে ঢুকছিস। শোন্– আমার প্রথম রাজনৈতিক গুরু নেপুদা (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-ভোম্বল সর্দার ফিল্মের পরিচালক)। নেপুদা কোথা থেকে একগাদা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন, মাও সে তুং-এর রচনাবলী নিয়ে এসে আমার বাড়িতে রাখলো। আমাকে পড়তেও বলল। বিশ্বাস কর, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো আর মাও সে তুং ছাড়া আর কিছুই আমার মাথায় ঢুকলো না। নেপুদা হতাশ হয়ে সারা দুনিয়া মার্কসবাদী সাহিত্যের বই জোগাড় করে দিল। তার মধ্যে অনেক আঙ্খ কর্ষনীয় জিনিস খুঁজে পেলাম। সেগুলো পড়ার পর আগে আনা বইগুলো পড়তে শুরু করলাম। একটু একটু বুঝছি বলে মনে হয়।

অনন্ত ঃ সাহিত্যের কথা যখন তুললেন তখন মার্কসবাদী সাহিত্যের দুনিয়ায় কার কবিতা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে?

সৌমিত্র ঃ **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতা।**

অনন্ত ঃ বলছেন কী? এভাবে তো কেউই কখনও বলেননি।

সৌমিত্র ঃ তবে? এটাই হেডলাইন করে দে।

অনন্ত ঃ তা তো করবই। সত্যজিত রায় ছাড়া আপনি মৃণাল সেনের পরিচালনায় একটিই ফিল্ম করেছেন। ঋত্বিক ঘটক-এর কোনও ফিল্মে নেই। আপনার অনুশোচনা হয় না।

সৌমিত্র ঃ একটা চাপা অভিমান তো আছেই। মৃণালদা আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে বলেছেন যে, সৌমিত্রকে নিলে বাজেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার পারিশ্রমিকের জন্য কোনও প্রযোজক অসুবিধায় পড়েছে, তা আমার জানা নেই। ঋত্বিকদার সাথে মুখোমুখি হলে একই কথা বলেন, পুলু-

তুই পুরুলিয়ায় গরমকালে হাফপ্যান্ট পরে ২মাস কাটিয়ে আয়। তারপর তোকে আমি হিরো হিসেবে ভিড়িয়ে নেবো।

অনন্ত ঃ সত্যজিত, মৃণাল, ঋত্বিকের মধ্যে আপনার পছন্দের পরিচালক কে?

সৌমিত্র ঃ আবার গণ্ডগোলে প্রশ্ন। শুনে রাখ্, ঋত্বিক ঘটক যদি পরিশীলিত হতেন, তবে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ছবি বলতে ওনার ফিল্ম'ই হত।

অনন্ত ঃ নায়ক নায়িকা বাদ দিলে উঁচুমানের অভিনেতা কাদের বলা যায়।

সৌমিত্র ঃ তুলসী চক্রবর্তী, ভানুদা, ছবি বিশ্বাস। হিন্দি ফিল্মে- বলরাজ সাহনী-এর ধারে কাছে কেউ নেই।

অনন্ত ঃ কোন কোন যোগ্যতাসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীকে টালিগঞ্জ স্টুডিও কাজে লাগাতে পারেনি?

সৌমিত্র ঃ অভিনেত্রী অনেকেই আছেন। তবুও লিলি চক্রবর্তীর কথা বলা যায়। অভিনেতাদের মধ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ -এর প্রতি অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য।

অনন্ত ঃ উত্তমকুমার মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন?

সৌমিত্র ঃ দ্যাখ্। মানুষ দোষে গুণে ভরা। আমিও ধোয়া তুলসিপাতা নই। মানুষটা কেমন উদার একাট উদাহরণ দিই– স্টুডিও মালিক-টেকনিশিয়ানদের বিবাদ তখন তুঙ্গে। স্টুডিওর কাজ বন্ধ। উত্তমদা একদিন আমাকে আর দীপাকে ডিনারে ডাকলেন। সন্ধ্যা ৭-৩০ থেকে রাত ২টো পর্যন্ত আড্ডা, পান, আহার চলল। স্টুডিওর গোলমাল নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। আমরা যতই ফটর ফটর করি না কেন, উত্তম-সুচিত্রার জন্য টালিগঞ্জ বেঁচে আছে।

অনন্ত ঃ শেষ প্রশ্নে আসি। অনেকেই বলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিগুলো প্রচারধর্মী। নিম্নমানের। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

সৌমিত্র ঃ দ্যাখ্। সত্যি কথা ব'লতে আমি বিদেশি ছবি বেশি দেখার সুযোগ পাইনি। ল্যাটিন অ্যামেরিকার 'মাথাগরম' পরিচালকদের ছবি ভালো লাগত কিন্ত সেই ভালো লাগা তাৎক্ষণিক। খোদ আমেরিকায় বসে মানিকদা (সত্যজিত রায়) এক সাংবাদিকের প্রশ্নে তার পছন্দের তিনটি সবাক ফিল্মের নাম করেন, ১) ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন, ২) ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন, ৩) ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর সাক্ষাৎকার— অরিত্র- শীতকালীন সংখ্যা '৭৪

জয়প্রকাশ-অশোক মিত্র সি.আই.এ পেইড

মৃণাল সেন

অনন্ত আচার্য ঃ মৃগয়া-র স্টিল ছবিগুলো দেখলাম। সুভাষ (সুভাষ নন্দী)-এর তোলা ছবিগুলো বেশ ভালো হয়েছে। মৃগয়া নিয়ে কিছু বলুন।

মৃণাল সেন ঃ তুমি তো বীরভূমের আউটডোর শ্যুটিং-এ ক'দিন ছিলে। তোমার কী মনে হয়?

অনন্ত ঃ ইন্টারভিউ তো আপনার নিচ্ছি।

মৃণাল ঃ অনেকদিন বাদে সোজাসুজি একটা টানা গল্পে ঢুকলাম। মনে হয় প্রযোজকের টাকা মার যাবে না। (হাঃহাঃহাঃ)

অনন্ত ঃ তেমন পরিচিত নায়ক নায়িকা নেই তবুও আপনি আশাবাদী।

মৃণাল ঃ মিঠুন মমতা খুব ভালো কাজ করেছে। ফিল্মটা দাঁড়িয়ে যাবে।

অনন্ত ঃ এদের ভবিষ্যত কীরকম হবে মনে হচ্ছে? আমি ফিল্মি কেরিয়ার বলতে চাইছি।

মৃণাল ঃ মিঠুন ছেলেটাকে পুণা ইন্সটিটিউটে প্রথম দেখি। দিনের বেলায় তো বটে আমার ধারণা ও রাতেও লাফায়। বোম্বের মশলা ছবির পক্ষে বেস্ট চয়েস। মম (মমতা)-এর ঘরোয়া সাধাসিধে চেহারা। বয়েসও কম। তবে ওর পক্ষে টালিগঞ্জের নায়িকা হবার সম্ভাবনা কম। নায়কের সরল বোন বা স্নেহশীলা বৌদি সেজেই বাকি জীবন কাটাবে।

অনন্ত ঃ এ ফিল্মের স্ক্রিপ্ট যেটুকু জানি তাতে প্রতিবাদের পথ হিংসাত্মক মনে হয়েছে। দেশে এখন জরুরি অবস্থা। বইটা নিষিদ্ধ ঘোষণা হবে না তো?

মৃণাল ঃ আমি তোমাদের মতো ইন্দিরা গান্ধীর অন্ধ বিরোধী নই। এ ছবিটি উড়িষ্যার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথীর বাবার গল্প থেকে নেওয়া। উনি আমার সামনে ইন্দিরা গান্ধীকে এই ফিল্ম তৈরির কথা টেলিফোনে বললেন। ইন্দিরা গান্ধী কী উত্তর দিয়েছিলেন জানো? উনি বলেছিলেন মৃণাল সেনের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। সো কাইন্ড মাইন্ডেড সি ইজ।

অনন্ত ঃ ওনার কাইন্ডনেসের ঠেলা দেশের মানুষ বুঝছে। সেকথা থাক। আপনার কোন ফিল্ম আপনাকে সব থেকে বেশি সন্তুষ্ট করেছে।

মৃণাল ঃ ভূবন সোম ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

অনন্ত ঃ বাংলা ছবির আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি করার বিষয়ে সত্যজিত রায়-এর সাথে সাথে আপনার নামও উচ্চারিত হয়। ঋত্বিক ঘটক কেন তেমন সমাদর পেলেন না?

মৃণাল ঃ তার জন্য ও নিজেই কম দায়ী নয়। কখন কার সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় নেশার ঘোরে সব ভুলে যায়।

অনন্ত ঃ উদাহরণ দিলে ভালো হয়।

মৃণাল ঃ ফরাসী ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের এক অর্গানাইজারকে গাঁজা পার্কের বাংলা মদের ঠেকে নিয়ে গিয়ে হাজির। ওখানে ওর কোন্ কোন্ ছবি প্যারিসে যাবে সেই নিয়ে আলোচনার কথা। সেই লোকটার কাছ থেকে ২০০ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে তাকে ওখানকার মদ খাওয়ালো। সেই ভদ্রলোক 'বাংলা' খেয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে ৭দিন ধরে ঘর আর টয়লেট করে দেশে ফিরে গেলো।

অনন্ত ঃ এ ওনার অস্বাভাবিক আচরণ।

মৃণাল ঃ সত্যি বলতে কি, আমি ওর বহুদিনের বন্ধু। তুই তোকারি সম্পর্ক। দেখা হলেই লোকজনের সামনে বলেঃ- মৃণাল তোর কাছে ১০০ টাকা পাই। অন্তত ৫০ টাকা দে তো।

অনন্ত ঃ এই ১০০-৫০-এর ব্যাপারটা কী?

মৃণাল ঃ আরে, গীতার সাথে অনেকদিন প্রেম করে যখন বিয়ে করলাম

তখন পকেটে টাকা ছিল না বললেই চলে। বন্ধু বান্ধবের কাছে হাত পাতলাম। তাপস (সেন) অনেক টাকা দিল। কোথা থেকে ঋত্বিক খবর পেয়ে আমার কাছে এসে হাতে ১০০ টাকা গুঁজে দিয়ে বললোঃ- তুই কি আমাকে ভিখারী পেয়েছিস? তারপর থেকে যতবার দেখা হয়েছে ততবার একই কথা– ১০০ টাকা দেনা আছে, অন্তত ৫০ টাকা দে। অথচ আমাদের বিয়ের ১ বছরের মধ্যে সব দেনা শোধ করেছিলাম।

অনন্ত ঃ ঋত্বিক পর্ব তো হল। কিন্তু মৃগয়া ফিল্মে এক জায়গায় একটি সংলাপ আছে– 'আভি আপৎকাল চল রহা হ্যায়" - এর মানে এখন বিপজ্জনক পরিস্থিতি চলছে। এই সময়ে এই সংলাপ সেন্সর বাদ দেবে না তো?

মৃণাল ঃ এর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। মৃগয়ার কাজ চলাকালীন যেভাবে সহায়তা করেছিলে তার জন্য ফিল্মের শেষে নিজের নাম দেখতে পাবে। তাই বলে সব ব্যাপারে নাক গলাবে তা মানতে পারবো না।

অনন্ত ঃ আপনি রেগে গেছেন। আমি মার্জনা চাইছি। অন্য প্রসঙ্গে আসি।

মৃণাল ঃ আর কোনও কথা নয়। এটা তোমাদের পলিটিক্যাল ব্লান্ডার যে

মৃণাল সেন-এর সাথে সাক্ষাৎকারটি ১৯৭৫ সালের ৯ অক্টোবর গৃহীত হয়। পরবর্ত্তীকালে ১৯৭৭ সালে অরিত্র পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথী 'ব্রাহ্মণ'দের দুর্ভোগ

কী যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কীসে
কভু আশী বিষে
দংশেনি যারে।

কবির এই কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনও যুক্তি নেই। তবুও কোনও সাপ (আশী বিষ)-এর কামড়ে অসুস্থ রোগী যদি আব্দার করে, যে তাকে সুস্থ করে তোলার কাজে কেবলমাত্র তারাই যুক্ত থাকবে, যাদের কোনো না কোনোদিন সাপের ছোবল খেতে হয়েছে তা মুর্খামি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ভারত নামক এই উপমহাদেশে জাতভিত্তিক ব্যবস্থা এবং তার কারণে বৈষম্য তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে চলছে। মানব ইতিহাসের প্রথম পর্ব (আদিম যুগ) বাদ দিলে সামন্ততান্ত্রিক শাসকগণ তাদের শাসন ও শোষণ পদ্ধতিকে ন্যায্যতা ও মান্যতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপার্থিব ভাববাদের সহায়তা গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন ভারতের ভাববাদী ধর্মীয় দর্শনের বিপক্ষে প্রতিবাদী ভূমিকায় আমরা পাই চার্বাক এবং অজিত কেশকম্বল-এর নাম। এঁদের রচনা হয় হারিয়ে গেছে অথবা নষ্ট করা হয়েছে। তবুও ভারতের বস্তুবাদ ও লোকায়ত দর্শন নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর চার্বাক চর্চা (প্রকাশক - সদেশ, ২০১০) পড়লে চার্বাক, কেশকম্বল কী চেয়েছিলেন তা বোঝা যায়। যদিও পুরাকালে ইদানীংকালের মতো সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মান্তর ভাবনা, মায়াবাদ সর্বোপরি জাতভেদ ব্যবস্থা তেমন আলোচিত ছিল না। তবুও এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে দ্রোহী 'হৈতুক' চার্বাক, কেশকম্বল উচ্চবংশীয় বা উচ্চবর্গীয় ছিলেন। সেকালে ক্ষমতাবানদের সাথে রুক্ষ বৌদ্ধিক বিতর্ক করার সাধ থাকলেও সাধ্য প্রান্তবাসীর থাকার কথা নয়।

প্রবন্ধের শিরোনাম-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল কথায় ফিরে আসি। আমরা

যদি বিজ্ঞানসম্মত দ্বন্দ্বতত্ত্বে ভরসা করি তবে জাতব্যবস্থা গঠিত হবার সাথে সাথেই তার মধ্যে একটি বিপরীত, হয়তো দুর্বল ধারার সন্ধান পাবো। চার্বাক, অজিত কেশকম্বল-এর পরে কবীর, লালন, দাদু সহ বেশ কিছু নাম এসে যায়।

''সব লোকে কয় লালন কী জাত এ সংসারে''

এঁরা কোন বংশে জন্মেছিলেন এবং তা উচ্চবর্ণ না নিম্নবর্ণ, এইসব কূটতর্ক আসলে মূল বিতর্কের থেকে দূরে যাওয়ার (অপ) চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। ইদানীংকালে জাতব্যবস্থাকে ন্যায্যতা-মান্যতা দেওয়ার কু-উদ্দেশ্যে যেসব ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে ফুলে, পেরিয়ার, আম্বেদকর, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ সবাক ছিলেন। তাঁদের পাশাপাশি ডি.ডি. কোসাম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলিকে, যা প্রতিনিয়ত উক্ত ধর্মগ্রন্থগুলির (মনুস্মৃতি, বেদ, গীতা, উপনিষদ) অসার বক্তব্যকে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত শোষণ বৈষম্য ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে নগ্ন করে দেয়, তা কেবলমাত্র প্রাবন্ধিকগণ ব্রাহ্মণ পদবীধারী বলে অপাঠযোগ্য বলে বাতিল করা যায়? চক্রবর্তী শিবরাম-এর রচিত '*মস্কো বনাম পন্ডিচেরী*' (১৯১৯) পুস্তকে '*শূদ্র বনাম ব্রাহ্মণ*' প্রবন্ধে লেখক ব্রাহ্মণদের নরখাদকের সাথে তুলনা করেছিলেন। একি কেবল রসিকতা? এই সময়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আশীষ লাহিড়ী, কণিষ্ক চৌধুরী রচিত গ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করলে উক্ত 'সাপে কাটা' মানুষটির মতোই মূর্খামি হবে।

এই প্রবন্ধে মহারাষ্ট্রের জাতব্যবস্থা বিরোধী অব্রাহ্মণ্যবাদী আন্দোলনের সাথী 'ব্রাহ্মণ'গণের দুর্ভোগের কথা বলি। অন্য রাজ্যের কথা পরে লেখা যাবে। বাঙালিদের মধ্যে মুখার্জী, ব্যানার্জী, চ্যাটার্জী, ভট্টাচার্যী, আচার্যী-দের পদবীর শেষবর্ণটি যেমন ইংরাজী G (জী, যী)-এর মতো শোনায় তেমনই মহারাষ্ট্রে কর বা কার শব্দদুটি যে পদবীর লেজুড় হিসাবে থাকে সেই পদবীধারীরা ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। যেমন মঙ্গেশকর, গাভাসকর, সাভারকর, তেন্ডুলকর, পালসিকর এবং অবশ্যই আম্বেদকর।

গোপাল গণেশ আগরকার (১৮৫৬-১৮৯৫)-এর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা জানা যাক। শ্রী আগরকর 'লোকমান্য' তিলক-এর কেশরী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ৩৯ বছর জীবনকালের ১৫ বছর তিনি শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রের জাতব্যবস্থার ভয়াবহতা আগরকরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কেশরী পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয়তে তাঁর উদ্বেগ লিখিত আকারে ছাপানোর জন্য তাঁর সঙ্গে 'লোকমান্য' তিলক-এর মতবিরোধ হয় এবং তিনি কেশরী পত্রিকার

সম্পাদক পদ থেকে বিতাড়িত হন।

যে সম্পাদকীয় তাঁর কর্মচ্যুতির কারণ হয় তার কিছু অংশ আশীষ লাহিড়ী *আরেক রকম* পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা-য় (অক্টোবর ২০১৬) অনুবাদ করেছেন —

> ‘‘গায়ের রং কী করে মানুষের ক্ষমতার নির্ধারক হবে? কে চালু করেছিল এই চতুর্বর্ণ প্রথা? কে চালু করেছিল এই .... যে ব্রাহ্মণরা জন্মেছে সমাজপুরুষ নামক এক পুরাণকল্পিত ব্যক্তির মুখ থেকে আর অস্পৃশ্যরা জন্মেছে তার পা থেকে? এই অন্যায় শাস্ত্র নিপাত যাক। এসো আমরা অস্পৃশ্যরা আর ব্রাহ্মণরা সকলে মিলে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে কাছাকাছি বসতে শিখি। ... একজন অস্পৃশ্য আর একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে, একজন পুরুষ আর একজন নারীর মধ্যে, একজন বিধবা আর একজন বিপত্নীকের মধ্যে অন্যায় বৈষম্য কী করে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় সেটা নির্ভর করছে আমাদেরই উপর।’’

এই ধরণের সম্পাদকীয় লেখার পর আগরকর-এর চাকুরী বজায় থাকার কথা নয়।

জ্যোতি বা ফুলের অনুগামী আগরকর থেমে থাকেননি। হতাশ হন নি। নতুন উদ্যোগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুধারক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় তোপ দাগতে থাকলেন। একইসাথে ডেকান এডুকেশনাল সোসাইটি, ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিস্ময় এবং দুঃখের কথা এই যে সুধারক পত্রিকায় তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী এবং জাতবৈষম্য বিরোধী রচনা পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তিনি ‘না ঘরকা না ঘাটকা’ রয়ে গেলেন। স্বগোত্রীয়রা তাঁর সাথে বাক্যসম্পর্ক ছিন্ন করল। যাঁদের পক্ষে কথা বলে তিনি বিতর্কিত হলেন তাঁদের নেতারা তাঁর উপর ভরসা না রেখে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করল।

এবার আম্বেদকর-এর বিষয়ে আসা যাক। একথা অনেকেরই জানা যে ভীমরাও আম্বেদকর-এর পারিবারিক পদবী শকপাল। আম্বেদকর তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে সেই ব্রাহ্মণ শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন যিনি তাঁকে সম্মান রক্ষার্থে অস্পৃশ্য শকপাল থেকে আম্বেদকরে পরিবর্তিত করেছিলেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি আমৃত্যু ব্রাহ্মণ পদবী বহন করেছিলেন। আনন্দ তেলটুম্বডে সহ অন্য গবেষকরা উক্ত শিক্ষক-এর সম্পর্কে বিশদ জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আম্বেদকর যখন বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণিতে পড়ছেন তখন পান্ডসে পদবীধারী ব্রাহ্মণ শিক্ষকের স্নেহে পড়েন।

কোন একদিন তুমুল বৃষ্টির দিনে সম্পূর্ণ জলে ভেজা অবস্থায় আম্বেদকর বিদ্যালয়ে আসেন। ছাতা কেনার সামর্থ সম্ভবতঃ শকপাল পরিবারের ছিল না। আম্বেদকর তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লিখছেন যে ব্রাহ্মণ শিক্ষক পান্ডসে সেদিন তাঁর ছেলেকে নির্দেশ দিলেন যে ভীমরাওকে শিক্ষকের বাড়িতে নিয়ে যেতে এবং গরমজলে স্নান করিয়ে অন্য পোষাক পরিয়ে দিতে। বলাবাহুল্য তাঁর এই নির্দেশ শিক্ষকপুত্র পালন করেছিলেন। আম্বেদকর যখন এলফিনস্টোন বিদ্যালয়ে পড়তেন তখন একদিনের ঘটনা তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। অঙ্কের শিক্ষক যখন ভীমরাওকে ব্ল্যাকবোর্ডে একটি গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলেন তখন বর্ণহিন্দু সমাজভুক্ত কয়েকজন ছাত্র আপত্তি জানিয়ে বলে যে ঐ ব্ল্যাকবোর্ডের পিছনে তাদের টিফিন বাক্স রাখা আছে। অস্পৃশ্য ভীমরাও ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গেলে তাদের টিফিন বাক্স-র খাবার অখাদ্য হয়ে যাবে। শিক্ষক দৃঢ়কণ্ঠে ঐ ছাত্রদের তাদের টিফিন বাক্স সরিয়ে নিতে বলেছিলেন কিন্তু আম্বেদকর-এর ব্ল্যাকবোর্ডে গণিত চর্চায় বাধা সৃষ্টি করেন নি। ঐ শিক্ষক একজন ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত - পদবী যোশী।

আম্বেদকর-এর জীবনে কৃষ্ণজী অর্জুন কেলুসকরের ভূমিকা অনবদ্য। ১৯০৭ সালে মাহার সম্প্রদায়ের প্রথম ম্যাট্রিকে উত্তীর্ণ ছাত্র আম্বেদকরকে যখন প্রকাশ্য সভায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তখন উইলসন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কেলুসকর ছিলেন প্রধান বক্তা। ব্রাহ্মণ কেলুসকর ভীমরাওকে মারাঠী ভাষায় রচিত গৌতমবুদ্ধের জীবনী উপহার দেন। এই বইটি সম্ভবতঃ আম্বেদকর-এর পরবর্তী জীবনে হিন্দুধর্ম ত্যাগ এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে প্রাথমিক প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষক কেলুসকার ভীমরাও-এর উচ্চশিক্ষা ও আর্থিক সহায়তার জন্য বরোদার মহারাজার কাছে আবেদন করেন এবং তা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়।

চৌদার পুকুরে স্নান করা অস্পৃশ্যদের বে-আইনি ছিল। ওখানে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার চালু ছিল। আম্বেদকর বহু আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে চৌদার পুকুরে স্নানের জন্য সত্যাগ্রহ এবং বলপূর্বক আইন ভঙ্গ করে ঐ পুকুরে সমবেত স্নানের উদ্যোগ নেন। স্বেচ্ছাসেবীরা যখন পুকুরের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় পুকুরে নামতে পারছে না তখন যে মানুষটি পুকুরে ঝাঁপ মেরে সমবেত স্বেচ্ছাসেবীদের উৎসাহিত করলেন তিনি বাপুরাও যোশী যিনি মাহাদ শহরের একজন সুপরিচিত ব্রাহ্মণ।

মাহাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কয়েকজন অব্রাহ্মণ নেতা আম্বেদকরকে অনুরোধ

জানান যে এই সম্মেলনে কোনও ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার থাকবে না। আম্বেদকর তাদের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সাথে শত্রুতা করলে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই দুর্বল হয়ে যাবে।

কলকাতার বৌদ্ধদের সংগঠন মহাবোধী সোসাইটি তাদের পত্রিকায় আম্বেদকরের কাছে একটি রচনার জন্য অনুরোধ করেন, আম্বেদকর দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এই কারণে যে তখন মহাবোধী সোসাইটির সভাপতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, ছিলেন একজন গোঁড়া ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধদের বারংবার অনুরোধে এরপর আম্বেদকর ৬৫০০ শব্দের একটি প্রবন্ধ কলকাতায় পাঠান। এই রচনাটি পরবর্তীকালে *বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের ভবিষ্যৎ* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আম্বেদকর লোকসভায় হিন্দু কোড বিল নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করেন তখন হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং এন ভি গডগিল (দুজনেই ব্রাহ্মণ) তাঁকে সমর্থন করেন। বলাবাহুল্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য সহজবোধ্য ছিলঃ– এই বিল হিন্দুসমাজকে ধ্বংস করবে। ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিচারপতি পি.বি. গজেন্দ্রগাওকার হিন্দু কোড বিলের পক্ষে বলেছিলেন। উক্ত বিচারপতির ভাই অধ্যাপক অশ্বত্থামাচার্য বালাচান গজেন্দ্রগাওকার বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ইস্তফা দেন শুধুমাত্র এই কারণে যে তাঁকে আম্বেদকর-এর অনুরোধে আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধার্থ কলেজে প্রথম অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করতে হবে। এ.বি. গজেন্দ্রগাওকার আম্বেদকরের সহপাঠী ছিলেন। ১৯১২ সালে একইসাথে স্নাতক হন এবং সারাজীবন বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখেন।

আম্বেদকর ১৯৪৮ সালে তাঁর অন্যতম পারিবারিক চিকিৎসক সারদা (সবিতা) কবীরকে বিবাহ করেন। আম্বেদকর-এর প্রথমা স্ত্রী বহু পূর্বে বিগতপ্রাণ হয়েছিলেন। অনেকেই এ বিবাহে খুশী ছিল না। তাদের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে ভীমরাও তাঁর উত্তরাধিকারীদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তি দিয়েছিলেন। তৎকালীন আম্বেদকর অনুগামীদের ক্ষমতাশালী একাংশ ব্রাহ্মণকন্যা সারদা বাই-এর প্রতি ঘৃণামূলক ব্যবহার করতেন। আম্বেদকর-এর রচিত গ্রন্থ *বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম* তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে আম্বেদকর-এর লিখিত ভূমিকা ছাপা হয়নি। ভগবান দাস নামক একজন পাঞ্জাবী বৌদ্ধ দলিত লেখক এই রহস্য কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করেন। আম্বেদকর ঐ ভূমিকায় তাঁর স্ত্রীর (সারদা বাই আম্বেদকর) প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। শেষজীবনে গুরুতর অসুস্থ আম্বেদকর চিকিৎসক স্ত্রীর

সহায়তা ছাড়া তাঁর জীবনের শেষ গ্রন্থটি লিখে যেতে পারতেন না। অন্যান্য অনেক কথার সাথে ভূমিকার পান্ডুলিপিতে এই কথাই লেখা ছিল। ব্রাহ্মণকন্যার গুণগান গাওয়া এই ভূমিকা প্রকাশনা কাজে যুক্তদের সহনীয় ছিল না। ঐ মূর্খরা এটা বুঝতে পারেনি যে সারদা সবিতা বাইকে বাতিল করতে গিয়ে তারা আম্বেদকরকেই অপমান করেছেন।

পদ্মশ্রী পদকপ্রাপ্ত চিকিৎসক নরেন্দ্র দাভলকর (১৯৪৫-২০১৩) ছিলেন পুণা শহরের অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলীকরণ সমিতির প্রধান। এই সংগঠনের কর্মীরা কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের জন্য মহারাষ্ট্রের জেলাশহরগুলিতে সক্রিয় শাখা সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বাস্তব অবস্থা ক্রমশঃ তাদের জাতব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, পিতৃতান্ত্রিকতার বিরোধী সংগঠকে পরিণত করে। এরা জ্যোতি বা ফুলেকে তাদের আন্দোলনের প্রধান চিন্তক মনে করেন। আতাউলে নামক এক স্বঘোষিত আম্বেদকরবাদী (বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী) নরেন্দ্র দাভলকর-এর বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াতে শুরু করে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া-মুম্বাই সংস্করণ 5th June 2013তে আতাউলের বক্তব্য প্রকাশিত হয়ঃ- কুসংস্কার বিরোধিতার অজুহাতে ব্রাহ্মণ নরেন্দ্র দাভলকর নকশালবাদীদের উৎসাহ দিচ্ছে। এদের অর্থ জোগানদারদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া উচিত। হিন্দুত্ববাদী শিবসেনা-র খুনী বাহিনীর হাতে শহীদ হয়ে নরেন্দ্র দাভলকর (20th Aug. 2013) শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লিখে গেলেন তাঁর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধিতার শেষ প্রমাণ। সারা ভারতের সমস্ত বিজ্ঞান সংগঠন সহ চিন্তক সুশীল বিদ্বজ্জনরা এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করল। আম্বেদকরবাদীদের ভণ্ড অংশের নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করলো জৈবিক দুর্ঘটনায় কে কোন পরিবারে জন্মেছে তা দিয়ে সমাজ বিবর্তনে কে কীরকম ভূমিকা নেবে তা নির্দ্ধারিণ করে না।

তথ্যসূত্রঃ

১. আরেক রকম - শারদীয়া সংখ্যা ২০১৬- আশীষ লাহিড়ী
২. Agarkar - A Forgotten Hero S.B. Kamble - New India Publication, Bombay, 1993
৩. Indian Express, 30th May 2003, Rakshit Sonawanea.
৪. Ambedkar and Buddhism:- Sangharakshita, Woodhorse Publications, 1986
৫. Short Autobiography of Dr. Babasaheb Ambedkar, Translator : Bhalchandra Phadke, Srividya Prakashan, Pune 1985.
৬. Thought & Action - Editor : Suman Dak.

—চেতনা লহর/পথ সংকেত (পুনঃমুদ্রিত)

নানা চোখে মনোরঞ্জন ব্যাপারী

মনোরঞ্জন ব্যাপারী এখন বাংলা সাহিত্যের আকাশে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ।

শ্রেণি/বর্গ (Class)-র মধ্যে বর্ণ/জাত (Caste) বিদ্যমান এবং বর্ণ/জাতের মধ্যে শ্রেণি/বর্গর আপাত নিশ্চল অবস্থান, ভারত উপমহাদেশের এই বৈশিষ্ট কয়েকজন মাত্র সমাজ বিজ্ঞানী ইতিহাসবিদ ধরতে পেরেছেন, যাঁদের মধ্যে ডি. ডি. কোসম্বীর নাম নির্দ্বিধায় বলা যায়। গত চার দশকে রাজনীতির দুনিয়ায় সংগঠিত ভাবে বেশ কয়েকজন এরকমই ভাবছেন এবং যথাসাধ্য প্রয়োগ করেছেন। স্বশিক্ষিত মনোরঞ্জন ব্যাপারী এই কারণেই অনন্য যে বাংলা সাহিত্যের বিশাল চর্চার ইতিহাসে তিনিই প্রথম এই নিজ অভিজ্ঞতাজাত ধারণাকে (যা উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সমধর্মী) সম্বল করে ১১টি উপন্যাস, শতাধিক গল্প, ২০/২৫টি প্রবন্ধ এবং দুই পর্বে একটি আত্মকথা রচনা করেছেন। গ্রাম বাংলা থেকে প্রকাশিত "ছোটপত্রিকা" হোতে শুরু করে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস সমপরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে তাঁর রচনা প্রকাশ করেছে। এখনও পর্যন্ত গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক শ্রমকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা তাঁকে প্রাপ্য অর্থ ও মর্যাদা দেয়নি। এদেশে বিদেশে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় চর্চা দুই মলাটের ভিতরে সংকলনের উদ্দেশ্য একটিই যে 'ভদ্দরলোক দুনিয়া'-এর বাইরের এই ব্যক্তিটি নানা চোখে কীরকম দৃষ্ট হয়েছেন তা এক সাথে জানা। এই সংকলন পাঠের পর যদি কেউ মনোরঞ্জন ব্যাপারীর মতো বৈষম্যহীন দুনিয়ার স্বপ্ন দেখেন তবে এই সংকলনের প্রকাশ সার্থকতা পাবে।

মার্চ-২০১৬

নিপীড়িতের শিক্ষা বিজ্ঞান

অনন্ত আচার্য

বিদ্যেবোঝাই বাবু মশাই চড়ি শখের বোটে
মাঝিরে কন— 'বলতে পারিস সুয্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?'
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে,
বাবু বলেনঃ 'সারাজীবন মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবন টা যে চারি আনাই মাটি।

সুকুমার রায়-এর রচনা 'বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই' শিরোনামে এই ছড়াটি শ্রুতি নাটক হিসাবে তৈরি করেছে পলাশির এক সদ্য কিশোর নাট্যকর্মী শুভব্রত মণ্ডল।

কেমন হয়েছে তা দেখা যাক—

বাবুঃ পাহাড় থেকে নদীর ধারা কীভাবে আসে?
মাঝিঃ এতসব জানি না
বাবুঃ এই বয়সে জানলি কী? তোর জীবনের আট আনাই ফাঁকি।
বাবুঃ আকাশের চুড়ো কেন নীল দেখা যায়? সুর্য চাঁদে কেন গ্রহণ লাগে?
মাঝিঃ কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন?
বাবুঃ বলব কী আর, তোর জীবনটা বারো আনাই বৃথা।

এখন আবার ছড়াটির শেষাংশে ফিরে আসা যাক—

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে। ঢেউ উঠছে ফুলে।
বাবু দেখেন নৌকা খানি ডুবল বুঝি দুলে
মাঝিরে কনঃ- একী আপদ ওরে ও ভাই মাঝি
ডুবল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?
মাঝি শুধায়ঃ- সাঁতার জান? মাথা নাড়েন বাবু
মূর্খ মাঝি বলে— মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে।
তোমার দেখি জীবন খানা ষোলো আনাই মিছে।

সুকুমার রায়-এর এই ছড়াটি বেশিরভাগ সাক্ষর বাংলাভাষীর জানা বলে মনে হয়। তবুও 'বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই'রা বুদ্ধিজীবী পরিচয়ে পরিচিত হন আর 'মূর্খ' মাঝিদের সমাজের প্রান্তিক জীবন যাপন করতে হয়।

এই রচনায় সুকুমার রায়কে আবার স্মরণ করতে হবে। এই ফাঁকে আমরা দেশবিদেশে বৌদ্ধিক শ্রম বনাম কায়িক শ্রমের দ্বন্দ্ব নিয়ে কে কীরকম ভেবেছেন তা জেনে নিতে পারি। মেধা, মেরিট, ইনটেলেক্ট শব্দগুলির যখন ক্ষমতাসীনরা নিজেদের পছন্দ বা স্বার্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করছেন তখন তো ওদের 'ওয়াক-ওভার' দেওয়া যায় না।

ইতালীর দারিও ফো (১৯২৬-২০১৬) একজন জগৎ বিখ্যাত নাটককার। নাট্য বিশারদ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯.৩.২০০৪-এ কলকাতার বাংলা অ্যাকাডেমী সভাগৃহে 'বাংলায় বিদেশী নাটকের প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় বলেন— ''আমার যদি ভুল না হয় তবে এ তথ্য জানাতে পারি শেক্সপীয়র, বার্নার্ড শ, ব্রেখ্‌ট-এর মতো দারিও ফো এমন একজন নাট্যকর্মী, যার রচনা পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদ, অনুকরণ করা হয়েছে। বহু নাটকের দল ওনার নাটক প্রযোজনা করেছে''। দারিও ফো-এর রচনা *ডেথ অফ এন অ্যানার্কিস্ট* অবলম্বনে *মৃত্যু না হত্যা* নাটক বাঙালি দর্শক মহলে সমাদৃত হয়েছিল। নোবেল পুরস্কার যেহেতু নাট্যকর্মীদের দেওয়ার চল নেই, দারিও ফো নাট্যসাহিত্য-এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঐ পুরস্কার পেয়ে দারিও ফো-এর 'ল্যাজ মোটা' হয়ে যায় নি। উনি ওনার একান্তই নিজস্ব পদ্ধতিতে নাট্যচর্চা করে গেছেন যা অনেক দেশের শাসকবর্গকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। সম্প্রতি দারিও ফো-এর একটি নাট্য-কর্মশালার ক্যামেরাবন্দী তথ্যচিত্রমূলক কাজ দেখার সুযোগ হয়েছিল। যে কোনো নাট্যকর্মীর কাছে এ তথ্যচিত্রটি শিক্ষামূলক। মঞ্চসজ্জা, আলোক নিক্ষেপ, সাজসজ্জা, পরিচালন পদ্ধতি, অভিনেতাদের শরীরীভাষার প্রয়োগ, এককথায় অনবদ্য। আমার কাছে এ নাটকের গল্পটিকে অসাধারণ মনে হয়েছে। কাহিনীটা এইরকমঃ- রোম শহরের বাইরে পুলিশ একটি অর্ধমৃত দেহ একটি খালধার থেকে উদ্ধার করে। লোকটির পরনে একটুকরো পোষাক নেই। চুল দাড়ি বহুদিন না কাটা। শরীরে চর্ম রোগ ভর্তি। হাত-পায়ের নখ বহুদিন কাটা হয়নি। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে বহুদিন তিনি অনাহারে আছেন। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁকে তরল খাদ্য দেওয়া হলো। পোষাক পরানো হলো। চুল-দাড়ি-নখ কাটা হলো। চর্মরোগের চিকিৎসাও হলো। ১৪ দিন বাদে জ্ঞান ফেরার পর ভদ্রলোক-এর প্রথম প্রশ্ন— ''পৃথিবীর মানুষ ভালো আছে তো? কোনো বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?'' ইতিমধ্যে সরকারি উদ্যোগে ভদ্রলোকের ছবি প্রচার মাধ্যমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়ার পর জানা গেল যে উনি নরওয়ের বাসিন্দা এবং বিশ্বখ্যাত সৌরবিজ্ঞানী। মনোরোগ বিভাগের চিকিৎসকরা ওনাকে মনোরোগী

বলতে নারাজ। বেশ কিছুদিন বাদে বিজ্ঞানী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে জানা গেল যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের একটি সেমিনারে নেস্টর ম্যাক্সওয়েল নামে ঐ বিজ্ঞানী যা বক্তব্য/সন্দর্ভ পেশ করেন তা হলো—''শিক্ষায়তনের পাঁচিলের বাইরে কখনো কোনো সময় জ্ঞানবুদ্ধির চর্চা হয় না। জ্ঞান, বোধবুদ্ধি, মেধা থেকে দূরে থাকা মানুষই কায়িক শ্রম করে। যারা মনে করেন কায়িক শ্রমের পেছনে বোধবুদ্ধির চর্চা কাজ করে তারা মূর্খ ছাড়া কিছুই নয়। বিজ্ঞানের যা অগ্রগতি ঘটছে কিছু বছর বাদেই 'রোবট'-এর দ্বারা সমস্ত কায়িক শ্রমের কাজ করানো যাবে। কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধির চর্চা পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে পারে''। স্বভাবতই বিজ্ঞানী মহলে তুমুল বিতর্ক শুরু হলো। তার কিছু অংশ সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হলো। এরপরেই নাটকের নতুন চমক। ঐ বিজ্ঞানী এক রাতে স্বপ্ন (দুঃস্বপ্নও বলা চলে) দেখলেন যে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ দলবদ্ধভাবে প্রতিজ্ঞা করলেন যে ঐ বিজ্ঞানী যদি খাবার খান তবে কৃষকরা গম, চাল, ফল, সব্জি ইত্যাদি চাষ করা বন্ধ করে দেবেন। শ্রমিকরাও এমনই সিদ্ধান্ত নিল। ফলে পোষাক, জুতো, দাড়ি-চুল কাটার যন্ত্র, ওষুধ, সাবান শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হলো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু তিনি ভুল করেছেন তাই তিনি বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তা পরিত্যাগ করবেন। সাংবাদিকদের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করার কথা তিনি লজ্জায় বলতে পারেন নি। এই কারণেই তাঁর এই অবস্থা। 'মধুরেণ সমাপয়েত' বা ইচ্ছাপূরণ না করে দারিও ফো এই বিতর্কের সমাধানের দায় নাট্যকর্মী এবং দর্শকের হাতে ছেড়ে দিলেন।

বিজ্ঞান শিক্ষা ছড়ায় সুকুমার রায়-এর বিজ্ঞানী ''ফুট্স্কোপ'', 'ম্যাগনেট' দিয়ে মগজের ভেলোসিটি মাপার চেষ্টা করেন। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর শরীর ব্যবচ্ছেদ বিভাগের প্রধান গোমতি গোপীনাথ তাঁর *ব্রেইন* (প্রকাশক-এন.বি.টি.) পুস্তকে লিখেছেন— 'স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত অসুস্থ, অনাহারক্লিষ্ট অতি বৃদ্ধ এবং শিশু ব্যতিরেকে প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের রসদ খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তা মানুষ পেয়ে যায়। তাই ব্রেইন-এর মতো শরীর পরিচালন নিয়ন্ত্রণ শক্তির আধার কোনো মানুষের প্রতি বৈষম্য দেখাতে পারে না। পরিবার, পরিবেশ, দেশ, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে মাঝে মধ্যে বিরক্ত করে।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর বক্তব্য সহজবোধ্য। *আবরণ* প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–''বই পড়াটাই যে শেখা - ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বই-এর সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই।''

মানব সভ্যতার যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে (যদি মেনে নেওয়া হয়) তবে আসুন নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব মহাজ্ঞানী মানুষদের যারা আবিষ্কার করেছিলেন লোহা আর আগুন। এঁদের স্বীকৃতি না জানিয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের স্বমৈথুন বিলাস হাস্যকর লাগে। সত্যজিত রায় পরিচালিত আগন্তুক ফিল্ম নিয়ে কথা বলা যায়। 'এথনিসিটি' নিয়ে যখন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় বনাম উৎপল দত্ত-এর বিতর্ক চলছিল তখন ধৃতিমান-এর একটি 'লুজ বলে' উৎপল দত্ত 'ওভার বাউন্ডারি' মারলেন। বরফের দেশের এস্কিমোদের বরফের তৈরি তাঁবু ঘর (ইগলু) নির্মাণের সময়ে ঘরের জানলা দরজা বানানো হয় যা স্বচ্ছ। ভিতর বাহির থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। এস্কিমোদের জ্ঞান, বোধ, মেধা, জীবন থেকে শেখা, সবই আধুনিক দুনিয়ার মানুষদের তুলনায় কম ছিল না। কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রমের মধ্যে ঐক্য এবং ফারাক নিয়ে কমিউনিস্ট, সমাজবাদী মহলে কম লেখালেখি হয়নি। আলফ্রেড রেথেল-এর বই *বৌদ্ধিক এবং শারীরিক শ্রম* (প্রকাশক-ম্যাকমিলান), হ্যারি মাগ্‌ডো লিখিত প্রবন্ধ– মান্থলি রিভিউ- অক্টোবর ২০০৬, পড়ে নিলে সুবিধাই হবে। হাতের কাছে অবশ্য রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আছেন। উৎস মানুষ, জানুয়ারি, ১৯৯৩, উৎস মানুষ - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, চেতনা স্মারক গ্রন্থ- ১৯৯২-১৯৯৩ তে শ্রী ভট্টাচার্য লিখেছেন প্রথাগত শিক্ষার বাইরের দুনিয়া থেকে কী কী শেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয় থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

''আজন্ম যারা এই পরিবেশে 'মানুষ' হয়, তাদের পক্ষে প্রবাহ পতিত না হওয়াটাই আশ্চর্য। স্কুল কলেজে পাঠ্যবই থেকে ছেলেমেয়েরা যা শেখে নিশ্চয়ই তার মূল্য আছে। কিন্তু তা দিয়ে, আর যাই হোক বিচারবুদ্ধি তৈরি হয় না। 'ভালো' ছেলেরা পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়ানো ছাড়া আর কিছু বুঝতে চায় না, যা পরীক্ষায় কাজে লাগবে না তা বাতিল।'' (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য- *কামারের এক ঘা* - পাভলভ ইনস্টিটিউট, পৃঃ৬৭)। ''যে শিক্ষা শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় মাত্র, তা কখনোই বেশিদূর যেতে পারে না। চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তোলা দূরস্থান, তাকে আরও পঙ্গু করে দেওয়াই তার কাজ। বিটেক, এমএসসি পাশ করেও যদি কাজ না জোটে তবে সে শিক্ষার মূল্য নিয়ে সন্দেহ জাগবেই। অর্থনীতির বই-এ যা লেখা থাকে দেশ সেভাবে চলে না। কলেজে যে হিসাবশাস্ত্র শেখানো হয়, কম্পানিগুলো সে কায়দায় হিসাব রাখে না। তাদের অন্য রেওয়াজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন কলকারখানায় চলছে না, নতুন করে সব কায়দা কানুন শিখ তে হয়''। ''আরও বেশি জানা বোঝার ও করার ভেতর দিয়ে মানুষ উন্নত জীব হয়ে ওঠে। টিকে থাকার ভাবনা মিটলে তবে আসে চিন্তার অবকাশ। তারজন্যই দরকার পড়ে নিজে ভাবার ক্ষমতা'' ...।

অনেকেই ভাবেনঃ– ''প্রথাগত শিক্ষা থাকলে লোক 'মানুষের মতো মানুষ' হয়ে

ওঠে। সভ্য ভদ্র হয়, কুসংস্কার অন্ধতা কেটে যায়, স্বার্থসর্বস্ব হয় না, পরের ভালো চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই মোহকে লালন করে সংসার-সমাজ-রাষ্ট্র। কিন্তু মোহটা মোহই" (ভট্টাচার্য)

এবার আসি পাওলো ফ্রেয়ার (১৯২১-১৯৯৭)-এর কথায়। পাওলো ফ্রেয়ার-এর সম্পর্ক চেতনা লহর-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১ সংখ্যায় শুভঙ্কর চন্দ বিশিষ্ট চিন্তক রিচার্ড শল-এর লেখা *নিপীড়িতের শিক্ষা বিজ্ঞান (পেডাগজি অব দ্য অপ্রেসড্)*-এর ভূমিকাটিকে অনুবাদ করেছিলেন। এরপর শুভঙ্কর চন্দ তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা বিশিষ্ট নাটককার তীর্থংকর চন্দকে সাথে নিয়ে প্রকাশ করলেন পাওলো ফ্রেয়ার-এর *পেডাগজি অব দ্য অপ্রেসড*-এর বাংলা অনুবাদ। একটি অসাধারণ কাজ করেছেন শুভঙ্কর-তীর্থঙ্কর। প্রকাশনা কালে ওঁদের নতুন ''বন্ধু" জুটেছে। পুরনো বন্ধুদের সাথে মানসিক দূরত্ব বেড়েছে। তবুও শিক্ষা যে কোনো পণ্য নয়, এর কোনো মজুতদারী (ব্যাঙ্কিং) হয় না, শিক্ষক-ছাত্রর সম্পর্ক দাতা গ্রহীতার নয়, প্রথাগত শিক্ষাজগতের বাইরের শ্রমজীবী কৃষক বা শ্রমিক সর্বার্থে শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন *নিপীড়িতের শিক্ষা বিজ্ঞান* না পড়লে জানা যায় না। তবে লিবারেশন থিওলজি (সলিল বিশ্বাস-এর অনুবাদে মুক্তির জন্য ধর্মতত্ত্ব) যে শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা হয়ে যায় তা পাওলো ফ্রেয়ার-র শেষ জীবনে খৃষ্টীয় যাজক হয়ে যাওয়াতে পরিষ্কার বোঝা যায়। এ বিষয়ে পাওলো কন্যা স্টিফনির সাথে পিতা-সন্তানের পত্রযুদ্ধ পড়ে নিতে হবে। লিবারেশন থিওলজিস্টদের ভাবনা বেশ মজার। অনেকটা ধারালো ছুরির মতো, গলা কাটা যায়, ফলও কাটা যায়। ভেনিজুলিয়ার সুপরিচিত লিবারেশন থিওলজিস্ট কার্ল স্যামশন-এর বক্তব্য কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল জার্নালে (১৯৬৫) পাওয়া যায়ঃ- যখন মার্কিন সেনাবাহিনী ভিয়েৎনামের মাটিতে মারাত্মক নাপাম বোমা ফেলছে তখন যিশু খ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ বা হজরত মহম্মদ জীবিত থাকলে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট বন্দুক ধরতেন। যথেষ্ট কষ্টকল্পনার প্রতিফলন এতে কোনো সন্দেহ নেই। পাওলো ফ্রেয়ার সহ অন্য লিবারেশন থিওলজিস্টদের ইতিবাচক এবং না-ইতিবাচক কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ স্তরের ধারণা তৈরি করতে হলে নিকারাগুয়ার আনেস্তো কার্দেনাল, কলম্বিয়া-র কামিলো তোরবেস-এর 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড দি লেফ্‌ট' শিরোনামে বেশ কিছু প্রবন্ধ, যা মান্থলী রিভিউ— ভল্যুম- ৩৬, নম্বর ৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল, পড়ে নিতে পারলে সুবিধা হয়। এ বিষয়ে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর মতামত জানা যাক— ''আসলে ধার্মিকদের সাথে কমিউনিস্টদের খোলা মনে আলাপ চলে কখন? যখন, দুপক্ষই শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি। দরকার পড়লে হাতিয়ার ধরতে গররাজি নন। (মননের স্মৃতি - পৃঃ-৮৫)।

সারা পৃথিবীর মার্কসবাদী শিবিরের এই আপাত সংকটকালে যখন কয়েকজন

পাওলো ফ্রেয়ার, রোজা লুক্সেমবার্গ, আন্তোনিও গ্রামশি-এর ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে 'কোমরের নীচে আঘাত' করতে চাইছেন তখন শুভঙ্কর, তীর্থঙ্কর, সলিল বিশ্বাসদের এই সৎ প্রচেষ্টা 'ট্রয়-এর ঘোড়া' দের জন্ম দেবে না তো? লোডশেডিং এর বাজারে অন্ধকারে অচল টাকা চালিয়ে দেওয়া যায়।

ইতি টানার আগে দু-একটি কথা সেরে নিই। মেধা-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রথাগত শিক্ষায় পাওয়া নশ্বর জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে যারা উচ্চশিক্ষালয়ে বা কর্মস্থলে বিশ্বাস, মণ্ডল, কিস্কু, মাহাতো, রহমান, সাকিনাদের প্রবেশাধিকার রুখে দেয় বা একবার ঢুকে পড়লে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে দ্বিধা বোধ করে না তাদের ইন্টারনেট ঘেঁটে উক্ত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানার অনুরোধ করছি। অবশ্য বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে এদেশে খুব বেশি কাজ হয়নি। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ীর ভাষায় বর্ণান্ধদের তর্কে হারাতে হলে মানবিক মূল্যবোধের সাথে সাথে বিজ্ঞান-দর্শন বা দর্শন বিজ্ঞান চর্চা খুবই দরকার। চুনী কোটাল, রোহিত ভেমুলার মৃত্যু 'নব-জাগরণ'-এর উত্তরাধিকারীদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়নি।

চুনী-রোহিত, তোমরা ঘুমাও
আমরা জেগে আছি –

আসুন, 'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইদের' সংগ ছেড়ে 'মূর্খ মাঝিদের' কাছ থেকে মুক্তির প্রথম পাঠ নিই।

শ্রদ্ধা বনাম শ্রাদ্ধ

উত্তম সরকার, বয়স ৪০, শিয়ালদহ ক্যানিং রেলপথে ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশন থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। উনি কোনো ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেননি, বামুন পুরোহিত ডেকে ধর্মানুষ্ঠান, মাথা ন্যাড়া হওয়া, 'হবিষ্যি' খাওয়া, বিশেষ ধরনের পোষাক পরা প্রভৃতি থেকে দূরে থেকেছেন। [এই রচনায় এরপরে সংক্ষেপে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলা হবে, বাকি আচরণগুলি বুঝে নিতে হবে]। উত্তম নিজেকে খাঁটি মতুয়া বলতে দ্বিধা করেন না। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, আম্বেদকরকে শিক্ষক হিসেবেই মানেন। মতুয়া কবিগানের জগতে উত্তম একটি সুপরিচিত নাম। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কেন তিনি প্রচলিত পদ্ধতির বিপক্ষে গেলেন? স্বভাব কবি উত্তম জানালেন —

বোধবুদ্ধির দরজাতে তুমি যখনই দিলে তালা
জেনে নাও হে এখন তোমার ঘরে পুরুত আসার পালা
সারাজীবন যদি কর সন্তান-এর কর্তব্য পালন
জেনে নাও হে তাই হবে আসল ধর্মাচরণ।

আম্বেদকরবাসী আন্দোলনের সুপরিচিত সংগঠক চিকিৎসক গুণধর বর্মন-এর মৃত্যুর পর পুত্র শুভঙ্কর (লালু) প্রচলিত পদ্ধতি এড়িয়ে যান। বাগজোলা খালপাড়ের কলোনীর (দমদম) বাসিন্দা বিজন হাজরা, গোপাল বর্মন, কালিকাপুরের বিশ্বনাথ মণ্ডল স্বজন বিয়োগে কোনো ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেননি। স্মরণসভায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাঁরা জানান দেন যে পুরোহিতরা প্রতারক ছাড়া কিছুই না। মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে এরা রোজগার করে।

গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎ হাতিবাগানের বিজ্ঞান চেতনার সংগঠক। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দালনে এদের ভূমিকা অনবদ্য। গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎ তাঁদের বাবা-মা -এর মৃত্যুর পর কোনো শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন নি। প্রত্যেক বৎসরের বিজ্ঞান মেলার

মাধ্যমে ওরা যে ধরনের কুসংস্কার মুক্তির প্রচার চালান তাতে ওঁদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করাই স্বাভাবিক। ওঁদের প্রত্যেক দিনের জীবনচর্যা এরকমই যে ওঁদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ওঁদের এধরনের কাজে বিস্মিত হন নি, প্রশ্নও তোলেন নি। ওঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী রামবাবু কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, ''ভুল করে একবার বলেছিলাম যে সমাজটা তেমন এগোয়নি, একটু সমঝোতা করলে হয় না? ওঁরা এমন সব যুক্তি তুলল যে আমি পালাবার পথ পাইনি। সংস্কৃত মন্ত্রের এমন বাংলা মানে করে দিল যেন এই কদিন আগে নবদ্বীপের টোল থেকে পড়ে এসেছে। ওইসব মন্ত্রে এতসব বাজে কথা আছে তা তো জানতামই না। কমবয়স্কদের কাছে তর্কে হারার লজ্জা বড় ওজনদার হয়।''

অমল রায়— একাঙ্ক নাটক চর্চার দুনিয়ার নাট্যকার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত নাটক মফঃস্বল-এর নাটকের দলকে প্রতিবাদী বিকল্প সংস্কৃতি চর্চায় সাহায্য করেছে। আমরা বরং অমল রায় তথা তপন দাশ-এর ব্যক্তিগত জীবনের একটু ছবিটা দিই। কলেজের প্রথম পর্যায়ে কিছুদিন হাংরি সাহিত্য চর্চার পর নকশালবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন (তথ্যসূত্র ঃ দিগন্ত বলয়, রচনা– সুধাংশু সেনগুপ্ত, বর্ষ ৩১, সাল ২০০৩, পৃ-৮) দু-তিন বছর। তারপর কবি তুষার রায়-এর ভাষায় —

''শান্তির মিছিলেতে ছিলে পুরোভাগে

ধরপাকড়ের দিনে কেটেছো সব থেকে আগে''

এরপরে ফরোয়ার্ড ব্লক-এর সাথে যুক্ত হন (তথ্যসূত্রঃ দিগন্তবলয়, বর্ষ-৩১, ২--৩, পৃ-১১, রচনা - অপরাজিতা গোপ্পী)। ''সুখী দুই গৃহকোণ বাজে গ্রামোফোন'' জীবনযাপন করার সাথে সাথে শুরু করেন নাট্যকার জীবন। ৭৮ সালে মাতৃবিয়োগের পর সম্পূর্ণ ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। ৮০-এর দশকের শেষে পিতৃবিয়োগের পর একই ধরনের অনুষ্ঠান পালন করেন। বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল এই শতাব্দীর প্রথম পর্বে। তার দুই ভাইপো যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা পিতৃবিয়োগে (তপন দাশ-এর দাদার মৃত্যুতে) স্মরণসভা ছাড়া আর কিছুই করবেন না, তপন দাশ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব দায়িত্ব নিজেই পালন করলেন। অশৌচ পালন, অদ্ভুত পোষাক, পুরোহিতকে আহ্বান প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তপন দাশ-এর এক ভাইপো তাপস বস্তুবাদী দর্শনের অধ্যাপক প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা তাপসীর জীবনসঙ্গী। তাপসরা যখন স্মরণসভার আয়োজন করছিলেন তখন তার কাকা বিপ্লবী নাট্যকার অমল রায় পুরোহিততন্ত্রের বেড়াজাল কাটতে পারলেন না।

দেবেশ রায় (প্রখ্যাত সাহিত্যিক) কৈশোর থেকে কমিউনিস্ট দলের সদস্য। মাতৃ-বিয়োগের পর পরিচিত জনকে হতবাক করে 'ধরাচূড়া' পরলেন। বিস্মিত প্রতিবেশী অনুরাগী যুবকের প্রশ্নে দেবেশবাবু আত্মপক্ষ সমর্থনের লজ্জাহীন প্রচেষ্টা — ''আমার ঘরে যে গোয়ালিনী দুধ দিতে আসে, যে সহায়িকা ঘরের কাজ করে তাদের মনে আঘাত দেওয়ার অধিকার আমার নেই''।

রামপদ মণ্ডল, বয়স ৪৫ বছর, গোসাবা ২নং ব্লকের বাসিন্দা। কলেজ জীবন থেকে একটি বামপন্থী দলের কর্মী সদস্য। বর্তমানে একটি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পিতৃবিয়োগে শ্রাদ্ধ না করায় গ্রামের প্রতিবেশীদের আত্মীয়-স্বজনের তরফ থেকে কোনো অসুবিধা ভোগ করেন নি। কিন্তু নিজ কর্মস্থল স্কুল থেকে 'সাসপেন্ডেড' হলেন। বিস্মিত রামপদ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক এবং তাঁর নিজের দলের বিধায়ক-এর সাথে দেখা করে বিস্ময় এবং অভিযোগ জানালেন। বিধায়ক নেতার সরাসরি উত্তর— ''জনমত তোমার এই কাজের পক্ষে নেই। আমাদের তো মানুষজনকে নিয়ে কাজ কারবার। আর তাছাড়া শুনলাম যে ক্যানিং বইমেলা থেকে তুমি রাহুল নামে একজন ছদ্মনামধারী নকশালের (রাহুল সাংকৃত্যায়ন - লেখক) লেখা স্তালিনের জীবনী কিনে এনে লোকজনকে পড়াচ্ছ। এরপর আমাদের দল তোমার পাশে থাকতে পারে না''। এরপর সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিজ্ঞান সংগঠনগুলির সহযোগিতা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের একাংশর উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তর এবং আদালতে দৌড়ঝাঁপ করে রামপদ 'সাসপেনশন'থেকে রেহাই পেল। স্থানীয় জনমত তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। রামপদ এখন দলদাসত্ব থেকে মুক্ত।

নিতাই আদক, বয়স ৫৫, আমতলার (বিষ্ণুপুর থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) বাসিন্দা। ২০০৫ সালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। একটি বামপন্থী দলের সদস্য এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান ছিলেন। কর্মসূত্রে একটি বৃহৎ জুতা প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে সেখানকার কর্মী সংগঠনের মাঝারি স্তরের নেতাও ছিলেন। মাতৃবিয়োগে ধর্মীয় নির্দেশ না মানার কারণে তাঁর এক জ্যাঠামশাই, এলাকার জনৈক দলনেতা এবং তাঁর কর্মস্থলের ইউনিয়ন নেতাদের বিরাগভাজন হন। এরপর যা ঘটে তা হল পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি দলের টিকিট পান না এবং কর্মচারী ইউনিয়ন-এর পদটিও খোয়া যায়। নিতাইবাবুর অবশ্য এ কারণে কোনো অনুতাপ হয়নি।

গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎরা বস্তুবাদী দর্শনচর্চা, পড়াশুনা এবং তা প্রতিমুহূর্তে প্রয়োগে

বিশ্বাসী। নিকটজন বিয়োগে শোক পালনের এনারা প্রচারও চান না। স্ব-অভিভাবক হওয়ার কারণে গোসাবার রামপদ বা আমতলার নিতাই-এর মতো এঁদের হারাবার কিছুই নেই। এদের জেতার জন্য আছে বিশ্বাস পালনের তৃপ্তি। রামপদ, নিতাই যা হারিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা নিঃস্ব হন নি।

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অনুশাসনের ধর্মগ্রন্থভিত্তিক বিষয়ে আলোচনার আগে উৎপল দত্ত রচিত, পরিচালিত দিন বদলের পালা নাটকের সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রটির একটি সংলাপ জানাইঃ- কাল সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরার পথে গলি থেকে দুটো গুণ্ডা আমার পেটে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, ‘‘ঘড়ি, অংটি, মানিব্যাগ দিয়ে দে নইলে জানে মেরে ফেলব’’। আমি বললামঃ- জানে মারার পর কি আর তোমরা ঘড়ি, আংটি, মানিব্যাগ আমার কাছে রেখে যাবে?

ভয় দেখিয়ে অর্থসম্পদ লুঠ আইনগত অপরাধ। অথচ এই ধরনের বেআইনি কাজ ধর্মাচরণের নামে চলছে কয়েক শতাব্দী জুড়ে। পুরোহিত দর্পণ-ও (পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত সত্যনারায়ণ লাইব্রেরি দ্বারা প্রকাশিত) সংকলন জানাচ্ছেন (পৃ. ৪) যে বঙ্গাব্দ ১২৯৮-এ (১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ) পুরোহিত দর্পণের প্রথম প্রচার। গবেষক মহল সুরেন্দ্রমোহন-এর সাল নির্ধারণের বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকলেও এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে ১৩১১ বঙ্গাব্দ ১৩ শ্রাবণ অনন্তপুর হইতে সংকলিত উক্ত পুরোহিত দর্পণ বঙ্গ হিন্দু সমাজে সাদরে গৃহীত। পুরোহিত দর্পণ-এর পৃষ্ঠা ৫৬৫-৭৭০ পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যে অর্থ-সম্পদ লুঠ-এর নির্দেশ। দান সাগর বিধিঃ (পৃ ৭৬৮ - ৭৭০) (১) দক্ষিণা, (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ, (৬) অন্ন, (৭) তাম্বল, (৮) ছত্র (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য, (১১) ফল, (১২) শয্যা, (১৩) পাদুকা, (১৪) গো, (১৫) কাঞ্চন (১৬) রজত।

উপরোক্ত দান সামগ্রীর মধ্যে কয়েকটি বাদে বাকিগুলির মুদ্রামূল্য নেহাত কম নয়। একজন ভালো দাবা খেলোয়াড় যেমন বুদ্ধিযুক্ত ‘চাল’ দিয়ে তার ঘুঁটিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে তেমনই পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ মারফত দানসামগ্রী হস্তান্তরের পর মৃতজনকে প্রেতলোক থেকে দেবলোকে স্থানান্তরিত করেন।

জনলোক পৃথিবী থেকে তপলোক (দেবলোক)-এর দূরত্ব আট কোটি যোজন মাইল। মাঝপথে পড়ে বৈতরণী মহানদী। (সূত্রঃ গরুড় পুরাণ, উঃ খণ্ড, ৭৪ অধ্যায়)। সমস্ত ধরনের দান-এর মুদ্রামূল্য হিসাব করলে এই দীর্ঘ যাত্রার খরচ বেশ কম। [মঙ্গলগ্রহে অভিযান-এর অর্থ লগ্নিকারকগণ এ বিষয়ে পুরোহিতদের পরামর্শ নিতে পারে]

। 'বৃষোৎসর্গ' না করে গয়ায় পিণ্ড দিলেও কোনো ফল লাভ হয় না। তাতে প্রেতের কোনো উপকার হয় না। (গরুড় পুরাণঃ উত্তর খণ্ডঃ ৭ অধ্যায়)। পুরোহিত দর্পণের ৪র্থ খণ্ডের ৫৬৪ পৃষ্ঠা থেকে ৭৭০ পৃষ্ঠায় মৃতকে ২৬৪ বার প্রেত আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রেতত্বমুক্তির জন্য দানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণঃ- 'যার দেওয়া অন্ন দশজন ব্রাহ্মণ আনন্দে গ্রহণ করেন সে কখনও মনুষ্যেতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। কোনো অধার্মিক যদি ১০ হাজার ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তবে সে যতই অপরাধ করুক না কেন, তা থেকে মুক্তি পাবে' (ব্রহ্ম পুরাণঃ ২১৮ অধ্যায়)

এইসব পুরোহিতকুলের আয় কি দেশের সার্বিক আর্থিক লেনদেনের সাথে কোনোভাবে যুক্ত আছে? প্রত্যক্ষভাবে আছে তা বলা যাবে না। মামলার ভয় দেখি য়ে বড় রাস্তার কনস্টেবল-এর ট্রাক থেকে হাত বাড়িয়ে ঘুষ নেওয়া যেমন পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থদের দুর্নীতির পরিমাণ নজরে পড়ার মতো উদাহরণ বা স্থ্যা ানীয় বিধায়কের 'ফুলে ফেঁপে ওঠা' যেমন বুঝিয়ে দেয় ধরা ছোঁওয়ার বাইরে থাকা বিধায়কের দলের শীর্ষ নেতাদের ন্যায্য আয় বহির্ভূত রোজগারের আনুমানিক হিসাব, তেমনই পুরোহিততন্ত্রকে ভারতের মতো একটি প্রাক্ পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্র কাঠামোর প্রাণভোমরা বা Blood Cell হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পূর্বে আলোচিত তথ্যগুলি আমাদের কয়েকধরনের মানুষদের প্রতিনিধি স্থানীয়দের সাথে পরিচয় করিয়েছিল। (১) উত্তম, শুভংকর, বিজন, গোপাল, বিশ্বনাথ-এর মতো লোকজন অব্রাহ্মণ আন্দোলনের ফসল, দক্ষিণ ভারতে পেরিয়ার-এর নেতৃত্বে যার সূচনা হয়েছিল। এরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধিতা পুরোহিত তন্ত্রকে অবজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁদের বিপ্লব ভূষণ রচিত *শ্রাদ্ধ নয় শ্রদ্ধা* (প্রকাশক - ইপকো), দিলীপ গায়েন রচিত *মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন* (প্রকাশক - জনমন) দুটি বই যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে। শখের তর্কবাগীশদের সাথে এনারা কথাবার্তা চালালে হয়তো ''বিতর্ক প্রতিযোগিতা''-য় জিততে পারবেন না কিন্তু ইহলোক-পরলোক, স্বর্গ-নরক, ইহজন্ম-পরজন্ম সম্পর্কে সার কথা এনারা দলিত আন্দোলন থেকেই শিখে নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের ঠোক্কর এদের বাস্তববাদী করেছে।

গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎ, রামপদ, নিতাইদের মতো মানুষ এ সমাজে বিরল। বিশেষত রামপদ, নিতাই যখন ''পিছিয়ে পড়া গ্রামের পিছিয়ে রাখা'' মানুষদের মধ্যেই বসবাস করেন, 'আদর্শবাদে দৃঢ় থাকার জন্য গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎদের মতো তুলনামূলক অনুকূল পরিবেশে না থাকা সত্ত্বেও যে যে অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছেন তা অনুকরণীয়

এবং প্রশংসাযোগ্য।

অমল রায় (তপন দাশ), দেবেশ রায়দের কার্যকলাপ আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে। দুনিয়ার আধুনিকতম বিকল্প সংস্কৃতি সাহিত্য চর্চাকারদের মনের মধ্যে মারণ ব্যধির মতো সামন্ত যুগের ভাবনা লুকিয়েছিল। এও হতে পারে এদের মতো দ্বিচারী যারা উত্তম, শুভংকর, বিজন, গোপাল, বিশ্বনাথ, গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎ, রামপদ, নিতাই-এর থেকে অনেক বেশি বই পড়েছেন। গুরুগম্ভীর জ্ঞান দিয়েছেন, দুনিয়াকে পাল্টাবার উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু নিজেকে পাল্টাতে পারেন নি। কুসংস্কার মুক্ত হতে হলে মার্কসবাদ নির্দেশিত বস্তুবাদের অনুসারী হতেই হবে এমন কোনো ভাবনা অমূলক। কিন্তু নিজেকে মার্কসবাদে আস্থাভাজন হিসাবে পরিচয় দিতে হলে তাকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে এতে কোনো 'দো রায়' নেই। সম্প্রতি দিল্লির গোপলনভবন থেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট হয়ে একটি বার্তা ছড়ানো হয়েছে যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পৈতে দেওয়া জাতীয় কাজের উপর কোনো বিধিনিষেধ থাকা স্থগিত রইল (বিধিনিষেধ ছিল কি?)। বস্তুবাদের তত্ত্বকথা বাদ দিলেও মন্ত্রোচ্চারণের সাথে বাণ্যিজমনন এবং মৃতের প্রতি যে ধরনের অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় তার থেকে দূরে থাকলেই যথেষ্ট এগিয়ে থাকা মানসিকতার পরিচয় দেওয়া যায়। সাধারণত প্রশ্ন ওঠে এই পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য সমাজ কাঠামো (structure) না সমাজ উপরিকাঠামো (super structure) -এর সাথে জড়িত? সরলভাষায় অর্থনীতি না সংস্কৃতির সাথে যুক্ত? উত্তর একটাইঃ– উভয়ের সাথে জড়িত। ভারতে নবজাগরণ প্রকৃতার্থে সম্পন্ন হলে একটি সুশীল সমাজ গঠিত হতো যে সমাজ দেবেশ রায়, অমল রায়দের সাথে সাংস্কৃতিক লড়াই চালাত। সেদিনের আশায় বুক বেঁধে আছি।

—চেতনা লহর

‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’-এর বাইরেও তর্কশীল আছে

ভাববাদী এবং বস্তুবাদীদের সম্পর্ক অনেকটা লন্ডনের আবহাওয়ার মতো অনিশ্চিত। একই দেশে, একই সমাজে এমনকি একই পরিবারে তারা বসবাস করে। সম্পর্ক কখনও ঠান্ডা, কখনও গরম। ব্যতিক্রমী ঘটনা না ঘটলে ভাববাদী এবং বস্তুবাদীদের বিরোধ অবৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব (Non-antagonistic contradiction)। লিবারেশন থিয়োলজিস্টরা এই দ্বন্দ্বের গভীরতা অনুধাবন না করে এক ধরনের ‘হাঁসজারু’ তত্ত্ব তৈরি করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। এদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনে আকাট বস্তুবাদীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, যাদের অনেকেই তাদের চিন্তাগুরু **রনে দেকার্ত** (ফ্রান্স)-এর নামও জানে না। সমাজবিজ্ঞান চর্চা দূরে থেকে ‘বিশুদ্ধ বিজ্ঞান’ চর্চা যে কাউকে যখন তখন অমানবিক করে তুলতে পারে, তার নমুনা এখানে ওখানে গজানো ‘যুক্তিবাবা’র দল বা তার উপদলের কর্মকাণ্ড। বস্তুবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্যর মতো ভাববাদীদের মধ্যেও বিভিন্ন ধারা দেখা যায়। তর্কপ্রিয় ভারতীয়’-দের মতোই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তর্কের কথা জানা যায়। এতো গর্বের বিষয় যে এই উপমহাদেশে চার্বাক থেকে অজিত কেশকম্বল অথবা অক্ষয় কুমার দত্ত থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ডি.ডি. কোসম্বীর মতো মুক্তমনা মানুষ জন্মেছিলেন কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জিজ্ঞাসুমনাদের সম্পর্কে আলোচনায় অনীহা এক ধরনের সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়। খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বিষয়ে আলোচনা অন্যত্র চালানো যাবে আমরা বরং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তর্কপ্রিয়তা চালু ছিল কিনা সে বিষয়ে একটু নজর দিই। এ রচনার উদ্দেশ্য মোটেই ইসলামকে গৌরবান্বিত করার বাসনা থেকে নয় বরং ওই ধর্মের জিজ্ঞাসু অনুসারীদের সম্পর্কে অজ্ঞতা কাটানোর এক সামান্য প্রয়াস মাত্র। অন্য একটি বিষয়ও আলোচিত হবে যা ক্ষমতাসীনদের সাথে দুর্বল ভাববাদীদের দ্বন্দ্বকে বস্তুবাদীরা কি চোখে দেখবে সে বিষয়ে।

‘‘রুশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভীরু ও অজ্ঞ গোঁড়া রুশ যাজক সম্প্রদায় যদি আত্ম

ন্দোলনে নামে, তবে সমাজবাদীরা অবশ্যই এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। সৎ ও নিষ্ঠাবান যাজকদের এইসব দাবির যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে সাহায্য করতে হবে"— লেনিন-*সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-লরেন্স এন্ড উইজারট*-লন্ডন, পৃষ্ঠা-১৫।

গত ৩ দশক যাবৎ যখন মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদক দেশগুলির শাসন ক্ষমতায় আসীন গোষ্ঠীগুলি এবং ওই দেশবাসীরা আর মার্কিন প্রভুত্বকে মানতে রাজী হচ্ছে না, ইরাক-আফগানিস্তানে সামরিক হামলা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। "ইসলামোফোবিয়া" প্রচারের কেন্দ্র এখন মার্কিন মিলিটারী অ্যাকাডেমি। নিখাদ না-ধার্মিককে যেমন সংস্কৃত শিখে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-র কু-বচনকে নস্যাৎ করতে হয়েছে তেমনই তুলনামূলক ধর্মচর্চার ছাত্রদের 'ধর্মের ইতিহাস' (*ধর্মের ইতিহাস*— সের্গেই তোকারেভ, পিপলস পাবলিশারস-মস্কো) পড়তে হয়।

"ইসলাম এবং সন্ত্রাস সমার্থক। পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলমানই শরিয়ত, কোরান-হাদিস-এর বাইরে ভাবতে পারে না— ইসলাম ভিন্নধর্মীদের প্রতি নৃশংস, অসহিষ্ণু"— (হোসেনুর রহমান— দৈনিক বর্তমান ৭/৯/১৯৮৯)। ইয়াংকিদের প্রচারে ভারতে তো বটেই সারা পৃথিবীতে অনেক অনেক বাঘা সেক্যুলারও প্রভাবিত বা বিভ্রান্ত। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী হিন্দু ধর্ম যেমন সূচনা লগ্নের অসাম্য এবং স্বৈরাচার বীজ বয়ে চলেছে, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ধর্মগুলি কম প্রাচীন হবার ফলে অনেকটাই সহনশীল এবং বৈচিত্র্যময় হতে বাধ্য হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের একজন মুসলমানের জীবনচর্চার সাথে ইস্তাম্বুল, ঢাকা, জাকার্তার মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। মৌল ইসলাম ও লোক ইসলাম তো কখনো কখনো উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব বজায় রাখে।

Pen is mightier than sword (কলম তরবারির থেকে শক্তিশালী)ঃ— এটি একটি নাটকের টুকরো সংলাপ (১৮৩৯ সালের ৭ মার্চ লন্ডনের কনভেন্ট গার্ডেন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটন রচিত *রিচেলু* অথবা *ষড়যন্ত্র* নামে নাটক)। আসলে উপরোক্ত বাক্যটির দোলন চলছিল বহুদিন যাবৎ। মোগল সম্রাট আকবর-এর তরবারীর তুলনায় আবুল ফজলের কবিতা অধিক শক্তিশালী— এরকম ধারণা ছিল তৎকালীন ইতিহাস রচয়িতা মুহম্মদ লতিফ-এর (এশিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসেস)।

হজরত মহম্মদ (The Aur'snan interduction Enclypodia of Arabic LIterature-Julie Scot, Vol-2, P-2) এর কথা— একজন বিদ্বানের কলমের কালি শহিদের রক্তের থেকে পবিত্রতর।

মুতাজ্জেলাবাদীরা কী বলতেন, কী বলেন?

“মুতাজ্জেলাবাদীরা অষ্টম-নবম শতাব্দীর সময়ে সংগঠিত হয়। তাঁরা মুসলিম ধর্মশাস্ত্রকে যুক্তি-তর্কের ঊর্দ্ধে মনে করতেন না। তাঁরা এও মনে করতেন এইসব ধর্মশাস্ত্র মনুষ্য রচিত এবং কোনো অলৌকিক সত্তার বাণী নয়” (ঐ-হিস্টরি অফ রিলিজিয়ন-তোকারেভ, পৃঃ৩৯৬)। মনে রাখা দরকার যে এই সময়কে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হতো যখন বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষত সৌরবিজ্ঞান এবং গণিত (অ্যালজেবরা) বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্য (বিশেষত– বাসরা ও বাগদাদ) পৃথিবীর অন্য প্রান্তের তুলনায় এগিয়ে ছিল। মুতাজ্জেলাবাদীদের সমমনস্ক গোষ্ঠীদের ‘হুকমা’, ‘আলফাসা’, ‘দাহেরী’ বলা হতো। হজরত মহম্মদ-এর পরে খলিফাদের একাংশ যখন ফতোয়া দিল যে কোনো মুসলমান নারী বা পুরুষ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে বিবাহ করিবার আগে জীবনসঙ্গীকে ইসলাম-এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা (কলমা) করে ধর্মান্তরিত হতে হবে, নতুবা ঐ বিবাহ নাজাহেস (অনৈতিক) এবং বিবাহজাত সন্তান অবৈধ ‘জারজ’ ঘোষিত হবে। তখন দাহেরী গোষ্ঠীর মহম্মদ আদালতি (কনসেন্ট পাবলিশিং কোং প্রকাশিত *ইসলাম ইন ফোকাস* গ্রন্থে বহু বিবাহ প্রশ্নে ইসলাম, পৃঃ ১৬৪) বলছেন যে স্বয়ং হজরত মহম্মদ-এর অন্যতমা স্ত্রী মরিয়ম ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে হয়নি এবং তাঁর একটি পুত্রসন্তান ছিল।

বাধ্যতামূলক ধর্মান্তকরণ প্রশ্নে ইস্তাম্বুল এবং জাকার্তার মুতাজ্জেলাবাদীরা এখন হজরত মহম্মদ-এর এই নির্দেশকে মান্যতা দেয়ঃ “তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমার ধর্ম আমার কাছে। তুমি তোমার ধর্ম পালন করো, আমাকে আমার ধর্ম পালন করতে দাও”— (কুরআনঃ- চ্যাপ্টার ৩৩, পৃষ্ঠা-৭)

ইসলাম খলিফাদের হাতে পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেওয়ার আগে দ্বীন (ধর্ম ও দুনিয়া সমাজকে সম-গুরুত্ব দেবার কথা বলত। এই বৈচিত্র্যই দুনিয়াবাদীদের তর্কের রসদ জোগায়। হজরত মহম্মদের জীবৎকালে মদিনাতে যে ধরনের যৌথ খামার, যৌথ শ্রমদানের মডেল (বাইতুলমান) তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল, মুতাজ্জেলাবাদীরা বারবার এর উল্লেখ করে স্বার্থান্বেষী এবং গোঁড়াদের চক্ষুঃশূল হয়েছিল।

গত দুই শতাব্দীতে মুতাজ্জেলাবাদীরা নানারকম আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের কল্যাণে কামাল আতাতুর্ক-এর নাম বাঙালি পাঠক-এর কাছে পরিচিত। কামাল (১৮৮১-১৯৩৮)-এর কর্মজীবনে আধুনিক মুতাজ্জেলাবাদের ছাপ পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে কামাল যখন ইসলামী আইন এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেনঃ— The religion Islam will be elevated if it will cease to the past, (ইসলাম ধর্মের উত্তরণ ঘটানো হবে যদি

তাহা আগের মতো আর রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত না হয়) — (পরিষদে ভাষণঃ ১ মার্চ ১৯২৪ Defenders of Islam-Martin R.C.- Onward Publications-1997)। রাষ্ট্রকে ধর্মের সম্পর্কমুক্ত করার এই প্রয়াসের প্রভাব ভারত উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তকদের মধ্যেও দেখা যায়। গত শতাব্দীতে শিখা, জাগরণ, মহম্মদী, পয়গম সহ অসংখ্য পত্রিকায় আক্রাম খাঁ, দিলওয়ার হোসেন, আব্দুল ওদুদ, আবুল হুসেন লেখকদের প্রচুর রচনায় পাওয়া যায় যাতে বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে তার্কিকদের উপস্থিতির নজির মেলে। রামমোহন রায়-এর সময়েই ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবার পর যিনি প্রধান শিক্ষকের চাকরি পান তিনি আব্দুর রহমান দাহেরী (উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী)। বলে রাখা ভালো যে দাহেরী কথার অর্থ সংশয়ী, যা আরবি ভাষায় নাস্তিক-এর সমার্থক। সেই যুগে এ পদবী ব্যবহারে আব্দুর রহমানের দ্বিধা ছিল না, কোনো অসুবিধাও ছিল না। আল-বেরুনী (৯৭২-১০৫০)-এর ভারত চর্চার সাথে মুতাজ্জেলাবাদীদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বা থাকলেও কীরকম আছে– এ বিষয়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আকাশ চৌধুরী (ভারতীয়) গবেষণা করছেন।

জিন্নার না-ধার্মিক জীবনযাপন সত্ত্বেও তিনি কী কী কারণে মুসলমান তথা পাকিস্তানের নেতা হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর কম হয়নি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ওয়াসিক সিদ্দিকি ১৯৫৩ সালের ১৯ জুন স্টেটসম্যান পত্রিকায় উত্তর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন— "যে কোনো শ্বেতাঙ্গ লোক কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের নেতা হতে পারেন, বেনিয়া বা অস্পৃশ্য কোনো নেতা ভারতীয়দের নেতা হতে পারেন। জিন্নার মতো মুক্তমনা মানুষ মুসলমানদের নেতা হতে অসুবিধা কোথায়?"। পূর্বে উল্লিখিত দুনিয়া (সমাজ)-এর প্রয়োজনে কার্য-কারণ ব্যাখ্যার চাহিদা মুসলিম মননে কম ছিল– এ ধরনের ভাবনা মূর্খ হিন্দুদের স্বমৈথুন বিলাস। মুজতবা আলী, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন কবির সর্বোপরি আরজ আলী মাতুব্বর যথেষ্ট তর্কী ভারতীয় ছিলেন। অবশ্য এনারা সলমন রুশদি বা তসলিমা নাসরিনের মতো তর্ক ব্যবসায়ী নন। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে শিল্প বিপ্লব না হওয়াতে তমসাময় অন্ধকারে ঐ দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিমজ্জিত। নবজাগরণের দুর্বল প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও 'বাঙালির নবজাগরণ'-এর মতো সে বেলুন ফাটতে বেশি সময় লাগেনি। তবুও অতিকথন (Myth)-এর মধ্যে যে স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে হয়তো বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবদমনের ফলে যে পরিচয়-এর সঙ্কট সারা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্তির তাগিদে মুসলিম মনন আরো বেশি তর্কী হয়ে উঠবে। বিশ্ববীক্ষার বিদ্যালয়ের প্রসার লাভ করুক এ আশা রাখা যায়।

—চেতনা লহর

একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রচলিত কিছু কথা

প্রঃ আপনার কথায় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু শব্দগুলি বারবার এসেছে, মুসলমানদের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে আমরা তো কিছুদিনের মধ্যেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হব। এ বিষয়ে আপনি নীরব কেন?

উঃ সেন্সাস কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মুসলমানদের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় .০৩ শতাংশ বেশি। আপনার আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছতে আমাদের আরও ২৮৩০ বছর অপেক্ষা করতে হবে অবশ্য যদি হিন্দুরা ''দো ইয়া তিন ব্যাস' কর্মসূচীকে মান্য করে। হিন্দুরা যদি নিঃসন্তান থাকে তবে এ সময় কমতে পারে। আসলে পরিবার পরিকল্পনার ভাবনা সরকারি স্তরে বা বেসরকারি স্তরে এসেছে ৫-এর দশকের শেষ প্রান্তে। ৪৭-এ ব্রিটিশ চলে যাবার পর নূতন ভারত গঠনের স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে বেশি সময় লাগেনি। ভারত সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে। আমার আগে বলা ২৮৩০ বছরের বিষয়ে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বা সংখ্যাতত্ত্বের ছাত্রের কাছ থেকে জেনে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারেন। সূত্রঃ সেন্সাস বিভাগ, অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট।

প্রঃ মুসলমানরা কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বিরোধী এবং পরিবার পরিকল্পনাকে ওদের ধর্ম-বিরোধী মনে করে।

উঃ কেবলমাত্র মুসলমানরাও যদি এরকম ভাবতেন তবে মুসলিম প্রধান রাজ্যে (যেমন উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল) গুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিহারের তুলনায় বেশি হয়ে যেতো। ইসলাম ধর্মে যেমন বলা হয়েছে নারীদেহ কৃষিক্ষেত্রের মতো অবাধ কর্ষণ করা হোক তেমনি আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে পরিবার পরিকল্পনার প্রাথমিক পদ্ধতি ফয়জল্ (withdrawal system) এর নির্দেশ আছে। সচেতনার অভাব থেকেই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী মার খায় এতে ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ নেই। হিন্দুদের

পূর্বপুরুষের বংশলতিকা দেখলে (এর মধ্যে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারও পড়ে) লজ্জায় পড়ে যাবেন।

প্রঃ মুসলমানরা চারটে করে বিয়ে করে আর ১৪/১৫ টা বাচ্চার জন্ম দেয়, তবুও এসব বলে যাবেন?

উঃ একাধিক বিবাহ করলে সব স্ত্রী প্রতি সমান যত্নশীল হতে হবে এই ধর্মীয় নির্দেশ না মেনে যারা বহু বিবাহ করে তারা আর যাই হোক ইসলাম মানে না। এই কারণেই পৃথিবীর নয়টি দেশে (ইরান সহ) বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের মতো ভারতে নারী পুরুষের সংখ্যার অনুপাত প্রায় ৪৯ শতাংশ ঃ ৫১ শতাংশ। যদি বেশিরভাগ মুসলমান বহুবিবাহে আগ্রহী হতো, তবে তাদের বিবাহযোগ্য মুসলিম নারীর অভাবে হিন্দুঘরের জামাই হতে হত। ফলে বেচারা বেশিরভাগ হিন্দু যুবককে উপযুক্ত পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত বা চিরকুমার থেকে যেতে হতো। বাস্তবে তা ঘটেনি বা ঘটার সম্ভাবনা কম। আসলে একসময় আরব দুনিয়ার যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে পরাজিত শত্রুসম্পত্তি (মহিলাদেরও সম্পত্তি ধরা হতো) জয়ীর ভোগ দখলে যেত। বহুবিবাহের চল সেই সময় থেকে। হজরত মহম্মদ সেটা কমিয়ে ৪ এর বেশি নয় এবং বিভিন্ন শর্তাবলীর নির্দেশ দেন। একাধিক বিবাহে মুসলিম পরিবারের স্ত্রীগণের সমান মর্যাদা এবং অধিকার আইনসম্মত। বিখ্যাত রবিশংকর, উত্তমকুমার, ধর্মেন্দ্রর মতো 'উপপত্নী' নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় না।

প্রঃ এতগুলো দাঙ্গার কথা বললেন যেখানে শুধু হিন্দুদেরই দোষ দেখলেন। মুসলমানদের কোনো দোষ কি নেই?

উঃ আমি একবারও দাঙ্গার শব্দটি উচ্চারণ করিনি। হিন্দুদেরও অভিযুক্ত করিনি। ৪৭ সালের পর সংখ্যালঘুদের উপর যতগুলি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তা রাষ্ট্রীয় নীতির বাস্তব প্রকাশ। এদেশের রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবনায় পরিচালিত। ফলে রাষ্ট্র দলিত বা সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালাবে, খুন, ধর্ষণ করবে, সর্বস্বান্ত করবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্রাংশ এই মানবতাবিরোধী যুদ্ধে রাষ্ট্রের সহায়তা করে। বাকি অংশের নীরবতা এই স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেয়। মুসলমানরা যতদিন ঘেটো কমপ্লেক্স থেকে বেরোতে না পারবে ততদিন তাদের এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই বসবাস করতে হবে।

প্রঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তান জিতলে মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজারে বাজি পটকা ফাটানো হয়। এটা কি সমর্থনযোগ্য?

উঃ আপনি ঐ পটকার আওয়াজ নিজে কিম্বা অন্যের মুখে শুনেছেন। আমি ঐ বাজি পটকা ফাটানো নিয়ে মুসলিম মহল্লায় মারপিট– ফলে থানা পুলিশের ঘটনাও জানি। সবদেশেই সংখ্যালঘুদের এই সমস্যা আছে। আমি দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাই। ফুটবলার প্রশান্ত ব্যানার্জীর বাড়িতে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সার্ক ফুটবল ফাইনালের ভারত বাংলাদেশ ম্যাচের ভিডিও দেখছি। ভারত ১-০ গোলে জিতেছে। ম্যাচের শেষে ভারতের পতাকা নিয়ে সুদীপ চ্যাটার্জী প্রশান্ত ব্যানার্জী মাঠের চারপাশে দৌড়চ্ছে। স্টেডিয়ামের এক প্রান্তে ভারতের পতাকা হাতে আনন্দোচ্ছল একদল দর্শককে দেখলাম। প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করলামঃ- ওরা এতজন ভারত থেকে ঢাকা গেছে খেলা দেখতে? প্রশান্ত -র ভুল উত্তরঃ- 'ওরা বাঙালি'। তারপর ভুল শুধরে প্রশান্ত-র উত্তর, 'ওরা বাংলাদেশের হিন্দু কিন্তু ইন্ডিয়ার সাপোর্টার। ভারতের জয়ে ওদের আনন্দ।'

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ঃ বাল্যকালে লর্ডসের মাঠে ইংল্যাণ্ড (তখন এম.সি.সি.) বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি। এক ডাকাবুকো ক্যারাবিয়ান বোলারের দ্রুত বলে কেন ব্যারিংটন মাথায় আঘাত পেলেন। লজ্জিত ক্যারাবিয়ান খেলোয়াড়রা কেনকে ঘিরে ধরল। মাঠে চিকিৎসকও এলেন। দর্শকাসনে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে দেখলাম পরমানন্দে সিটি বাজাতে আর নাচতে। ওরা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এসেছে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে পাশে বসা লন্ডনবাসী আত্মীয়ের উত্তরঃ- ওরা ব্রিটিশ, ব্ল্যাক ব্রিটিশ, শ্বেতাঙ্গ আঘাত পেলে ওদের আনন্দ।

প্রঃ মুসলিম সমাজে মেয়েদের অধিকার কম। সবসময়ে বোরখা পরিয়ে রাখা হয়।

উঃ আমার ঠাকুরদাদা আমার মাকে বলতেন যে গৃহবধূদের বাড়ির বাইরে গেলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে যেতে হয়। এতো বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। ১৪০০ বছর আগে হজরত মহম্মদ মেয়েদের পোষাকে শালীনতা বজায় রাখতে বলেছিলেন, তখন এটা অস্বাভাবিক ছিল না। এখন মুসলমান সমাজে মেয়েদের পোষাক নিয়ে তুমল বিতর্ক চলছে। কোনো ধর্মগুরু বা সরকারের নির্দেশে নয়, মেয়েরা তাদের পোষাক নির্বাচনের দায় নিজেরাই নিক। বিদ্যাসাগর মহাশয় শত চেষ্টা

করে বিধবা বিবাহের আইন পাশ করিয়েছিলেন, আজও হিন্দু পরিবারে বিধবা মানে বাড়ির অঘোষিত সহায়িকা (চলতি কথায় ঝি) বা কাশী-বৃন্দাবন- মথুরার ভিখারিনী। মুসলিম সমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ এবং মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার বহু আগে আইনানুগ হয়েছে। সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের মতো এই অধিকার আদায় করার আন্দোলন দুর্বল।

প্রঃ আপনাকে তো নাস্তিক মনে হচ্ছে, আপনি কি ধর্মকে আফিম মনে করেন?

উঃ আমার মতে সব ধর্মই প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেওয়ার আগে আর্তের আর্তনাদ, অসহায়ের সহায়, পীড়িতের দীর্ঘনিঃশ্বাস। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মজুরের ঘাম মাটিতে পড়ার আগে মজুরী দিতে বলেছিলেন। খেতে বসার আগে কোনো প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় আছে কিনা খোঁজ নিতে বলেছেন। সেই ধর্ম আজ একদল অশিক্ষিত মোল্লা আর তেল ব্যবসায়ীদের টিকে থাকার হাতিয়ার। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে গৌতম বুদ্ধ অমানবতা আর ভগবান তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন । তিনি আজ বিলাসী দলাইলামার হাতে বন্দী। যীশুখৃষ্টের দেহ থেকে বহমান রক্ত আজ ভ্যাটিকান সিটির পোপ পলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্বর্ণমুদ্রা জমায়।

আজ এমন একটা সময় এসেছে যেখানে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে কতটা মানবিক, কতটা বস্তুবাদী, কতটা আধুনিক। কোনো পার্থিব সমস্যার অপার্থিব সমাধানের খোঁজ করাটা মূর্খামি।

মনুস্মৃতির গর্ভজাত ব্রাহ্মণ্যবাদের জেলখানা থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করার চেষ্টা শতবার করলেও আজ তা অসম্ভব। ভারতে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে আধুনিক রূপের নাম ব্রাহ্মণ্যবাদ।

কোচবিহার কলেজে আলোচনাসভার পর
জনৈক ছাত্রের সাথে কথোপকথন
৭ অগস্ট - ২০০৪

ত্বকের যত্ন নিন

কোনো গান, সাবান বা ওষুধের প্রচার নয়; ত্বক চর্চা প্রবন্ধের বিষয়ও নয়। মূল বিষয়ে প্রবেশপথের সাথী মাত্র। কোনো সুস্থ বয়স্ক মানুষ নিজের ত্বক পরিষ্কারের দায়িত্ব নিজে নেবেন— এটাই স্বাভাবিক। যদি দেখা যায়— দুজন সুস্থ বয়স্ক মানুষ প্রকাশ্যে সাবান হাতে পরস্পরের শরীরের চামড়া সফেদের কাজে নেমে পড়েছেন— তা কাম্য নয়, দৃষ্টিনন্দনও নয়।

মূল বিষয়ে আসা যাক। ভারতে নিরীশ্বরবাদী, না-ধার্মিক, হেতুবাদী, ঘোষিত-অঘ্ন ঘোষিত-স্বঘোষিত সেক্যুলার মানুষের সংখ্যা প্রতি শতে প্রায় ২০ জন। এদেশে যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাধিক (আদিবাসীদেরও যখন হিন্দু হিসাবেই গণনা করা হয়), ফলে উপরোক্ত ২০ শতাংশের অধিকাংশই হিন্দু পরিবার জাত। অবশ্য এই সংখ্যাতত্ত্বকে অনেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখেন। গর্ব সে কহো হাম্ হিন্দু হ্যায়— স্লোগানদাতারা তো বটেই, অনেক হিন্দু পরিবারজাত সেক্যুলার মুক্তমনা মনে করেন যে সংখ্যালঘু শ্রেণির (বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়) মানুষের মধ্য কুসংস্কার মুক্তির প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনা দুর্বল। সিংঘল- আদবানিরা কর্কশ ভাষায় একথা বলেন, প্রগতিবাদীরা বলেন শালীন ভাষায়— মর্মবস্তুতে খুব একটা ফারাক থাকে না। ভাবনার দুনিয়ায় এও এক ধরনের আধিপত্যবাদ - সংখাগুরুর আধিপত্যবাদ, যে রোগে সেক্যুলাররাও আক্রান্ত হন অনেক সময়।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার জীবাণু মাথায় থাকলে যেমন ভাবা হয় যে বামুনের ছেলে তো লেখাপড়া শিখবেই, ডোম-মুচির ছেলে পড়াশুনায় খুব বেশি এগোবে না বা পুরুষতান্ত্রিকতা যেমন 'মেয়েরা একটু কম বোঝে' জানে ধরনের ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দেয়। দক্ষিণ মধ্য বাম যে গ্রহের বাসিন্দাই হোন না কেন যদি মাথায় থাকে যে এদেশে রেনেসাঁস সফল হয়েছে— হিন্দু সমাজে সংস্কারকগণ সমাজটাকে আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত করে তুলেছেন— গোড়ায় গলদ এখানেই জন্মায়। একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই আমাদের আধুনিক, আলোকোজ্জবল, মানবিক দুনিয়ায়

নিয়ে যেতে পারবে না। সব ধর্মই তার শৈশবকালে বেড়ে উঠেছে পীড়িতের আর্তনাদ, অসহায়ের দীর্ঘশ্বাস, যুক্তিহীন আবেগ নিয়ে। সময়ের সন্ধিকালে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে তা হয়ে দাঁড়ায় জীবনঘাতী নেশার দ্রব্য। ভারতে হিন্দুত্ববাদ এমনই সংক্রামক যে তা কখ নো দমনকারীর হাত ধরে, কখনো বা সেক্যুলার ভেকধারী উপদেষ্টার হাত ধরে সমাজ সফেদের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ফল হয় মারাত্মক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তার ''ঘেটো কমপ্লেক্স'' থেকে না বেরিয়ে থেকে যেতে চায় বদ্ধজলায়। অন্ধকার ঘরে আটকে থেকে তারা প্রান্তিক বা খণ্ডিত সংস্কৃতির মধ্যে খোঁজে তার আত্মপরিচয়। অবাস্তব সুখস্বপ্নে (প্রকৃতপক্ষে অসুখ) তার দৈনন্দিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তিপথ খোঁজে ।

''বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'' বাক্যবন্ধটি যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার লক্ষ ভাগের একভাগও বাস্তবে প্রয়োগ হয়নি। ভারতীয় সেক্যুলারদের বৃহদাংশের সমস্যা এই যে তারা যখন ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন তখন বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রাখেননি বা যখন বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন ঐক্য বাতিল। এর কুফল এই যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের দাবির সময় এই সেক্যুরালরা মনেই রাখেন না যে জনসঙ্ঘীরা বহুকাল যাবৎ একই কথা ভিন্ন ভাষায় বলে আসছে।

সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ধর্মীয় বিধানের প্রাচীন জালে আটকে আছেন— এটা বাস্তব ছবি নয়, আংশিক প্রতিফলন মাত্র। মুতাজ্জেলাবাদীরা যে জিজ্ঞাসু মানসিকতার দরওয়াজা খুলেছেন ১৩০০ বছর আগে তা আজও হাজার ঘাত-প্রতিঘাতে বন্ধ হয়নি। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির তুলনামূ লক পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় সেইসব দেশগুলোর বেশিরভাগ মানুষের জীবনচর্চা শাস্ত্রীয়বিধান নির্দেশিত পথে নয়। উপরন্তু সময়, অঞ্চল-বৈশিষ্ট্য তাদের ইতিবাচক পথে নিয়ে যাচ্ছে। পৌত্তলিকতা বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে খলিফাদের নির্দেশে মুসলমানরা না জেনে ছবি লাগানোর মত অধর্মীয় কাজে দ্বিধা করেন না। ইসলামী শাস্ত্রীয় বিধানে যেহেতু সুদ দেওয়া বা নেওয়া আপত্তিকর ফলে মুসলিমপ্রধান দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিপরীত। বুখারী হাদিসে বাদ্য, সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ। অথচ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের ১০০ জনের ৩০ জন মুসলমান। সময় সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পরিবর্তনমুখী করে তুলেছে, বাস্তব জীবনের চাহিদা-জিজ্ঞাসু মন সব ধর্মশাস্ত্রকে সংশয়ের চোখে দেখ তে শেখাচ্ছে। শাস্ত্রীয় বিধান অগ্রাহ্য করার ঠিকাদারী কি কেবলমাত্র (হিন্দু) সেক্যুলাররা নিয়েছেন? তবে কেন এই স্বমৈথুন বিলাস?

বাঙালির মহোত্তম উৎসব দুর্গাপুজা— এই ভুল প্রচারে এদেশের সেক্যুরালকুলে হেলদোল নেই। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজায় আপত্তিকারী প্রধান শিক্ষিকা সাসপেন্ডেড হলে এই সেক্যুলারকুল নিস্পৃহ থাকেন। যে সেক্যুলার স্বাধীন চিন্তার দাবীদাররা ভারতে বাট্রান্ড রাসেলের বই নিষিদ্ধ হলে কথা বলেন না, অমূল্য সেনের চৈতন্যচরিত বইটি বে-আইনী হলে অরব থাকেন, গোলাম আহমেদ মোর্তাজার রচনা চেপে রাখা ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন না তারাই আবার শুধুমাত্র শাহবানু মামলা বা বিতর্ক তথা বাণিজ্যপ্রেমী কোনো লেখক-লেখিকাকে নিয়ে মেতে ওঠেন।

মধু লিমায়ে লিখেছিলেন— "Reform must come from within"। সুপরিচিত সমাজ গবেষক শুভঙ্কর মখোপাধ্যায়ের ভাষায়— দেশে দাঙ্গা যত বাড়বে, আজানের আওয়াজ ততই বেসুরো শোনাবে। কোনো রুক্ষতা নয়, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাজের ধারায় নয়, সংবেদনশীলতা দিয়ে, ধৈর্য্য ও বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটিয়ে পুরোহিততন্ত্র, মোল্লাতন্ত্রকে নির্মূল করতে হবে। বেগম রোকেয়া, আব্দুল ওদুদ, আরজ আলি মাতুব্বর, আহমদ শরীফের কর্মকাণ্ড ফলপ্রসূ হয়নি— এ ধরনের হতাশার কোনো জায়গা নেই। বিদ্যাসাগর, রামমোহনের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের অচলায়তন কার্যত না-পরিবর্তিত থেকেছে। **একটি সবুজ-সতেজ ঘাসে ভরা মাঠের কোনো অংশ যদি কিছুদিন আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে, আলো জল না পায়— সেই অংশের ঘাস তুলনামূলকভাবে কম সবুজ কম সতেজ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই আচ্ছাদন না সরালে মাঠের সমস্ত অংশই সমান সতেজ সবুজ আশা করাটা মূর্খামি।** ভারতের মাটিতে এই আচ্ছাদন উচ্চবর্ণ হিন্দুত্ববাদ, সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে খৃষ্টীয় মৌলবাদের হাত ধরা সাম্রাজ্যবাদ। অপরপ্রান্তে আধিপত্যবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্বজনতা, যার একাংশ এই সময়ে ঘটনাচক্রে ‘ইসলামী মিলিট্যান্ট’। সারা পৃথিবীর নতুন এই সমীকরণ না বুঝলে জেহাদ, যার প্রকৃত অর্থ ন্যায়যুদ্ধ, কার্যত ধর্মযুদ্ধে পরিণত হবে এবং ফলতঃ মারাত্মক চেহারা নেবে।

—চেতনা লহর

শিক্ষকদের সাথে বিতর্ক চলুক

জাতি-বর্ণবৈষম্যে জর্জরিত, দরিদ্রসংখ্যার হিসাবে সকল দেশের সেরা হবার দৌড়ে সম্ভাব্য পদক বিজয়ী ভারতবর্ষে কার্ল মার্কস, বি.আর. আম্বেদকর ও পেরিয়ার-এর অনুগামীদের ত্রিমুখী অবস্থান (বহুমুখী বা পরস্পর বিরোধীও বলা যায়) উপরোক্ত তিনজন চিন্তকের প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। যেহেতু কোনো আলোচনা সভায় এখন উপরোক্ত প্রাজ্ঞজনদের সমাবেশ করা যাবে না, আমরা বরং এঁদের রচনার সহায়তা নিলে নব্য আম্বেদকরবাদী, নব্য পেরিয়ারবাদী, নষ্ট মার্কসবাদীদের অবস্থানকে বুঝতে সক্ষম হব।

(ক) ২০ নভেম্বর ১৯৫৬ (আম্বেদকরের জীবনাবসান-এর ১৬ দিন পূর্বে) কাঠমাণ্ডুতে একটি বৌদ্ধ সম্মেলনে বি.আর. আম্বেদকর বুদ্ধ বা কার্ল মার্কস শিরোনামে একটি ভাষণ দেন। সেই সভায় তিনি মূলতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাপন বিষয়ে কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কমিউনিজমের Dictatorship (একনায়কতন্ত্র) এবং force (বলপ্রয়োগ) সম্পর্কে তাঁর সংশয় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেন। তাঁর জীবৎকালে কিছু ব্যক্তিগত আলাপ পর্ব ছাড়া কমিউনিজম সম্পর্কে বিশেষ কড়া মন্তব্য করেন নি। একনায়কতন্ত্র এবং বলপ্রয়োগ প্রশ্নে মার্কসবাদী শিবিরেই বিভিন্ন মত আছে। অনেকেই বহুদল ব্যবস্থার পক্ষে। মার্কস কথিত (হিংসা সমাজের ধাত্রী) অবস্থানে অনেকের সংশয়। অথচ আম্বেদকর-এর জীবদ্দশায় তিনি যতবার মহারাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন ততবারই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে সর্বরিক্ত দলিত সমাজ সুফল লাভ করেছে। ‘‘মার্কসকে গ্রহণ করিতে না পারি, করিতেও পারি। কিন্তু কোনোমতে জ্যোতি বা’র পথ পরিত্যাগ করিব না”— আম্বেদকর।

তবুও নব্য আম্বেদকরবাদীদের একাংশের মার্কসবাদ বিদ্বেষ কেন তা এখনও গবেষণার বিষয়।

(খ) পেরিয়ারের সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সাথে কোনো বিরোধ হয় নি। সিরিংগাভেলু চেট্টিয়ার নামক দক্ষিণ ভারতের প্রথণ যুগের এক কমিউনিস্ট নেতার সাথে ৩-এর দশকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লাগাতার একযোগে সংগ্রাম করেছেন। পেরিয়ার-এর রুশদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজবাদ এবং নিরীশ্বরবাদ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। পেরিয়ার-এর রচনাবলীর মধ্যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নব্য পেরিয়ারবাদীদের একাংশ এ বিষয়ে সম্ভবত জানতে চান না।

(গ) কার্ল মার্কসের ভারতচর্চা প্রশংসনীয় উদ্যোগ কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্নাতীত নয়।

কোসম্বী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর মত– কার্ল মার্কসের ভারতচর্চা বিষয়ে সর্বাংশে একমত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে সব ভারত-চর্চাবিদদের সহায়তায় কার্ল মার্কস ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছিলেন তাঁরা ভারতীয় সমাজের জাতভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কার্ল মার্কস জার্মান ভাবাদর্শ (১৮৪৫-৪৬), পুঁজি(১৮৬৭) গ্রন্থে ভারতে জাতব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। প্রুঁধো রচিত দারিদ্র্যের দর্শন পুস্তকটির সমালোচনা করে মার্কস রচনা করেন দর্শনের দারিদ্র্য (১৮৪৭)। সেখানে তিনি লেখেনঃ- ‘‘পিতৃতান্ত্রিক, জাতিভেদ ভিত্তিক ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক এবং ব্যবসায়ী অর্থনীতিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে শ্রম বিভাজন নিদ্ধারিত থাকে। এটা কি আইনসম্মত? না। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই উৎপাদন সম্পর্ক জন্ম নেয়। এর ফলেই বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য লক্ষিত হয়’’ (পৃষ্ঠা - ১১৮)।

১৮৫৯ সালে রচিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমালোচনা পুস্তকেও একাধিকবার জাতিভেদ উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি লেখেন— ‘‘...অথবা আইন হয়ত কতকগুলি পরিবারকে জমির মালিকানা দিতে পারে বা কতকগুলি পরিবারকে বংশানুক্রমে জমি শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে’’ (পৃষ্ঠা ২০১। মস্কো সংস্করণ)।

১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে জানান— ‘‘রেলওয়ে ব্যবস্থাজাত আধুনিক ব্যবস্থা হয়ত বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজন ভাঙ্গতে পারে’’ (পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫। মস্কো সংস্করণ)।

বর্তমান অভিজ্ঞতা আমাদের শেখাচ্ছে যে কার্ল মার্কস-এর এই শুভকামনা

ফলপ্রসূ হয়নি।

পুঁজি গ্রন্থে তিনি একাধিকবার ভারত ও ইজিপ্টের উদাহরণ টেনে বংশানুক্রমিক পেশাজাত ও শ্রেণির সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন (পৃষ্ঠা - ৩২১ মস্কো সংস্করণ)।

তবু একথা বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, রসদ সংগ্রহে অপ্রতুলতা তাঁর মহান প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বর্তমানে কার্ল মার্কস-এর বেশ কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অনূদিত এবং মুদ্রিত হতে চলেছে তাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বেশ কিছু চিঠির কথা শোনা যাচ্ছে।

১৮৫৭ সালের আগে অনেকগুলি স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়ে গেছে, যা কার্ল মার্কস-এর নজর এড়িয়ে গেছে। রণজিত গুহ পরবর্তী সাব অল্টার্ন ইতিহাসবিদগণ এই কারণে কার্ল মার্কসকে অভিযুক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। এ বিষয়ে আমরা রণজিত গুহ'র প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছি। আশা করা যায় শ্রী গুহ তাঁর অযোগ্য ছাত্রদের প্রশংসা করবেন না।

ভারতে মার্কসবাদ-এর দর্শনে বিশ্বাসী দলগুলি জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কি কিছুই করেনি? উত্তর একইসাথে হ্যাঁ এবং না। এটা ঘটনা যে কমিউনিস্ট মতাবলম্বে বিশ্বাসী নেতাদের অনেকাংশই মনে করেন যেঃ কোনো এক ৭ নভেম্বর বা ১ অক্টোবর সমাজতন্ত্র বা নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবার পর নতুন সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন যে– দেশ হইতে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতা আইনবিরুদ্ধ হইবে। তার আগে কর্মসূচীতে এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত তিনটি ব্যাধি হইতে মুক্ত হবার প্রক্রিয়ার সাথেই রাজনৈতিক বিপ্লবের অঙ্গাঙ্গী মূলক সম্পর্ক আছে, তা এঁদের অনেকের ধারণায় নেই।

প্রবন্ধটির প্রথম পর্বে পেরিয়ার এবং আম্বেদকর-এর সাথে কমিউনিস্টদের যৌথ কাজকর্মের হদিশ দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত *নিউ এজ* পত্রিকায় কমিউনিস্ট নেতা দামোদরণের রচিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসামান্য দলিল। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি মনুসংহিতা প্রেমীদের পক্ষে অসহনীয়।

তবুও যখন ভি.টি. রাজশেখর দলিত ভয়েস পত্রিকায় লেখেন— Why Marx failed in Hindu India তা মনোযোগ সহকারে পড়ে জবাব দিতে হবে।

একটি অতি সরলীকৃত সমালোচনা সব কটি মার্কসবাদী দলকে শুনতে হয়, যেহেতু ঐ দলগুলির নেতারা উচ্চবংশজাত তাই তাঁরা জাতিভেদ নির্মূলিকরণ চান না। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে অনেক দলিত, সংখ্যালঘু আদিবাসীদের নেতৃত্বাধীন দলনেতারা উচ্ছিষ্টভোগীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা প্রাসাদ বাসিন্দা বা পাঁচতারা হোটেল ঘোরা বাম নেতাদের থেকে কম নীতিভ্রষ্ট নন।

ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোয় একাধিকবার দলিত, সংখ্যালঘু, মহিলা, আদিবাসীদের প্রতিনিধিরা রাজ্য বা কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হয়েছেন। সর্বরিক্ত দলিত সমাজের সামাজিক ক্ষমতায়নের আগে তাদের নেতাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটলে তা অশ্বডিম্ব প্রসব করছে।

আজ সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়াবার, ফিরে দেখবার অতীতের সঠিক ও বেঠিক কাজগুলিকে। ভারত রাষ্ট্র যখন বিদেশী নির্দেশে ৯০ শতাংশ জনগণের বিরুদ্ধে নানা পদ্ধতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করছে—

তখন একতা বড়ই প্রয়োজন।

—চেতনা লহর

অপরিচিত প্রতিবেশী

উঃ পূর্ব কলকাতার একটি নবনির্মিত আবাসনের বাসিন্দাদের কৌতূহলের কারণ ঘটিয়েছেন এলাকার বাসিন্দা এক মধ্যবয়স্ক মহিলা। সাদামাটা মধ্যবিত্ত বাঙালি চেহারা ঐ মহিলা শাখা সিঁদুর তো পরেনই না এমনকি 'নোয়া'টি পর্যন্ত হাতে দেখা যায় না। কেউ বলেন বিধবা, কেউ বলেন অবিবাহিতা, কেউ বলেন ডিভোর্সি। কেউ বা জানালেন আধুনিক মুক্তমনা বামপন্থী ভাবনা সম্পন্না। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল ভদ্রমহিলার নাম জাহানারা, মুসলিম পরিবারে জন্মেছেন। দিব্বি স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করছেন। এই মহিলার পরবর্তী দূরবস্থার কাহিনী এই রচনার বিষয় নয়, মূল বিষয়ে প্রবেশ পথে এই অপরিচিত প্রতিবেশী মহিলা সাথী মাত্র।

আসলে নাগরিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, মনুবাদী ভাবনা মুক্ত হতে যে পথ চলতে হয়, সেদিকের ধারেকাছেও তারা যায়নি। উন্নত বা অর্ধোন্নত পশ্চিমের দেশগুলিতে বর্ণ বিদ্বেষ মাঝেমধ্যে মাথা চাড়া দিলেও প্রতিবেশী সম্পর্কে অহেতুক কৌতুহল বা সংশয় নেই। অথচ বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ মুসলিম, যারা আমাদের প্রতিবেশী অথচ অপরিচিত।

শিয়ালদহ থেকে উত্তর কলকাতামুখী কোনো বাসে উঠলেই কোনো সহযাত্রীর সোচ্চার সতর্কবাণী আপনাকে শুনতে হবে— 'পকেট সামলে, সামনে রাজাবাজার আসছে'। অর্থাৎ রাজাবাজের কেবলমাত্র পকেটমাররাই বসবাস করে। প্রতি শুক্রবার দুপুরে মসজিদে নামাজ পড়ার কারণে কলকাতায় বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। জ্যাম আটক যাত্রীদের কটুক্তি— 'ওদের জ্বালায় টেকা যাবে না আর'। কলকাতা পুরসভা এলাকায় ১১ লক্ষ মুসলিম বসবাস করেন। কলকাতার ৮৩ টি নামাজি মসজিদে যদি ৬ লক্ষ মুসলমান (মহিলারা প্রকাশ্যে নামাজ পড়েন না) প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়তেন তবে কলকাতাবাসী প্রতি সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টার জন্য গতিহীন হয়ে পড়তেন। বাস্তব ঘটনা এই যে সব মুসলমান প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়েন না, তবুও মুসলিম মাত্রেই ধর্মান্ধ এটা প্রকাশ্যে বলা হয়। আমারই সহ নাগরিক সম্পর্কে

না জানাটা যে একধরনের অক্ষমতা তাও স্বীকার করা হয় না।

বোরখা-আবৃত মহিলাকে দেখলে যেহেতু দর্শনকাম চরিতার্থ হয় না, অবলীলাক্রমে পর্দানসিনতাকে পুরুষতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে দেওয়া যায়। শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া'র ইতিহাস জানলে যে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে সেটা কয়জনে বোঝে?

এই আমরা আর ওরা'র বিভাজনকে বুঝতে গেলে এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে ভারতে মুসলমানরা আরব বা বিদেশ থেকে আসেন নি, কেউই বাবর কি অওলাদ নয়, এদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে নিগৃহীত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ধর্মান্তরকরণের ফলে তাঁদের মণ্ডা মিঠাই জুটেছে এমন নয়, তবে মন্দিরে নো এন্ট্রির পরিবর্তে মসজিদে আমির-গরিব পাশাপাশি প্রার্থনা করা যায়।

এদেশে শিক্ষিত হিন্দু-মধ্যবিত্ত অমর্ত্য সেনের তর্কপ্রিয় ভারতীয় পড়ে পুলকিত হন যে এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে (কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই) জিজ্ঞাসু সংস্কার মুক্ত মানুষের প্লাবন রয়েছে। তাই মুসলমানদের মধ্যে সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আসল কথা— যেমন কোনো পরিবারে রোগীর সংখ্যা বেশি হলে সেই পরিবারে চিকিৎসকের যাতায়াত বৃদ্ধি পায় তেমনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় জর্জরিত হিন্দু সমাজে সংস্কারকের প্রয়োজন হয়েছিল (এখনো প্রয়োজন আছে)। জেনে রাখা ভাল যে কোরান-হাদিস-শরিয়তের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলে সঙ্গীত দুনিয়ার (কণ্ঠ ও যন্ত্র) ১০০ জন মহান শিল্পীর অন্তত ৩০ জন মুসলমান হতেন না, কোনো মুসলমানই পাসপোর্টে ফটো লাগিয়ে হজ যাত্রা করতেন না, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতেন না। কারণ ধর্মীয় নির্দেশে সঙ্গীত চর্চা, ছবি তোলা, সুদ গ্রহণ ইত্যাদি ঘোরতর অপরাধ।

আলী-আর-আরীব ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে *'ফিরদাউস আল হিকমত'* (জ্ঞানের স্বর্গ) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। গণিত বিশারদ আল-খওরিজমির রচনা *হিসার-আল-জবল অ আল মুকাবলা (সংযোজন ও সমীকরণে গণনা)* গণিত দুনিয়ার অ্যালগোরিদম যা পরে অ্যালজেবরার জন্ম দেয়। দর্শনের দুনিয়ায় সেই সময়ে মুতাজ্জেলা, ফালসাফা, হরকুমা প্রভৃতি হৈতুক জিজ্ঞাসু সংগঠন জন্ম নেয়। ফালসাফার মূল আদর্শ ছিল মানুষের জ্ঞানলব্ধ চিন্তা শক্তি ও বস্তুর প্রকৃত অবস্থার সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা। যে সমস্ত দার্শনিকের ধ্যানধারণা জিজ্ঞাসা কৌতূহল আল্লাহ ও ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না তাদের বলা হত ফালসাফা। হুকুমা নামে মুক্তমনাদের সংগঠনের মূল বক্তব্য ছিল জিজ্ঞাসু চিন্তার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং ভিন্ন আদর্শের প্রতি উদারতা।

দর্শন বা বিজ্ঞান জগতে সেই স্বর্ণযুগের ধারাবাহিকতা অবশ্যই মুসলিম দুনিয়ায় বজায় রাখা যায়নি। তার নানাবিধ কারণ আছে। শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশ নয় সারা পৃথিবী জুড়ে সম্প্রতি সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম জগতকে পদানত করে রাখার প্রচেষ্টা চলছে যার পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র চলছে বহুদিন যাবৎ। শুধুমাত্র ইরাক-আফগানিস্তান দখল নয়, এর সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও চলছে। সারা পৃথিবী জুড়ে সেই কারণে গত ৩ দশক ধরে প্রকাশক শ্রেষ্ঠিকুলের আজ্ঞাবহ কলমচি সলমান রুশদি বা তসলিমা নাসরিনকে প্রচারের অলোয় আনা হয়। মুসলমান মাত্রই ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী— এই বিশ্বব্যাপী প্রচার সফলতা পেলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে অবরুদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করা যাবে। যেখানে আমির খানের মত সুখ্যাত চিত্রতারকাকে হিথরো বিমান বন্দরে ৬ ঘণ্টা আটক রাখা যেতে পারে সেখানে সাধারণ মুসলমান সারা পৃথিবীতে বা এই ভারতে কী অবস্থায় আছেন তা সহজেই বোধ্য।

বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের অহংবোধ কি এই অপরিচিতির একমাত্র কারণ? মুসলিম সম্প্রদায় কি কূপ মণ্ডুকতায় ভুগছেন না? সারা পৃথিবীতে সব দেশেই সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এক ধরনের Gheto Complex-এ ভোগেন।

সারা পৃথিবীতে know your neighbours নামে এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। এখানে প্রতিবেশীর শ্রেণি, ধর্ম, বয়স, লিঙ্গ, জাতি, ভাষা বন্ধুত্বে কোনো বাধা নয়। আসুন আমরা আমাদের প্রতিবেশীর হাতে হাত রাখি।

—চেতনা লহর

আয়নায় বিকৃত প্রতিবিম্ব

৫-এর দশকে কমরেড আবদুল হালিম একদিন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদকে অনুযোগের সুরে বলেন, ‘‘দুই কমরেড মুখুজ্জে (শ্রী হীরেন মুখার্জী ও শ্রী সরোজ মুখার্জী) সাড়ম্বরে তাদের ছেলেদের পৈতে দিলেন, আমি আমার ছেলের সুন্নৎ করালাম না ফলে মুসলমান কমরেডরা গাল পাড়লেন আর হিন্দু কমরেডরা নির্বিকার থাকলেন।’’

এত বছর আগের এই ঘটনা আমাদের এই জ্ঞানোন্মেষের পক্ষে যথেষ্ট যে, প্রগতি শিবিরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আগ্রাসন বহুকাল পূর্বেই ঘটেছে। ‘মুখুজ্জে’ কমরেডদের দোষ দেওয়া অর্থহীন কারণ পশ্চিমে শিল্প বিপ্লবের সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ রেঁনেসাস চার্চের প্রভুত্বের হাত থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে যতটুকু মুক্ত করতে পেরেছিল ভারতে তার ছিটেফোঁটাও ঘটেনি। বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্তদের মতো রুক্ষতা দোষে দুষ্ট না হয়েও বলা যায় যে, যতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছিল তা দেশী বিদেশী বণিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্নিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

ভারতীয় সমাজকে আধা সামন্তবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী বা মনুবাদী যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভারতে বুর্জোয়া চেতনার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি, মার্কসীয় দর্শন বিশ্বাসীগণ যাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বাভাবিক ফসল মনে করেন। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কারবাদীরা এসেছেন এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও ‘মুতাজ্জেলাবাদী’রা এসেছেন তবুও ‘‘সর্বশক্তিমান’’-এর Loyal Opposition ‘‘সৃষ্টিকর্তা’’র মাহাত্ম্যকেই বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতি ও সামাজিক পীড়নে আর্ত মানুষের কাছে ভাববাদ নামক সর্বগ্রাসী নেশার বিকল্প বস্তুবাদী শক্তির উদ্ভব না ঘটাতে পারলে যুক্তিহীন তমসাময় মানসিকতার কাছে আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী। প্রচলিত একটি কথা— তুমি যদি সমস্যার সমাধান না করতে পারো তবে কালক্রমে তুমি সমস্যার অংশ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম নামক

বহু সমস্যার জন্মদাতা জাতভেদ, নারী নির্যাতন পোখরানে জাতীয়তাবাদ, কারগিলে দেশপ্রেম, অযোধ্যার আবেগ, ভাগলপুরের দাঙ্গা, গণেশের দুধপান, অস্পৃশ্য নিধন প্রভৃতির সাথে অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা।

শিক্ষিত শহরবাসীর ক্ষুদ্রাংশ ''সিভিল সোসাইটি'' গঠনের কথা ভাবছেন - বলছেন - লিখছেন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ভাবছেন-বলছেন-লিখছেন, আলাপ আলোচনায় আছেন, দেরিদা, লাকার্ত, ফুকো— ভারত তবুও পড়ে রয়েছে অন্ধকার ভারতে। যে ভারতে ২৩ শতাংশ মানুষ রেলগাড়ি চড়া তো দূরের কথা চোখেই দেখেনি, ৩৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ভোগ করেনা, ২৮ শতাংশ মানুষ উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রাতঃকৃত্য করে, ৭ শতাংশ মানুষ সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন, সেই ভারতে জীবনযুদ্ধে জর্জরিত মানুষের কাছে ঈশ্বর ধ্বংস ও সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হবেন এটাই স্বাভাবিক। তবুও চার্বাক, প্রমিথিউস আর জিওর্দানো ব্রুনো রেখে গেছেন তাঁদের উত্তরসূরী, শত বাধা সত্ত্বেও তারা কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টাকে হত্যা করা যায়নি।

আধুনিক মানুষ, নতুন মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের সংখ্যাধিক্য এই সমাজে পাওয়া স্বাভাবিক নয়। অথচ আমাদের গৌরবময় ইতিহাস বলে বৈদিক যুগেও জিজ্ঞাসুমন কৌতূহলী মন প্রশ্ন তুলেছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জাগতিক সমস্ত ঘটনার কার্যকরণ ব্যাখ্যা রেখেছেন, গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরা বহন করতে পারলাম না কেন তা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

যে কোনো গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ইচ্ছা বা দাবি করতেই পারেন যে রাষ্ট্রের নীতি ধর্মীয় নির্দেশ দ্বারা পারিচালিত হবে না। এজন্য সেই ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে গেলে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে ধর্মীয় তমসাবাদী সম্পর্কে মোহমুক্ত হতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট দাবী হবে যে প্রত্যেক মানুষের ধর্মীয় আচার পালনের এবং না-পালনের অধিকার থাকবে। কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেলে সংবিধানে এবং তার বাস্তব প্রয়োগে এই নীতি পালিত হবে। কিন্তু অগ্রণী সংগঠনের সদস্যদের 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' অজুহাতে ভাববাদী ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত হতে দেওয়া উচিত নয়।

৩ ডিসেম্বর ১৯০৫ সালে লেনিন লিখেছিলেন— ''যে সব শ্রমিক আজও অতীত কুসংস্কারের কোনো না কোনো জের বজায় রেখেছে তাদের আমরা পার্টির কাছাকাছি আসা নিষিদ্ধ করিনি– করা উচিত নয়''।

চার্চ-খৃষ্টধর্ম-ঈশ্বর প্রশ্নে ব্লাংকিবাদীদের ছেলেমানুষি নৈরাজ্যবাদী অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখতে লেনিন সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখ তে হবে সেই সময়টা ১৯০৫ সাল। এত বছর পর যখন ঈশ্বরের হাত ধরে ধর্মের পথে ফ্যাসিবাদ জেগে উঠেছে তখন নতুন ভাবে ভাবতে হবে। লেনিনের সময়ে পাশ্চাত্যে রেঁনেসাসের প্রভাবের ফলে ঈশ্বর বাহিনী আজকের মতো ঘাতক বাহিনীতে পরিণত হয়নি। নিরীশ্বরবাদীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন আর সেই রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে সেকুলার হয় অথবা কোনো রাষ্ট্রের ঘোষিত রাষ্ট্রীয় ধর্ম নিরীশ্বরবাদ হয়, পৃথিবীতে এ উদাহরণ তো আছে। সেই রাষ্ট্রগুলির রঙ বদলেছে, কক্ষচ্যুতি ঘটেছে অন্য কারণে। সে দেশের কমিউনিস্টরা বিপথগামী হয়েছে তা নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টদের একাংশের মতো পৈতেধারী বামুন হয়ে থাকেনি যা ক্ষমারও অযোগ্য।

—হেতুবাদী

এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজে চোখ বোলালে 'আচ্ছেদিন', 'স্বচ্ছ ভারত', 'পরিবর্তন', 'উন্নয়ন' প্রভৃতি শব্দগুলি অর্থহীন অস্পষ্ট মনে হয়। নারীদেহ মাত্রই ভোগ্য বা পণ্য, ধর্মশাস্ত্র তার মান্যতা দিলেও, সমাজ বা আইন তার যথোচিত ভূমিকা পালন করে না কেন? মধ্যভারতের আদিবাসী বনবাসী জনগণ যখন তাদের প্রাণ বাজি রেখে দেশি বিদেশি শ্রেষ্ঠীদের গ্রাস থেকে জল জমি জঙ্গল বাঁচাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন 'অরণ্যের অধিকার' গ্রন্থের রচয়িতা সুশীল শিবির ত্যাগ করে শাসকের তোষাখানায় নাম লেখালেও, আদিবাসী সংগ্রাম থামছে না। যার দাঁত নখে এখনও গুজরাট সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংখ্যালঘুর রক্ত দেখা যায় তাকে প্রতিদিন সকালে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মানতে ঘৃণা হয়। ২০০৩ সালের লোকসভা রাজ্যসভায় গৃহীত বিলের ফলে যে ৩ কোটি দলিত উদ্বাস্তু বেনাগরিক হয়েছেন এই স্বচ্ছভারত তাঁদের কী দেবে? মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কেন এখনো কার্যকরী হলো না তার জবাব কে দেবে?

ক্ষমতার অলিন্দের উচ্ছিষ্ট ভোগী যেসব তথাকথিত মার্কসাবাদী, সমাজবাদী, আম্বেদকরবাদী গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছেন, তাদের সংশোধিত হবার আশা নেই বললেই চলে। তবুও শ্রেণি, জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, মর্যাদার ভিত্তিতে যে সংগ্রামের অসংগঠিত ভাবে হলেও সূচনা হয়েছে তাকে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়ার সামিল করার কাজও শুরু হয়েছে। আর্য রক্তের মিথ্যা অহমিকা নিয়ে হিটলার যখন ইহুদী আর কমিউনিস্টদের নিধন কর্মে ব্যস্ত ছিল তখন অনেকেই মনে করতেন হিটলার অপরাজেয়। এ যুগের হিটলার বাহিনীর নয়া আর্যামীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষায়। রৌদ্র কিরণহীন এই সকালে সুসময়ের সূর্যালোক দেখা দেবে সেই আশায় বুক বাঁধতে হবে।

সাম্প্রতিক ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত আমরণ অনশনে ২৭ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত চলতে থাকা উক্ত অনশনে ৬ দফা দাবির মধ্য অন্যতম দাবি ছিল মতুয়া ধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। অর্থাৎ মতুয়ারা হিন্দু পরিচয়ে থাকতে চায় না।

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় টিকে থাকা দু'হাজার গৌণ ধর্মের মধ্যে মতুয়া ধর্ম একটি। এই ধর্মের জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি— যা এখনও অন্যান্য অনেক ধর্মের থেকে এগিয়ে আছে জনসংখ্যার নিরিখে। রাষ্ট্রশক্তি নিজের স্বার্থে মতুয়া ধর্মের স্বীকৃতি দিতে চায় না। কারণ হিন্দুর জনসংখ্যা কমে যাবে বলে। একইভাবে যেমন রাষ্ট্র আদিবাসীদের ভাষার স্বীকৃতি দিলেও, ধর্মের স্বীকৃতি দেয় নি। বরং তারা নিজেদের মতো (রাষ্ট্রের তোয়াক্কা না করে) নিজেদের ধর্ম-ঐতিহ্য রক্ষা করে যাচ্ছে। আধুনিককালে তারা খ্রিস্টান হচ্ছে। আদিবাসীদের খ্রিস্টানত্ব থেকে আটকাবার জন্য হিন্দু নেতারা কত না চেষ্টা করছেন। ধর্মান্তরকরণ আটকাবার জন্য এবং নতুন করে কোমো ধর্মের স্বীকৃতি না দেবার উদ্দেশ্য হলো বহু জনসংখ্যা ধরা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করা। মনে রাখতে হবে, মতুয়া ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই কৌশলের কাছে বন্দি হয়ে আছে। আর মতুয়ারাও ব্রাহ্মণ্যবাদের গোলামগিরি করে স্বেচ্ছাবন্দি জীবন কাটিয়ে মুক্তি খুঁজছে। মতুয়ারা যতদিন হিন্দু থাকবে ততদিন হরি-গুরুচাঁদের স্বপ্ন সফল হবে না। হিন্দু ধর্ম মানলে তো মনুসংহিতা অনুসারে শূদ্রদের ব্রাহ্মণের দাস হয়ে থাকা ছাড়া কোনো পথ নেই। এ পথকে বাতিল করতেই তো হরিচাঁদ কঠোর বাণী দিয়েছন—

''কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই
বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।''

(শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃঃ১৩৮)

তবু কেন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা মতুয়ারা এসব বোঝে না? মনুবাদী মতুয়ারা বিষয়টি ভেবে দেখলে বৃহত্তর মতুয়া আন্দোলনের উপকার হবে।

অনুপ্রবেশকারী

গৌতম আলী (বিশ্বাস)-এর রচিত *ঠিকানা* নামক গল্পটির সার কথা এইরকম— এই বাংলায় একজন সাধারণ লোক জন্মেছিলেন যখন বাংলার পূর্ব-পশ্চিম বলে কিছু ছিল না। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জমি হাঙ্গরদের উৎপাত, রুটি-রুজির টানে তাঁকে বাস্তুহারা হতে হয়েছে বহুবার। জীবনের শেষবেলায় বনগাঁ সীমান্তে এসে তিনি জানতে পারলেন যে বাংলাদেশ বা ভারত-এর সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব দিতে চায় না। সীমান্তের কাঁটাতারের অদূরে বসে বৃদ্ধের আর্তনাদ— আল্লা মেহেরবান, আমারে কইয়্যা দ্যাও কুইনটা মোর দ্যাশ।

৪৭-এর দেশভাগের পর ৫৬ বছর বাদে ২০০৩ সালে রাজ্যসভা ও লোকসভায় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল পেশ করা হয়। তখন কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল। বিলটির মোদ্দা কথা এই যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধ-এর সময় যে সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষ এ বাংলায় বা ভারতের অন্যপ্রান্তে এসেছিলেন তাঁদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, স্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসা-চাকরি থাকলেও নাগরিকত্ব বাতিল হবে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা ওই সময় প্রায় এক কোটি হলেও লোকসভা, রাজ্যসভায় বাম, ডান, মধ্য ঘরানার কোনো দলের কোনো সদস্য এই কালাকানুনের বিরোধ করেননি। কয়েকটি উদ্বাস্তু সংগঠন দেশহারাদের এই সমস্যা নিয়ে আন্দোলন, মামলা চালাচ্ছেন। এখনও কোনো সুরাহার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের প্রতিক্রিয়ার বেশ কয়েকটি শব্দ প্রচার মাধ্যমে ভেসে আসছে। উদ্বাস্তু, শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী, ডি-ভোটার প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ ভিন্ন হলেও শাসকের কাছে সবই সমার্থক হিসেবেই চিহ্নিত হচ্ছে। কলকাতার কাছাকাছি কলোনীগুলির বাসিন্দাদের তালিকা দেখলে জানা যায় যে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের ৮০ শতাংশ ৪৭ থেকে ৫৫ সালের মধ্যে ভারতে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। নমো সম্প্রদায় সহ বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানরা ৭১-এর এপাশ-ওপাশ সময়ে পূ

র্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ ত্যাগ করে। যদিও এখনও প্রায় ২ কোটি অমুসলমান বাংলাদেশে বাস করেন, তবুও তাঁদের বিপন্নতার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে বিষয়ে এই রচনাটি গুরুত্ব দিতে চায় তা হল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বহু সংখ্যক ভূমি সন্তান বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম বাসিন্দা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে যাচ্ছেন। আসামে বেশ কয়েকটি বন্দিশিবির আছে যেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনুপ্রবেশকারী বা ডি-ভোটার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি জীবন যাপন করছেন।

আমাদের আলোচনার মূল অংশে আসা যাক। 'রিফিউজি নেটওয়ার্ক' নামে একটি সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে ওই সংস্থা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় অনুসন্ধান চালিয়ে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাতে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ থেকে ১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে যদি ১০০ জন অমুসলমান ভারতে আশ্রয় নেন, সংখ্যানুপাতে এদেশ ছেড়ে ৬৩ জন মুসলমান বাংলাদেশে চলে গেছেন। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পরে জানানো যাবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে হিন্দুত্ববাদীরা তো বটেই এমনকি 'হিন্দু সেক্যুলার' দের অনেকাংশ এই উভমুখী অভিবাসন (ক্রশ মাইগ্রেশন) সম্পর্কে বিশদ জানতে আগ্রহী হন। দুই বাংলার সুপরিচিত প্রাবন্ধক বদরুদ্দিন উমর, যিনি ১৯৬৪ সালে বর্ধমান জেলা ছেড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন তিনি এখনও তাঁর বর্তমান বাসভূমিকে দ্বিতীয় ঘর (সেকেন্ড হোম) মনে করেন।

ডাফোড্রাম-এর পক্ষ থেকে ২০১০ সালে দমদম, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম এবং রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভার ১০০০ জন হিন্দুর বাড়ির জমির নথি (সার্চিং রিপোর্ট, পরচা ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য বের করে তা বিস্ময়কর। ওই জমির পূর্বতন মালিকানা কাদের ছিল তাও জানা যায়। দক্ষিণ দমদম-এ যুগীপাড়া এবং বাগুইআটির বাগুই পরিবারের জমি ছাড়া সব জমিতেই মুসলমান পরিবারের মালিকানা ছিল। এইসব মুসলমান পরিবারগুলি কোথায় গেল বা কেন গেল?

দমদম মতিঝিল-এর ৮০ বছরের বাসিন্দা খড়গপুর আইআইটি -র প্রাক্তন শিক্ষক নারায়ণ দাস গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে তাঁর শৈশবে তিনি তাঁদের বাড়ি (জাজ সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত ছিল) নাগের বাজারের মসজিদ এবং দেবী নিবাসের একটি বাড়ি ছাড়া কোনো দালান বাড়ি দেখেননি। যশোর রোড যদিও ছিল তবুও তার দুপাশ ছিল মুসলমানদের বসতি। দমদম ক্যান্টনমেন্ট (গোরাবাজার) এবং ক্লাইভ

হাউস-এর কাছাকছি কিছু ব্রিটিশ এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাস করত। ডাফোড্রাম-এর সন্ধানে এও জানা যায় যে বর্তমানে নাগেরবাজার-দমদম পার্ক-এর মাঝে যশোর রোডে যে একটি শপিংমল বানানো হয়েছে তার পাশের রাস্তার নাম রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড। ওই মল-এর পিছনে বরিশাল কলোনীতে একটি ছোট খেলার মাঠ আছে যা একটি পরিত্যক্ত মুসলিম কবরস্থান। উপরোক্ত পুরসভাগুলির অন্তর্ভুক্ত বহু পুরনো মসজিদ, মাজার, কবরস্থানগুলি তৎকালীন বাসিন্দাদের ধর্ম পরিচয় জানান দেয়।

জনসংখ্যার শতকরা হিসাব দাখিল করার পর কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পেশ করা যাবে।

১৯৫১	বাংলাদেশে সংখ্যালঘু	মোট জনসংখ্যার ২৩.০১ শতাংশ
১৯৬১	”	মোট জনসংখ্যার ১৯.৬০ শতাংশ
১৯৭৪	”	মোট জনসংখ্যার ১৪.৬০ শতাংশ
১৯৮১	”	মোট জনসংখ্যার ১৬.৪০ শতাংশ
১৯৯১	”	মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ
২০০১	”	মোট জনসংখ্যার ১১.৫ শতাংশ
২০১১	”	মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ

পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ত্যাগী অমুসলমান জনতার আশ্রয় এ দেশে হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও উচ্চশিক্ষা কিম্বা জীবিকার তাগিদে ইউরোপ, আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীর (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) সংখা নেহাত কম নয়। দেশভাগ এবং ১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের পর যে মুসলমানরা ওই বাংলায় চলে গিয়েছিলেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের খবর কে রাখে? উপরোক্ত তালিকায় সংখ্যালঘুর জনসংখ্যার শতাংশ শতকরা আনুপাতিক হিসেবে ক্রমহ্রাসমান হওয়ার কারণ বাংলাদেশে মূল জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা— ৮৩ সালে বাংলাদেশ ভ্রমণে গেছি। বেশ কিছু বন্ধুদের সাথে দেখা করাই মূল ইচ্ছা। ‘উপরি’ হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম ‘দ্যাশের বাড়ি’র ভিটে দেখতে। বরিশাল জেলার ঝালোকাঠি মহকুমার মোড়াকাঠি গ্রামে ঢোকার মুখে দেখলাম অতিথিকে স্বাগত জানাতে জনা ষাটেক বিভিন্ন বয়সের পুরুষ

মহিলা উপস্থিত। পারিবারিক বন্ধুকে (যিনি আমাদের বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করেন) এই সমাবেশের কারণ জানতে চাইলে তার সোজাসাপটা উত্তর— এনারা শুনেছেন 'ঠাহুর' (পুরোহিত ব্রাহ্মণ) বাড়ির মালিক আসছেন যার নাকি 'পৈতে' ই হয়নি। কিছু মনে করবেন না আপনার ঠাকুরদাদা বা তাঁর বাবাকে সেই সময়ে লোকজন ভয় করতো, হয়তো ভক্তিও করতো। যদিও তাঁরা বামুন, কায়েত, বদ্দি ছাড়া কারোরই ছায়া মাড়াতেন না। এ খবরটি এতটাই উৎসাহব্যঞ্জক মনে হলো যে সেদিনই সন্ধ্যায় পাড়ার মানুষজনকে বাড়িতে আসতে বললাম। যাঁরা এলেন তাঁদের নানা প্রশ্ন— তিস্তার পানি, ফুলিয়ার শাড়ি, টালিগঞ্জের নায়ক-নায়িকাদের সম্পর্কেও কথাবার্তা চলার ফাঁকে এক বয়স্কা মহিলার আচমকা প্রশ্ন— কৈখালির আকাশ দিয়া কি এখনও উড়াজাহাজ চলে?

এরপর মহিলার অনুচ্চস্বরে স্বগতোক্তি— "ওইহানে আমার বাপের বাড়ি ছিল। শ্বশুরবাড়িও। রাইট (দাঙ্গা) লাগল। বড় খোকার বাপে কইল যে— চল পাকিস্তানে যাই। খাইতে পাই আর না পাই জানে তো বাঁচবো।" ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ভয়ে চলে আসা এক বয়স্কা মহিলা তাঁর শৈশবের, কৈশোরের কৈখালিকে ভুলতে পারেননি। যেমন আবেগের টানে আমি ছুটে গিয়েছিলাম আমার 'দ্যাশের বাড়ি' তে।

আর একটি অভিজ্ঞতা— ৮৭ সালে আবার বাংলাদেশ সফরে গিয়েছি। ঢাকা শহরের প্রান্তে এক নূতন গড়ে ওঠা আবাসনের বাসিন্দারা সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। নির্দিষ্ট সভাস্থলে পৌঁছে দেখলাম সভাস্থল প্রায় শূন্য। উদ্যোক্তারা জানালেন, ভারতীয় সময় ৬-৩০টায় সভাস্থল দর্শকপূর্ণ হবে। ৭টার সময় যখন সভা শুরু হল তখন বড় 'কমিউনিটি হল'-এর সব আসন পূর্ণ। কারণ জানতে চাইলে উদ্যোক্তারা যা জানালেন, তা বেশ আশ্চর্যজনক। সেদিন কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ম্যাচ ছিল। মোহনবাগান ১-০ গোলে জিতেছিল। যে অঞ্চলে ওই সভা তা 'ঘটি' প্রধান এলাকা। পূর্ববাংলায় ঘটি-বাঙ্গাল বিবাদ মানে পূর্ব-পাকিস্তানের নূতন এবং পুরাতন বাসিন্দাদের 'নিরামিষ' বন্ধুত্বমূলক খুনসুটি। ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৭১ সালের পর যে মুসলমানরা ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে গেছেন তাঁরা 'ঘটি' এবং অধিকাংশই মোহনবাগান সমর্থক। দূরদর্শনে খেলা দেখা শেষ করে জয়ের আনন্দ নিয়েই তাঁরা সদলবলে আলোচনাসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

২০১০ সালে একদিন হঠাৎ ইন্টারনেটের 'অনলাইন'-এ ঢাকার বন্ধু কাশেম

চৌধুরীকে পেলাম। কুশল বিনিময় সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথা চালাচালির পর আমার প্রশ্ন— এবার ঢাকা শহরে দুর্গাপুজো কতগুলি হচ্ছে? কাশেম-এর চুটকিসহ উত্তর— 'যদিও শহরে ৯৩ টা দুর্গাপুজো হচ্ছে তবে আমরা বাঙালিরা যেমন ঝগরুটে এটা বেড়ে ১০০ টপকাতে বেশি দেরি নেই।'

২০১৪ সালের ২৬ জুন 'এই সময়' দৈনিক পত্রিকায় শ্রী মোহিত নামে এক ব্যক্তির 'অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্ক' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রী মোহিত অনেক ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন, পরিবেশ চর্চা, ফান্ডেড এনজিও এবং সবশেষে ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ নিয়ে তার কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত ভয়াবহ— আগামী ২০১০ সালে পশ্চিমবাংলার মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ ্যাকে টপকে যাবে। আরএসএস বা বিজেপি যা দ্বিধান্বিত স্বরে প্রচার করে, শ্রী মোহিত তা নির্দ্বিধমনে উদ্বাস্তু আন্দোলনের একাংশের উদ্যোগে প্রচারে নেমেছেন। অর্থই অনর্থের মূল। সাচার কমিটির রিপোর্টে ৪৬ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে এই শতাব্দীর শেষে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ২০ শতাংশ হতে পারে। বিজ্ঞানের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী মোহিত পরিসংখ্যান নিয়ে আর একটু চর্চা করতে পারতেন। বাংলাদেশে অ-মুসলমান জনসংখ্যার ক্রমাবনতি ক্রমবর্ধমান মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে যা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামীণ বাংলাদেশীদের অসচেতনতা এবং আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের বাংলাদেশ গমন। জেনে রাখা ভালো যে বাংলাদেশের সরকার এইসব শরণার্থী মুসলমানদের নাগরিকত্ব দিতে দেরি করেননি অথচ ভারত সরকারের চোখে হিন্দু উদ্বাস্তুরা (বিশেষতঃ দলিত) বে-নাগরিক। মূ ল সমস্যার দিকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের সন্দেহভাজনদের তালিকায় তুলে দাঙ্গা বাধাবার ভিত তৈরি করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাট, রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা, যাঁরা গৃহনির্মাণকার্য, সোনা-রূপার অলঙ্কার নির্মাণ কার্যে গেছেন, কী বিশাল অসুবিধায় আছেন তার সামান্য কিছু খবর আমরা জানতে পারি।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতির গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেশভাগ যা লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর ইচ্ছায় এবং নেহরু-জিন্নার ক্ষমতার রুটি হালুয়া ভাগের সুযোগ করে দিয়েছিল। এরই ভয়াবহ পরিণতি 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য'র বাংলাদেশ নির্মাণ। যা চিনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌএনলাই-এর ভাষায়— 'ওই উপমহাদেশের মাটিতে পুঁতে রাখা অসংখ্য টাইম বম্ব যা বিভিন্ন সময়ে বিস্ফোরিত হবে এবং তিনটি প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে' (দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সম্মেলন—

চৌ এন লাই-এর বিবৃতি - সূত্র ৭ আগস্ট, ১৯৭১, পিকিং রিভিউ)।

অন্তিম পর্ব— মধ্যযুগের ইতিহাস পড়লে এবং বর্তমান সময়ের অভিজ্ঞতা আমাদের জানান দেয় যে এদেশের মুসলমান-হিন্দুর সম্পর্ক অম্লমধুর হওয়ার কারণ যে কোনো একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের 'চৌকাঠ' পার হয়নি। এতকাল পাশাপাশি বসবাস করলেও পরস্পরকে ভালোভাবে জানবার, বোঝবার চেষ্টা করেনি। ওরা-আমরা-র দূরত্বই যখন ঘোচেনি সংঘর্ষ লাগা তো স্বাভাবিক।

দুই দেশের দুই সম্প্রদায়-এর বেশ কয়েকজন মুক্তমনা মানুষ জন্মেছেন যারা মানবতার উপাসক, নিজ দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সক্রিয় বিরোধী। ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আধিপত্যবাদকে না আটকালে গণতন্ত্রের প্রাথমিক কাঠামোটাই তৈরি হবে না। ব্রিটিশ-মার্কিন সরকারের' ইসলামোফোবিয়া' প্রচারের বদ মতলব সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে। সলমন রুশদি বা তসলিমা নাসরিনদের প্রভুদের তো পরিষ্কার চেনা যায় কিন্তু আরএসএস কণ্ঠি মোহিত রায়, তসলিমা কণ্ঠি গিয়াসুদ্দিনদের গলায় বকলস কাদের শেকলে বাঁধা তা জানা দরকার।

ভগৎ সিং আজও প্রাসঙ্গিক

অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যুদ্ধবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিল— এই আষাঢ়ে গল্প আমরা মহাভারতে পাই। কিন্তু এমন কয়েকজনকে আমরা জানি যারা স্বল্পায়ু জীবনে, সময় ও সমাজে এমন দাগ কেটে গেছেন যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, ভগৎ সিং তাঁদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বর্তমান পাকিস্তানের লায়লাপুরে ১৯০৭ সালে ২৬/২৭ অথবা ২৯ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলায় ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অহিংসার তত্ত্বকে অস্বীকার করে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ার অনেক উদাহরণ এ দেশে অনেকেই দেখিয়েছেন। কিন্তু ভগৎ সিং-এর গুরুমুখী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সংকলন এবং খোলা চিঠি ইংরাজি সহ ভারতের প্রায় সবকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এখনও বিপুল পরিমাণে পাঠককুলে সমাদৃত হচ্ছে। এটা উড়িয়ে দেবার কথা নয়।

নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ ‘আর কেহ ভগৎ সিং-এর মতো জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।’ পট্টভি সিতারামাইয়া লিখেছিলেনঃ ‘বাস্তবত শ্রেণিদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ এবং জাতীয় বিপ্লবের ভগৎ সিং নির্দেশিত সমঝোতাবিরোধী পন্থার সাথে গান্ধীর সমঝোতাবাদী পন্থার মতানৈক্য ভগৎ সিং-এর জনপ্রিয়তার কারণ হইয়াছিল। যে কোনও সংগ্রাম তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লড়াই হোক না কেন হিংসাত্মক পথ যে একটি অত্যন্ত অপছন্দের অথচ বাধ্যতামূলক পন্থা তা *হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে* রচনায় ভগৎ সিং পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন। গান্ধী রচিত *Cult of Bomb* -এর জবাবে ভগৎ সিং-এর *Philosophy of Bomb* রচনা সাহস ও প্রজ্ঞার দাবি রাখে। গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম যখন সমস্যা সমাধানের পথ দেখায় না তখন জঙ্গি বা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না। অহিংসার পূজারি গান্ধী যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান না চেয়ে loyal opposition -এর পথ চাওয়া বিশ্বাস করতেন তা ভগৎ সিং ছাড়া আর কেউ ধরতে পারেনি। কোনও আন্দোলনে হিংসা না অহিংসার— কোন পথ ধরতে হবে

সেটা আন্দোলনকারীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে শাসকশক্তির আচরণের উপর। এই বিতর্ক যেহেতু আজও চলছে তাই ভগৎ সিং এখনও প্রাসঙ্গিক।

ভগৎ সিং-এর জন্মদিনের তুলনায় তাঁর আত্মবলিদান (২৩ মার্চ) দিবস সারা দেশ জুড়ে বেশি পালিত হয়। ভগৎ সিং-এর জন্মস্থান লায়লাপুরের গ্রামে প্রতি বছরে মার্চ এবং সেপ্টেম্বরে বিপুল উৎসাহ সহকারে স্মরণ পালিত হয়। হাজার হাজার মানুষ 'ভগৎ সিং মিলাদ'-এ উপস্থিত হন। যে গ্রামে ভগৎ সিং-এর জন্ম সেখানে হাইওয়ে থেকে ৯ কিলোমিটার পাকা রাস্তা বানানো হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ভগৎ সিং মার্গ। ভগৎ সিং-এর কাকা (আর একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী) অজিত সিং-এর নামে একটি বিরাট সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা মনে করেন যে পাকিস্তান মানেই ধর্মান্ধদের অন্ধকার শাসনের দেশ তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানানো যেতে পারে যে উল্লেখিত মেলার দিনগুলিতে উর্দু ভাষায় অনুবাদিত 'আমি কেন নাস্তিক' বইটি প্রতি বছর যথেষ্ট বিক্রি হয়। তৈমুর আলী নামে এক পাকিস্তানী গবেষক ব্রিটিশ পুলিশের মহাফেজখানা থেকে ভগৎ সিং সম্পর্কে তথ্য উদ্ধার করে আমাদের অনেকের অজানা কথা জানাচ্ছেন। কে জানতো যে দলিত সমস্যা নিয়ে ভগৎ-এর তিনটি রচনা আছে? ২৩ মার্চ সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার দাবি পাকিস্তানের নাগরিকরা জানিয়ে আসছেন। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিখ্যাত কবি, গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার সাদাত হোসেন মান্টোর কন্যা। নাস্তিক্য ভাবনা এবং দেশপ্রেম কোন স্তরে পৌঁছলে একজন স্বল্পায়ু মানুষ এত জনপ্রিয় হতে পারেন ভগৎ সিং তার একটা নমুনা। ভগৎ সিং-এর নির্দেশিত পথের কোনটাই যদি আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম না হই তবুও তাঁর প্রতি আমাদের চির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই কারণেই যে উর্দু অভিধান থেকে ইনকিলাব(বিপ্লব) শব্দটি তিনি ভারতীয় উপমহাদেশেই গ্রাম গ্রামান্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

—চয়নপত্র

পদবীর বোঝা

সমাজবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বাধীন ধারাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। লোহিয়া জাতভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে সায় দিয়ে উত্তর ভারতে বেশ কয়েক জায়গায় গত শতাব্দীর ৩/৪ দশকে 'পৈতে' পোড়ানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়, যদিও তা লাগাতার চালানো যায় নি। কিন্তু যে বিষয়ে লোহিয়া কিছুটা সফলতা পেয়েছিলেন তা হলো পদবী বর্জন বা পদবী পরিবর্তন। বেশ কিছুটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হিন্দি ভাষার সুপরিচিত কবি হরবংশ রাই শ্রীবাস্তব তাঁর শিশুপুত্রের 'ডাক নাম' -কেই পারিবারিক পদবী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীবাস্তব পদবীর পরিবর্তে 'বচ্চন' পদবী গ্রহণ করে কবি হরবংশ রাই বচ্চন যথেষ্ট আলোচিত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের বংশধররা যদিও তেমন কুসংস্কার মুক্ত নন, তবুও বোম্বে ফিল্মের কল্যাণে অমিতাভ, জয়া, অভিষেক, ঐশ্বর্য বচ্চন নামক জাত অর্থহীন পদবীতেই পরিচিত আছেন। কায়স্থ শ্রীবাস্তবের পদবী জাতহীন বচ্চন পদবীর চাপে হারিয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশের সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা অতুল অনজানের পিতা তার পারিবারিক পদবী বদ্‌লে অনজান (যার অর্থ অজ্ঞাত) রাখার পেছনে লোহিয়ার আন্দোলনের ভূমিকা আছে। লোহিয়ার এই আন্দোলনের দুর্বল দিক সম্পর্কে না জানলে এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বোঝা যাবে না। প্রত্যেক পদবীর উৎস সন্ধানে গেলে জাত পেশার সন্ধান পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শ্রমজীবী না পরশ্রমজীবী বংশে জন্মেছেন তার কিছুটা হাল্কা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে সামন্তবাদী ব্যবস্থা শূদ্রদের কেবলমাত্র শ্রমজীবী করে রেখেছিল এবং এখনও তা বহুলাংশে বিদ্যমান সে সম্পর্কে লোহিয়ার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যে সামন্তবাদী ব্যবস্থা শ্রমবিমুখ পরগাছা গোষ্ঠীকে বৌদ্ধিক চর্চা, সামরিক আধিপত্য এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেই সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিপক্ষে কথা না বললে পদবী পরিবর্তন বা বর্জন নেহাতই 'শৌখিন মজদুরি'র মতো হাল হয়।

ইদানীংকালেও পদবী পরিবর্তনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। 'চোলিকা পিছে কেয়া হ্যায়' গানের সাথে যিনি নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই ইলা অরুণ-এর জীবন সঙ্গীর নাম অরুণ ইলা। একই পরিবারভুক্ত দুজন শক্তিশালী কবি অনির্বাণ এবং অপাবৃতা নিজেদের পারিবারিক পদবী লাহিড়ী ত্যাগ করে যথাক্রমে অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র এবং অপাবৃতা ধরিত্রীকন্যা হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে দলিত আন্দোলনে আত্মমর্যাদা, নাস্তিক্য, সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতা পেরিয়ার অনুগামীরা এক নতুন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ধরা যাক, কারও নাম ডি.এম.এস.শ্যাম। শ্যাম ঐ ব্যক্তিটির নাম। বাকি অক্ষরগুলি তার পদবী, গ্রাম এবং জন্মদাতার সংক্ষিপ্ত রূপ। ফলে কে কোন বিশেষ জাতভুক্ত তা ধরা পড়ে না। 'বামপন্থার বিপর্যয় কেন'— বইটির লেখক স্বপন মিত্র'র পূর্ব প্রজন্মের পদবী ছিল মিস্ত্রি। স্বপন মিত্র এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন যে কত অপমানের পর তাঁর পূর্ব প্রজন্ম পদবী পরিবর্তন করেছিলেন। কবি তীর্থংকর মৈত্রর প্রকৃত পদবীও মিস্ত্রি। এ হলো এক ধরনের পদবীর বোঝা। জাতভেদ ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলনে পদবী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদের কোন সভায় যদি কোন তথাকথিত উচ্চবংশজাত অথচ মুক্তমনার উপস্থিতি ঘটে তবে উক্ত ব্যক্তিকে দু-ধরনের প্রতিক্রিয়ার সামনে পড়তে হবে। ব্রাহ্মণ বা উচ্চবংশজাত হওয়ার কারণে হয় তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশেষ সম্মান দেখানো হবে অথবা বেশ কিছু মানুষের সন্দেহ অবিশ্বাসের শিকার হতে হবে। অপমানিত হবারও ঘটনা ঘটে থাকে। এই দু-ধরনের ব্যবহারই আপত্তিজনক। মানুষ যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন জন্মের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কোন্ মাতার গর্ভে, কোন্ পিতার ঔরসে সে জন্মাবে সেটা নেহাতই কাকতালীয়। ফলে পদবী নির্ধারণ তার ইচ্ছা বা অধিকারের মধ্যে পড়ে না। এ নেহাতই জৈবিক দুর্ঘটনা। পদবীর বোঝা তখনই মানুষের মাথা বা ঘাড় থেকে নামবে যখন দেশ থেকে জাতব্যবস্থা নিমূর্লীকরণ হবে। এই অযৌক্তিক, অমানবিক, অ-আধুনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক জন জমায়েতের প্রয়োজন আছে যেখানে কউম অস্মিতা সংকীর্ণতার কোনও স্থান নেই। ইতিহাস পাঠের প্রাথমিক পর্যায় পার হলে জানা যায় যে শকপাল পদবীধারী এক মহান ব্যক্তি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় এমনকি আমৃত্যু তাঁর ব্রাহ্মণ শিক্ষকের উপহার দেওয়া ব্রাহ্মণ পদবী ব্যবহার করে গেছেন। সংকীর্ণমনা মূর্খরা জানেন কি যে উক্ত ব্যক্তির নাম ভীম রাও আম্বেদকর?

—হেতুবাদী

ফান্ডেড এন.জি.ও. — মৃত্যুফাঁদ

স্লাইড-১

'ব্রজেন স্যার' ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন— 'হর্ষবর্ধন প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। প্রতি চার বছর অন্তর কনৌজের মেলায় গিয়ে রাজকোষাগারে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণের স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা গরিব প্রজাদের হাতে তুলে দিতেন। রত্ন-অলংকারের ভাণ্ডারে যত হীরা, মুক্তো, চুনি, পান্নাসহ স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার জমা থাকত, তাও দান করে দিতেন। দিনের শেষে রাজপ্রাসাদে ফেরার আগে নিজের শরীরের মহার্ঘ পোষাকটিও (অলংকারসহ) কোনো দরিদ্রের হাতে তুলে দিয়ে বোনের কাছ থেকে কাজ চালানোর মতো কোনো পোষাক ধারণ করে ফিরতেন।' জনৈক ছাত্র মুকুলের প্রশ্ন— 'প্রতি চার বছর অন্তর সর্বস্ব দান করেও নিঃস্ব রাজার কোষাগার রত্নভাণ্ডারে আবার পরিপূর্ণ হয় কি করে? দান পেয়ে প্রজাগণ দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর না হয়ে আবার ভিক্ষার্থী হয় কেন?'

স্লাইড-২

হৃষিকেশ মুখার্জী পরিচালিত নিমকহারাম ফিল্মের সংলাপঃ

সিমি গারওয়াল— মজদুর্‌রা দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছে। শোষণের বিরুদ্ধে, সমাজবাদের পক্ষে কথা বলছে— এতো উত্তম কথা।

অমিতাভ বচ্চন— আবার সেই সমাজবাদের কথা। তাও আবার এক ক্রোড়পতির কন্যার মুখ থেকে শুনতে হচ্ছে ।

সিমি— আমার কোটি টাকা জনতাকে দিয়ে দিলে যদি সমাজবাদ আসে তবে তা আমি দিতে রাজি আছি। (অনুবাদ— লেখক)।

মুকুল বা সিমির সংলাপ নিয়ে কোনো আলোচনায় যাচ্ছি না। তবুও এদের সহায়তা নিয়েই মূল আলোচনায় প্রবেশ করি।

পরশ্রীকাতরতা কিছু মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু অন্যের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হওয়া বেশিরভাগ মানুষের গুণাবলীর মধ্যে পড়ে। তাই কোনো অসুস্থ রোগীর জন্য

অনাত্মীয়রা হাসপাতালে রাত জাগে। পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবির হয়। মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র ভিন্নজনের সহায়তায় পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। এ সমস্ত ঘটনা কিন্তু স্থানিক। কিন্তু 'নরনারয়ণ সেবা' যখন প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক এবং সন্দেহজনক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় তখন তা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন-উত্তরের পর্যায় পৌঁছতে হয়। বিগত শতাব্দীতে এমন একটি দর্শন সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধিকচর্চা এবং তার প্রয়োগে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে যা আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠীকুলের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক দর্শনের জগতে আমূল পরিবর্তনের চাহিদা পীড়িত মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে।

সাপ হয়ে কাটো ওঝা হয়ে ঝাড়ো

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশ দেশে দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন ঘটল। চীনা জ নতা পিকিং দখল করে গণতন্ত্রের এক নয়া রাজ প্রতিষ্ঠা করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের ফলে বিশ্ব পুঁজির রক্তপিপাসু চেহারা উন্মোচিত হল। দেশে দেশে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী লড়াই বাড়তে লাগল, ভিয়েতনামের আকাশ থেকে ফেলা মার্কিনি নাপাম্ বোমা সে দেশের স্বাধীনতা আটকে রাখতে পারল না। সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্রোহী ছাত্রদের সংগ্রামের চারণভূমি তৈরি হল। পশ্চিমি বেনিয়াকুল বুঝল যে শুধুমাত্র সাপ হয়ে কাটলে চলবে না, তার সাথে ওঝা হয়ে ঝাড়বার কূটকৌশল নিতে হবে। জন্ম নিতে শুরু করল ফান্ডেড এনজিও, যা পরবর্তীকালে সংখ্যায় ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়তে লাগল। রামকৃষ্ণ মিশন বা টেরিজার মিশনারিস অব চ্যারিটি যে কাজ শুরু করেছিল তার অন্দরমহলে ছিল ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের পরিকল্পনা। ঈশ্বর পূজারীদের মানবিক তকমা লাগানোর চেষ্টা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই দুটি সংস্থার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জনতার দরবারে পেশ করা হয় না।

ভারত-এ এখন নথিভুক্ত ফান্ডেড এনজিও-র সংখ্যা ৩৭ হাজারের কিছু বেশি (সূত্রঃ এনজিও-র কুকার্যাবলী— এম.এস. জেকব– মাস লাইন পাবলিকেশন, কেরালা, সাল-২০০২)।

বৈষম্যভিত্তিক সমাজে যে সমস্ত দুষ্ট ক্ষতগুলি সাদা চোখে নজরে পড়ে সেইসব ক্ষতস্থানগুলির কাছে ফান্ডেড এনজিও পৌঁছে যায়। যে সমস্ত রোগের কারণে শল্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়, অস্ত্রোপচার জরুরি হয়ে পড়ে, সেখানে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। 'যে মেয়েটা প্রতি রাতে বদলায় হাতে হাতে' (কৃতজ্ঞতা - নচিকেতা) সেই যৌনকর্মীর এই পেশা গ্রহণের কার্যকারণ ব্যাখ

্যা করলে দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। দুর্বার নামে একটি ফান্ডেড এনজিও এদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার দাবি জানাচ্ছে। যে কোনো কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে যে-পেশার অস্তিত্বই থাকবে না, (থাকার প্রয়োজনও থাকবে না) সেই পেশা বাতিলের দাবি না জানিয়ে সংস্কারের দাবি সৎ উদ্দেশ্যে তোলা হয় না। এইভাবেই পথশিশু, শিশু শ্রমিক, পরিবেশ আন্দোলন, ব্যাঙ্কিং, সমকাম সহ বহু বিষয়ের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে ফান্ডেড এনজিও গুলি। সমতাসমাজ নির্মাণের পথে নয়, পুঁজিবাদের মানবিক মুখ প্রতিষ্ঠা করার কাজে নেমেছে এরা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বদরুদ্দিন ওমর কলকাতায় একটি আলোচনা সভায় বলেছিলেন— 'এইসব সংস্কারবিলাসীরা স্থিতাবস্থার গ্রাহ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করতে করতে গণবিরোধী অবস্থান নেবে'। ওমর সাহেবের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল মহম্মদ ইউনুস। ইউনুসের মাইক্রো ব্যঙ্কিং-এর ফোলানো ফানুসটি ফেটে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশে ঋণগ্রস্ত মানুষের আত্মহত্যার বন্যা বয়েছিল। নোবেল পুরস্কারজয়ী ইউনুস-এর বিলাসী জীবন বদরুদ্দিন ওমরের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করেছে। 'মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ' এইসব ফান্ডেড এনজিও গুলি নিজেদের অধস্তন কর্মচারীদের খুবই কম মাস-মাইনে দেয়। চূড়ান্ত বেকারির যুগে বহু যুবক-যুবতী এমনকি সরকার নির্দেশিত মিনিমাম ওয়েজ (MW)ও পান না। অথচ বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় যায়, কারা আত্মসাৎ করে তা জানা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ইমাসে (ইনস্টিটিউট ফর মোটিভেটিং সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট) নামক একটি সংস্থা গ্রহীতার জন্য খরচ করে প্রোজক্ট-এর প্রাপ্ত টাকার ২০ শতাংশ। কর্মচারীদের মাইনে বাবদ ২০ শতাংশ। বাকি টাকা মালিকপক্ষ আত্মসাৎ করে।

দুর্নীতি স্তরে স্তরে

কলকাতা থেকে রাস্তা ধরে ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে শিরাকোল নামে একটি গঞ্জ আছে। তার পাশেই রাজারহাট নামে একটি গ্রাম আছে। দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের বাস। নানাবিধ সমস্যা। চারটি পাড়ার ছোট গলি এসে মিশেছে বুড়োবটতলার কাছে। পানীয় জলের অভাব মেটাতে এখানে এসেছিল একটি ফান্ডেড এনজিও। চার পাড়ার বাসিন্দাদের আলাদা আলাদা টিউবওয়েল বসাবার আবেদনপত্র জমা পড়ল। যথাসময়ে বুড়োবটতলার টিউবওয়েল বসল। আবার চার গ্রামের বাসিন্দারা সমস্যা মেটাবার জন্য এনজিও টিকে সমবেতভাবে লিখিত ধন্যবাদ জানাল। ৫ মাসের মধ্যে টিউবওয়েলটি বিকল হল। অযত্নে সস্তায় বানানো সব যন্ত্রেরই সক্রিয়তা ক্ষণস্থায়ী। মজার কথা— উপভোক্তা চার পাড়ার বাসিন্দাদের জন্য চারটি টিউবওয়েলের খরচ

বরাদ্দ হয়েছিল। তিনটি টিউবওয়েলের টাকা গায়েব।

দমদম স্টেশনে পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এমনই একটি সংস্থা। নথিভুক্ত শিশুর সংখ্যা ৩৫ । কোনোদিনই সকালে ৯-১০ জনের বেশি পথশিশু ছাত্র উপস্থিত হয় না। এদের ৮-১০ টাকা মূল্যের হালকা টিফিন দেওয়া হয় অথচ প্রতিদিন ৩৫৩০ টাকা - ১০৫০ টাকা জাল বিল জমা দিয়ে দৈনিক খরচের পরিমাণ বাড়ানো হয়।

নীতিবোধের অবক্ষয়

দূরদর্শনে একজন মানবাধিকার কর্মীর মুখ প্রায়ই নজরে পড়ে। একে অনেকেই ভুল করে বামপন্থী ভাবেন। কম্যুনিস্ট নেতা পলপট কম্বোডিয়ার কত নিরীহ মানুষকে খুন করেছিলেন তা সরেজমিন তদন্ত করতে কম্বোডিয়া সফর করেন তিনি। বলাবাহুল্য তার বিলাসবহুল সফরের খরচ জুগিয়েযে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা। শ্রীলঙ্কার এলটিটিই কত ভয়ঙ্কর কাজ করে চলেছে তাও দেখবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ঐ মানবাধিকার কর্মী। একটি মার্কিন সংস্থা দুবাইতে একটি ৫তারা হোটেলে মধ্যপ্রাচ্যে নারীদের দূরবস্থা শীর্ষক তিনদিনের সেমিনারের আয়োজন করে। মূল উদ্দেশ্য ইসলামোফোবিয়া প্রচার। ওখানেও আমন্ত্রিত ঐ মানবাধিকার কর্মী। কম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পলপট -এর অবদান, শ্রীলঙ্কা-ভারত সরকারের যৌথ হামলায় অজস্র তামিল মানুষের মৃত্যু মিছিল বা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে (অবশ্যই সৌদি আরব ব্যতিরেকে) রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কাঠামোয় মহিলারা যেরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তা অন্তত ভারতে চিন্তায় আনা যায় না। তবুও দাতা ইয়াংকিদের অন্নদাসদের এছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

ইরাক, আফগানিস্তানে যখন ব্যাপক বোমা বর্ষণে গণহত্যা চলছিল তা রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু ইরাক আফগানিস্তানে যুদ্ধে নিহত মানুষদের অনাথ পরিবারকে সহায়তা করতে আসে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা এবং রেডক্রশ সোসাইটি। **যে হাতে একবার ভিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দেওয়া যায় সে হাত কখনো আকাশের দিকে বজ্রমুষ্টি তুলে আজাদির দাবি জানাতে পারবে না**। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের চাহিদাকে নষ্ট করার জন্য সংস্কারমূলক কাজকে বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রে কারা সামিল হয়েছে তা জানলে কিছুটা সুবিধা হবে। এটা তো ঘটনা যে সামাজিক সমস্যার উৎসস্থল, বহিঃপ্রকাশ, ক্ষোভ নিরসনের পদ্ধতি সম্পর্কে বামপন্থী মহলের লোকজন দক্ষিণপন্থীদের তুলনায় বেশি বোঝে। তাই এইসব ফান্ডেড এনজিও-র মধ্যস্তরের কর্মীদের নিয়োগ হয় প্রাক্তন বামপন্থী

বা হতাশাগ্রস্ত বামপন্থীদের মধ্যে থেকে। ফান্ডেড এনজিওদের ব্যবহৃত ভাষায় এরা এফ.এল অর্থাৎ ফর্মার লেফট্ ব্য ফ্রাস্ট্রেটেড লেফট্। আমাদের ধারে কাছে সক্রিয়দের মধ্যে তুষার কাঞ্জিলাল, বিপ্লব হালিম, মোহিত রায়, স্মরজিৎ জানা, অসীম রায়(দিল্লী), রণবীর সমাদ্দার, মলয় দেওয়ানজী, কান্তি গাঙ্গুলি, ভাস্কর নন্দী, অনুরাধা দেব, সমীর চৌধুরী, কিরীটি রায়, অনুরাধা তলোয়ারদের নজরে পড়বে। সমাজবাদী জর্জ ফার্নান্ডেজ, রাজমোহন গান্ধী (মোহনদাস গান্ধীর নাতি)দের ধনকুবের হওয়ার পেছেনে রসায়ন একই। তাই অনুরোধ সাধু সাবধান। অমৃতের সন্ধান না পেলেও বিষ পানের প্রয়োজন নেই।

সরকারের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির সাথে এইসব ফান্ডেড এনজিও-র সম্পর্ক মধুর। 'জনকল্যাণ'মূলক যেসব ক্ষেত্রে সরকার অপারগ সেখানে এইসব ফান্ডেড এনজিওরা কিছুটা সংস্কারমূলক কাজ তো করে। সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিছুটা কমে। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ফান্ডেড এনজিও-র ফান্ডে যেসব দান জমা পড়ে তা ডলার, পাউন্ড, ইউরো। জাতীয় কোষাগারে (তা যে কোনো ব্যাঙ্কেই হোক না কেন) বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়-বৃদ্ধি শাসন ক্ষমতায় থাকা মানুষগুলির নানা কাজে-অকাজে লাগে। মাঝেমধ্যে ফান্ডেড এনজিও গুলির সাথে সরকারের নকল লড়াই দেখা যায়। এসব সরকারের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য আদায় এবং উক্ত এনজিও গুলি পরিচিতি বৃদ্ধির কূটকৌশল মাত্র।

কারা টাকা দেয়

আলফ্রেড আইজ্যাক বিশ্বাস রানাঘাট এলাকার বাসিন্দা। ছড়াকার জর্জ মীরজাফর গোস্বামীর মতো ছদ্মনামধারী নন। তিন প্রজন্ম আগে এঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এঁর একমাত্র পুত্রসন্তান জার্মানীর হামবুর্গ শহরে চাকুরি করেন। এক জার্মান তরুণীর সাথে বিবাহ হয়েছে। তাঁদের একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। নাতনিকে দেখার জন্য সস্ত্রীক আলফ্রেড সাহেব হামবুর্গ গিয়েছিলেন। তাঁর কথায় শোনা যাক— আমার প্রথম বিদেশযাত্রায় হামবুর্গে পৌঁছে মনে হল রবিবার চার্চে প্রার্থনায় যোগ দেওয়া তো আমার বহুদিনের অভ্যেস। ছেলেকে প্রশ্ন করাতে সে বললো— তোমার বউমা রবিবার তোমাদের প্রার্থনা সভায় নিয়ে যাবে। আমাদের দুজনের কিন্তু এসবে আগ্রহ কম । হামবুর্গ শহরের সবথেকে বড়ো চার্চে একদিন গেলাম । প্রার্থনার পর দেখলাম চার্চের বাইরে খোলা মাঠে দুই মধ্যবয়স্কাকে ঘিরে একটি বিশাল জনজটলা। উঁকি

মেরে দেখলাম আমার পরিচিত 'ফটো প্রদর্শনী'। বিষয়— ভারতের ক্ষুধার্ত মানুষ। আমলাশোল, কালাহান্ডি, বন্ধ চাবাগান-এর ভুখা শ্রমিক যা ভারতের নিত্যদিনের ছবি। বৌমার সহায়তায় জানলাম— প্রদর্শনীর ছবিগুলির উপরে জার্মান ভাষায় লেখা আছে— আপনি এই ভারতীয়দের পাশে থাকলে প্রভু যীশু আপনার পাশে থাকবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অনুদানের মাধ্যমে ভ্যাটিকান সিটির পোপ তার আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগ নিয়েছে ।

আর একটি মারাত্মক সুকর্ম এরা করে থাকে— যেহেতু এখনও এই দুঃসময়েও একদল নিবেদিত প্রাণ মানুষ আছেন যাঁরা উন্নততর মানবিক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যস্ত এবং ঐসব এনজিও গুলির মতোই তাদের কর্মক্ষেত্র প্রান্তিক জনতার মধ্যে তাই খুব সহজেই এনজিও-র পাণ্ডাদের মাধ্যমে বিবর্তনকামীদের গোপন তথ্য যথোপযুক্ত স্থানে পৌঁছে যায়। এ নিছক গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয় ।

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক সমাজকর্মী শ্রীমতী অরুন্ধতি রায় আউটলুক পত্রিকার ২৬ মার্চ ২০১২ তে লিখেছেন— কর্পোরেট জনহিতৈষণা আমাদের জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। যতটা হয়েছে কোকাকোলা। পৃথিবী জুড়ে এখন লক্ষ লক্ষ এনজিও বাইজানটাইন নকশাজালের মধ্য দিয়ে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত রয়েছে কর্পোরেট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে। এই যুক্ত ক্ষেত্রটির সম্পদের পরিমাণ ৪৫০ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা)। এরা হল বিল গেটস ফাউন্ডেশন (সম্পদ ২১ বিলিয়ন ডলার - ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা) লিলি এনডাওমেন্ট (১৬ বিলিয়ন ডলার), ফোর্ট ফাউন্ডেশন (১৫ বিলিয়ন ডলার)। এইসব সংগঠন যাদের টাকা দেয় তাদের সাথে একটি প্রতিশ্রুতিপত্রের মাধ্যমে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় যে গ্রহীতা সংগঠন যেখানেই 'কাজ' করবে সেখানে তাদের কর্মীরা যেন দাতা সংগঠনের চোখ, কান হিসাবেই কাজ করে । উদ্দেশ্য মহৎ বলা যাবে না ।

—অন্যমনে

ধর্মে মন হয়তো ভরে, পেট ভরে না

সেকুলারিজম শব্দটি যে সময়ে ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তখন সারা দেশে টালমাটাল অবস্থা। দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। গম্ভীর বিষয়ে আলাপ আলোচনা প্রকাশ্যে চলত না। বিরোধী মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। প্রশ্ন করার শিবিরের লোকজন হয় নীরব, পলাতক বা জেলখানায়। এককথায় একরকমের স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশে ভারতরাষ্ট্র সেকুলার নাম ধারণ করলো। সেকুলার শব্দটির বাংলা নাম দেওয়া হল ধর্মনিরপেক্ষ। একটু ভালো প্রকাশনা সংস্থার ইংরাজি বাংলা অভিধানে সেকুলার এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটির অর্থ ভিন্ন। সেকুলার শব্দটি একটু প্রাচীন হলেও ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের সময়ে বহুজন চর্চিত হয়। উদীয়মান পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণি চাইছিল যে, রাষ্ট্র-এর কোন নীতি গীর্জা বা পাদ্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সঙ্গত নয় এবং কোনো ধর্মকে (ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম) রাষ্ট্র প্রশ্রয় দেবে না এবং বিরোধও করবে না। রাষ্ট্রনীতি এবং ধর্মনীতি তাদের নিজ স্বতন্ত্র পথ ধরে চলবে। ধর্ম নিরপেক্ষতা (যারা ধর্মের অপেক্ষা রাখে না) শব্দটি অনেকটা নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ, সহজ ভাষায় বস্তুবাদের কাছাকাছি। এসবই ইউরোপের ১৮ শতকের দীপায়ন (The Enlightenment) এর সময়ের চর্চা ও ফসল।

ভারতে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার চুলচেরা বিশ্লেষণ না হওয়ার কারণে অবান্তর ধর্মচর্চার চাষ-আবাদ নির্বিচারে চলতে থাকে। বছরে বছরে মহেশ যোগীর আশ্রম থেকে পাড়ার শনি পূজায় বড় ছোট রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতি দেখা গেল। বাম, মধ্য, ডান-পন্থী নেতারা নির্দ্বিধায় দুর্গা, কালীর ভজনার রমরমা ব্যবসা চালাল। প্রতিক্রিয়া বা অতি-প্রতিক্রিয়ার ফলে মসজিদ গীর্জার প্রার্থনাকারীদের ভিড় বাড়তে লাগলো।

'সেকুলারিজম', শব্দ হিসাবে সংবিধানের পাতায় নিষ্কর্মা বন্দি রইল, তার প্রয়োগ তো দূর।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রঃ গীতা

ধর্মশাস্ত্র আমাদের জানায় যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিল কংসের কারাগারে। ‘দৈববাণী’ ছিল কংসের মৃত্যু কৃষ্ণের হাতেই হবে। পূতনার স্তনে কামড় দিয়ে কৃষ্ণ পূতনাকে মেরে ফেললো। গোপিনীদের বস্ত্রহরণে কৃষ্ণের পরিচিতি বাড়ে। তার যুক্তি ছিল ভগবানের কাছে আসতে হলে আবরণহীন সংস্কারহীন হয়ে আসতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৃষ্ণের অন্যায়, শঠতা, লাম্পট্যকে মান্যতা দেওয়ার জন্য যে ধর্মীয় পুস্তকটি আমরা পাই, তার নাম শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা। এ গীতা থেকে শ্লোক আউড়ে যে কোনো নীতিহীন কাজ আজও করা যায়। আদালতে এ বই ছুঁয়ে অবলীলায় মিথ্যা বলা যায়। স্বর্গ লাভের আশায় মৃতদেহর পাশে রাখা যায়। বাবরি মসজিদ্ ধ্বংসের আগে মনোবল বৃদ্ধির জন্য গীতা স্পর্শের প্রয়োজন হয়েছিল। বিধর্মী মহিলার গর্ভ চিরে ফেলার আগে গীতা, কৃষ্ণ, রামের আশীর্বাদ লাগে। অবলীলাক্রমে গীতা, বেদ, মনুকে স্মরণে রেখে ঘৃণ্য চতুর্বর্ণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এক পর্বে যুদ্ধক্ষেত্রের কাদায় কর্ণের রথ আটকে গেছে। কর্ণ রথ থেকে নেমে কাঁধ দিয়ে রথের চাকা তুলছে। তীর নিক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনকে সখা কৃষ্ণের উপদেশ (এই সুযোগ— ‘তীর নিক্ষেপ করো, অন্ত্যজ সূতপুত্রের জন্ম মৃত্যু আমার দ্বারা পূর্বেই নির্ধারিত’) হল ‘পবিত্র’ ধর্মশাস্ত্র-র অংশ।

এই সময়ে ধর্মের আসল চেহারা

সাধারণতঃ একটি কথা প্রায় শোনা যায় যে যুগে যুগে হিন্দুদের মধ্যে ‘মহান’ সংস্কারকদের আগমনের কারণে ধর্মটি বহুলাংশে শুদ্ধ হয়েছে— ধারণাটি কুযুক্তিপূর্ণ এবং আবেগময়তার শিকার। শুদ্ধ হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব মুক্তির কোনো লক্ষণ না থাকার ফলে যেমন শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নূতন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছ, তেমনই মূল স্রোতের বাইরে বৈষ্ণব, মতুয়া, বলাহড়ি, কর্তাভজা, সাহেবধনীসহ বিভিন্ন দ্রোহীস্রোত বইতে দেখা গেছে। চালু কথায় যাদের আদিবাসী (Tribe) বলা হয় তাঁরা তো পৌত্তলিকই নন, তাঁরা প্রকৃতি পূজারি (সারণা ধর্ম)।

যে পরিবারে অসুস্থ সদস্যর সংখ্যা বেশি, সেই পরিবারে যেমন চিকিৎসকের আনাগোনা বেশি হয়, তেমনই জন্মরোগগ্রস্ত হিন্দুধর্মে ডজন ডজন সংস্কারক এসেও ভারত উপমহাদেশের বাইরে হিন্দুত্বের বাজার (Market) বৃদ্ধি করতে পারেনি। তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রর প্রাজ্ঞজন বিশেষতঃ সের্গেই তোগারেভ-এর ধর্মের ইতিহাস

(History of religion-Mosco pub.) পড়লে জানা যায় যে খ্রিস্ট ধর্ম ইসলাম ধর্ম বৌদ্ধধর্ম দেশে দেশে যুগে যুগে দেশপোযোগী সময়োপযোগী হওয়ার চেষ্টা থাকার ফলে বিভিন্ন বৈচিত্র্য (যদিও যুক্তিহীন) নিয়েই সারা পৃথিবীতে জায়গা করে নিতে পেরেছে। হৃদযন্ত্রে কর্কট রোগ নিয়ে যে শিশুটি জন্মায়, তার দীর্ঘায়ু কামনা করা যায় কিন্তু বাস্তবত তার দীর্ঘ জীবন যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সামাজিক আর্থিক বৈষম্য পূর্ব-নির্ধারিত থাকে— এমনই একটি নির্বোধ বিধান যে শাস্ত্রে আছে, তার সংস্কার সহজপথে হবে না।

অন্য ধর্ম

১) বৌদ্ধ ধর্মঃ

Englne bomeout (Indroduclione Phistoirecre du Buddhasine Indien Paris) জানাচ্ছেন যে গৌতম বুদ্ধের পঁচিশ বছরের ছায়াসঙ্গী প্রিয় ছাত্র আনন্দ বুদ্ধের ‘পরিনির্বাণ’ লাভ-এর পর যখন সঙ্গীতি (সম্মেলন)-এর সিদ্ধান্ত এবং সঙ্ঘ-র নিয়ম-নীতির সাথে মতভেদ প্রকাশ করেন এবং একইসাথে আনুগত্যে ভরপুর হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিক্ষু জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন, এই সময় থেকেই বৌদ্ধধর্ম চেতনায় প্রাতিষ্ঠানিকতার শেকল পরানো শুরু হলো। এই প্রাতিষ্ঠানিকতার বর্তমান প্রতিনিধি ১৪তম দলাইলামা। যে গৌতমবুদ্ধ প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবনকে ছেঁড়া পোযাকের মতো ত্যাগ করে জনতার মাঝে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর নামে বারংবার উচ্চারণ করতে করতে বৌদ্ধধর্ম কুক্ষিগত হলো তিব্বতের দাস ব্যবসার মালিক দলাইলামার হাতে। তিব্বতের মঠগুলি হল ধর্মপ্রাণ দাসেদের বন্দিশালা এবং শ্রমশিবির। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রার ৯৩৭ কোটি টাকার ধনরত্ন নিয়ে দলাই লামা ভারতে আশ্রয় নিলেন। শুরু হলো ভারতে দলাই লামার নিজস্ব ঘরানার বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কলাকৌশল। হিমাচল প্রদেশের ম্যাকলিয়ড গঞ্জ বা উঁচু ধর্মশালায় যাঁর বিশাল বিলাহবহুল ভবনে কেন্দ্রীয় দপ্তর। এখন কিন্তু বস্তুবাদী গৌতম বুদ্ধের পরিবর্তিত পরিচয় ভাববাদী ভগবান বুদ্ধ। মানবতাবাদের বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী দলাইলামা বৌদ্ধ-আদর্শচ্যুতদের প্রাণপুরুষ।

২) ইসলাম ধর্মঃ

‘অন্ন গ্রহণের আগে খোঁজ নাও যে, তোমার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে কোনো প্রতিবেশী অভুক্ত আছে কিনা’— (Bukhari Hidish, Consent pub,page-31)

'মজুরের ঘাম মাটিতে পড়ার আগেই তার মজুরী দাও'— (Bukhari Hadish, Consent Pub, page-47)

মধ্যপ্রাচ্যের নানা সামাজিক দ্বন্দ্বে, নানা সংকটে, আর্থিক অনটনে, দাস ব্যবস্থার যুগে নিজ প্রবর্তিত ধর্মকে মানবিক এবং গ্রহণযোগ্য করার জন্যই হজরত মহম্মদকে এই নির্দেশ দিতে হয়েছিল। এতদিন বাদে আজ কোনো মুসলিম দুনিয়ার নেতাকে এই ধরনের প্রাথমিক স্তরের সমতাবাদের কথা বলতে শোনা যায় না। সৌর বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানহীন ইমাম দিল্লি থেকে চাঁদের অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন এবং পরবের দিন ঘোষণা করেন। যে মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর মানুষকে গণিত বিশেষতঃ অ্যালজেব্রা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, প্রাতিষ্ঠানিকতা সেই দেশসমূহকে আলোর দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। অশিক্ষিতদের 'ফতোয়া' আজ সমস্ত মুসলিম সমাজের কাছে আতঙ্কের কারণ।

৩) খ্রিস্টধর্ম

চার্লস ডারউইন আজ থেকে ১৫০ বছরের কিছু আগে মানুষ কীভাবে এলো, তা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিকর্তার-অসারতার তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ায় পাদ্রী সমাজ খুব চটেছিল। সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘুরছে এটা বলার জন্য অনেক আগে গ্যালিলিওকে (১৫৪৬-১৬৪২) কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। আর্ক-এর জোন বা জোন অফ আর্ক (আনুমানিক ১৪১২-১২৩৯)-এর কথাও আমরা শুনেছি। জিওর্দানো ব্রুনোও তো আমাদের পরিচিত নাম। সেই সময় থেকে এই সময়কে যদি আমরা একটু খোলা মনে দেখি রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলেছে? পোপ পল এই সেদিন স্বীকার করলেন যে 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে'। পুরনো আমল থেকে কষ্টসাপেক্ষ বিজ্ঞান চিন্তাকে জনসমক্ষে আনতে না দেওয়ার অপরাধে তার কোনো শাস্তি হলো না কেন? সমাজ চর্চা বা বিজ্ঞান চর্চা যতই প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার বিরুদ্ধে যেত ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এবং তাদের বিভিন্ন স্বার্থের আশ্রয়দাতারা অসহিষ্ণু স্বৈরাচারী হয়ে উঠত। খ্রিস্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরা গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে যেতে চান নি।

শুধুমাত্র হিন্দুধর্মকে কাঠগড়ায় তুলে অন্য ধর্মকে ছাড় দেওয়া গর্হিত কাজ। সমস্ত ধর্মই এই কথা বলে যে, ধর্মশাস্ত্রর প্রতি আনুগত্য, দাসসুলভ প্রশ্নহীন নতি স্বীকারই প্রথম ও শেষ কথা। সব ধর্মশাস্ত্র পড়ে তার পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়ানো সহজ কাজ নয়। প্রায় অসম্ভব বলা চলে। তার থেকে ভালো উপায় হলো প্রশ্ন তোলা, সব বিষয়ের কার্যকারণ ব্যাখ্যা জানা। যদি জানি যে, মানুষ যে কয়েকটি রোগে ভোগে, তার মধ্যে দু-তিনটি বাদ দিলে বেশিরভাগ রোগের কারণ অপুষ্টি, অখাদ্য-কুখাদ্য খ

াওয়া বা খেতে বাধ্য হওয়া, অশুদ্ধ জল পান করা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা। প্রকৃতি (গরম,বর্ষা, শীত) এর আক্রমণ হতে রক্ষাব্যবস্থা (পোষাক, জুতো, ছাতা, কম্বল,বিছানা) -এর জোগান না পেলে নিজের বা নিজেদের আর্থিক অবস্থা বা দুরবস্থার কথা বুঝতে হবে। তার কারণও জানতে হবে। নিজের বা অন্যদের আর্থিক দুরবস্থার কারণ জানতে দেশের অর্থব্যবস্থা জানা দরকার। কারণ খুঁজলে এর পেছনে সমাজ অর্থনীতি, শ্রেণিভেদ, জাতভেদ, গ্রাম-শহরের ফারাক, কায়িকশ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রমের তফাত ইত্যাদি বিষয়গুলিও আসবে। বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতা থাকলে কোনো অবস্থাতেই পূর্বজন্মের পাপ এ জন্মে দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকলে ঘুচবে এবং পরজন্মে সুখের মুখ দেখা যাবে— এ ধরণের আজগুবি ধারণা গজাবে না, একই পদ্ধতিতে মায়ের অসুখ, বোনের বিয়ে, ভাই-এর চাকরি, ছেলের পড়াশোনা ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোনো সমস্যার কারণ অন্তত জানা যাবে। একইভাবে সমাধানের পথ পেতে মন্দির-মসজিদ-এ মানত, তাগা-তাবিজ পাথুরে আংটির শরণাপন্ন হতে হবে না। এতক্ষণ যাবৎ বহুবার যে প্রাতিষ্ঠানিকতা শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে তার গোড়ায় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ভাষায় কামারের এক ঘা মারতে হবে। বহুদিন স্যাঁকরার ঠুকঠাক করে আমরা সময় নষ্ট করেছি। এখন সময় এমন যে, প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করার জন্য দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষকে ধর্মাচ্ছন্ন করে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, এখন আর ধর্মকে শুধুমাত্র নিদ্রাদায়ক 'আফিং' বলা যাবে না। এটি এখন আত্মহননের নিশ্চিত উপায়। 'অসহায়ের সহায়' নয়, ক্ষমতাবানদের স্বার্থরক্ষাকারী অস্ত্র। 'আর্তের আর্তনাদ নয়', দাঙ্গাবাজদের জয়ধ্বনি। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে পারি এমন এক দেশ, এমন এক সমাজ, যেখানে প্রাচীন মন্দির-মসজিদ-গির্জাগুলি হবে প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসবিদদের গবেষণার বস্তু আর তার পরিত্যক্ত উন্মুক্ত অঙ্গনগুলি হবে আমাদের শিশুসন্তানদের আনন্দ-আশ্রম, তাদের স্বাধীন মুক্তাঞ্চল।

—অন্যমনে

বুদ্ধ মার্কস আম্বেদকর ঃ অসমাপ্ত সংলাপ

‘আমি বৌদ্ধধর্মকে বেশি পছন্দ করি। কারণ এ ধর্ম একসঙ্গে তিনটি নীতির কথা বলে, যা অন্য কোনো ধর্ম বলে না। বৌদ্ধধর্ম প্রজ্ঞা (কুসংস্কার ও অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে সঠিক বোধ), করুণা(প্রেম) এবং সমতা (সাম্য)। সৎ ও সুখী জীবনের জন্য মানুষ যা চায় এ হচ্ছে তাই, দেবতা কিংবা আত্মা— এরা কেউ সমাজকে রক্ষা করতে পারে না। মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ সমস্ত দেশগুলির ধর্মব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। —আম্বেদকর (সূত্রঃ বিবিসি, লন্ডন দ্বারা প্রচারিত আম্বেদকর-এর ভাষণ, মে, ১৯৫৬)।

এরপরও এদেশে বেশ কিছু নির্বোধ মনে করে যে আম্বেদকর সাম্যবাদবিদ্বেষী ছিলেন। এদের মধ্যে যেমন ভণ্ড আম্বেদকরবাদী আছে, তেমনই অর্ধশিক্ষিত বামপন্থীও আছে। আম্বেদকর -এর উপরোক্ত বক্তব্যর সাথে অনেকেই সহমত পোষণ করতে পারেন দ্বিমত পোষণ করার দলও কম ভারি নয়। একথা মেনে নেওয়া উচিত যে, জীবনের শেষ সময়ে পৌঁছে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আম্বেদকর-এর পক্ষে গভীর বৌদ্ধধর্ম চর্চা খুব বেশি করা সম্ভব হয়নি । অন্তত তাঁর লিখিত রচনাবলীর মধ্যে তার প্রকাশ ঘটেনি। অথচ বৌদ্ধধর্মচর্চার ইতিহাস অনেকদিনের। বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে রিস্ ডেভিডস এবং ওলডেনবার্গ-এর নাম সুপরিচিত। যদিও দুজনে একই সুরে বৌদ্ধধর্মের জয়গান গান নি।

ভারতীয়দের মধ্যে রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর মতো সুচিন্তক মানুষ তো ছিলেনই। রাহুল দীর্ঘকাল যাবৎ বৌদ্ধধর্ম চর্চা করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন মূলত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে বস্তুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় তারই আকর্ষণে। এরপর তিনি কেন তাঁর মতে উন্নততর বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন তা এক অন্য যাত্রাপথ।

আম্বেদকর-এর ভাবনা চিন্তার মধ্যে যে সমাজবাদ-গণতন্ত্রের মানবিক মূল্যবোধ কাজ করেছিল তা এদেশের সমাজবাদী, গণতন্ত্রী এমনকি কমিউনিস্টদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের কমিউনিস্টদের নেতৃত্বদানকারীদের

অধিকাংশই আম্বেদকর-এর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। যদিও এ বিষয়ে গত শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভিন্ন ভাবনা কমিউনিস্ট শিবিরেই বিদ্যমান ছিল। একইসাথে আম্বেদকর-এর জীবনাবসানের পর নব্য আম্বেদকরবাদীদের অধিকাংশ কমিউনিস্টদের অচ্ছুৎ মনে করেন, যদিও এঁদের মধ্যেও এ প্রশ্নে দোলাচল আছে।

কমিউনিস্টদের সাথে আম্বেদকর ভাবনার সাযুজ্য—

১) মার্কসবাদের পাতায় পাতায় পাওয়া যায় যে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমাজবাদের প্রাথমিক ধাপ। আম্বেদকর সারাজীবন এই দাবিতেই সোচ্চার ছিলেন।

২) মে দিবস কমিউনিস্টদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আম্বেদকর জীবনে দুবার মে দিবসে কমিউনিস্টদের শ্রমিক সংগঠন, যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন শ্রমিক নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাংগে, এআইটিইউসি-র আহ্বানে কমিউনিস্টদের সাথে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মে-দিবসকে শ্রমিক দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন এবং তাঁর অনুগামীরা পালন করতেন।

৩) ক। শ্রম সময় ১২ ঘণ্টা/১৪ ঘণ্টার বদলে ৮ ঘণ্টা হওয়া উচিত।

খ। ইএসআই প্রথা চালু করা উচিত।

গ। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স-এর যথার্থ বৃদ্ধি হওয়া উচিত।

ঘ। মহিলা শ্রমিকদের গর্ভকালীন ছুটি বৃদ্ধি হওয়া উচিত।

ঙ। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালু করা উচিত।

চ। মালিক, সরকার ও শ্রমিক সংগঠনের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়া উচিত।

উপযুক্ত দাবিগুলি নিয়ে গত শতাব্দীতে আম্বেদকর এবং কমিউনিস্টরা একই সময়ে কখনো যৌথভাবে কখনো আলাদা আলাদা ভাবে শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই চালান।

৪) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সাথে কমিউনিস্টদের এবং আম্বেদকর-এর ‘নরম গরম’ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে গান্ধীর নানাবিধ কুকর্ম উভয় পক্ষকেই গান্ধী সম্পর্কে বেশ কিছুটা মোহমুক্ত করে তোলে।

৫) স্বাধীনতা আন্দোলন -প্রশ্নে আম্বেদকর ‘স্বরাজ নয়, সুরাজ চাই’ স্লোগান দিয়েছিলেন। সুরাজ যে ৪৭ সালে এদেশে আসেনি তা বুঝে কমিউনিস্টরা সঠিক কারণেই ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, দেশ কা জনতা ভুখা হ্যায়’ শ্লোগান তুলেছিল। অবশ্য কেউই পেরিয়ারের মতো ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ কে দুঃখের দিন বলার সাহস দেখাননি।

৬) ১৯৩৮-এ কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র গিরনি কামগড় ইউনিয়ন

ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। আম্বেদকরও ব্যাপক প্রচারে সক্রিয় হন। তাঁর ডাকা ধর্মঘটের প্রধান বিষয় ছিল 'দলিত শ্রমিকদের দুর্বিষহ অবস্থার অবসান।' ধর্মঘটের মূল দাবি ছিল শিল্প বিরোধী আইন বাতিল করা— যে বিলটির লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারকে খর্ব করা এবং ধর্মঘটকে বেআইনী করা।

৭) কমিউনিস্টদের কাছে যেমন কার্ল মার্কস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বইটি সমাদৃত তেমনই আম্বেদকর রচিত 'অ্যানিহিলেসন অফ কাস্ট' বইটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লক্ষ্য করা দরকার যে, বইটির নাম অ্যানিহিলেসন অফ কাস্টিজম নয়। অর্থাৎ আম্বেদকর জাত শব্দটির সার্বিক বিনাশ চেয়েছিলেন। কমিউনিস্টরা যখন শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলেন তখন শ্রেণি বিভাগের অস্তিত্বও মানেন। তাই যথার্থ কারণেই শ্রেণি বিনাশ করে শ্রেণিহীন সমাজের পরিকল্পনা নেন।

আম্বেদকর এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে মতান্তরঃ-

আম্বেদকর মার্কসবাদ নিয়ে কবে থেকে ভেবেছিলেন তা জানা যায় না। জীবনের শেষভাগে তাঁর কিছু রচনা ও টুকরো বাক্য পাওয়া যায়। আম্বেদকর-এর জীবনীকার ধনঞ্জয় কীর লিখছেনঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে তিনি গ্রন্থাগার থেকে কার্ল মার্কসের রচিত দাস *ক্যাপিটাল (পুঁজি)* বইটি সংগ্রহ করেন এবং *দি বুদ্ধ অ্যান্ড কার্ল মার্কস* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ করেন।

যাঁরা *দি বুদ্ধ অ্যান্ড কার্ল মার্কস* পুস্তকটি পড়েছেন এবং বুঝেছেন তাঁরা বলতে পারবেন যে উপরোক্ত পুঁজি গ্রন্থটি পাঠের কোনো প্রভাব *দি বুদ্ধ অ্যান্ড কার্ল মার্কস* গ্রন্থটির উপর পড়েনি। মাঝারি মাপের এই প্রবন্ধটিতে যতটা বৌদ্ধধর্মের জয়গান গীত হয়েছে ততটা মার্কসবাদ সম্পর্কে মতামত নেই।

আম্বেদকর একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। কমিউনিস্টদের স্বপ্নের একনায়কতন্ত্রের সাথে হিটলার-এর একনায়কতন্ত্রের কোনো মিল নেই। আম্বেদকর হিংসার মাধ্যমে সমাজ বদলের কথা ভাবতেন না। কোনো শিশুর জন্ম কি রক্তপাত ছাড়া হয়েছে? আসলে কমিউনিস্টরা যে একনায়কতন্ত্রের কথা বলে তা ভারতের প্রেক্ষপটে একলব্য, শম্বুকদের পরের প্রজন্মের শাসনাধীন ভারত, যেখানে রাম, দ্রোণাচার্য পদানত থাকবে যা তাদের অবশ্য প্রাপ্য শাস্তি। হিংসা কমিউনিস্টদের কাছে তাঁদের সমাজ-বীক্ষণ অনুযায়ী অপ্রিয় অথচ প্রায় অনিবার্য একটি প্রকল্প। রাষ্ট্রীয় হিংসা যখন গণতান্ত্রিক আইনসিদ্ধ পথে লড়াই করে রোখা যায় না, তখন দ্রোহীজনতার জোয়ার হিংসা-অহিংসার ফারাক বুঝতে চায় না। আজ যাঁরা বুদ্ধ বা আম্বেদকর-এর দোহাই দিয়ে কমিউনিস্ট বা হিংসার বিরোধিতা করেন তাঁরা সম্ভবতঃ অস্ত্রধারী সিধো, কানহো, বিরসা মুণ্ডা, ভগৎ সিং-এর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে চান। এতে

স্বার্থান্বেষীকুলের সহায়তাই করা হবে, যা অহিংসার নামে আজীবন করে গেছেন গণশত্রু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

অ্যানিহিলেসন অফ কাস্ট বইটি জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের এক সম্মিলনে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ। এখানে উপস্থিত হওয়ার প্রশ্নে আয়োজকদের সাথে আম্বেদকরের মতান্তর হয়েছিল। যেহেতু এই সম্মিলনের আয়োজকদের মধ্যে সম্পাদক শ্রী সন্তরাম জি.সি. নারাং, হর ভগবান সহ বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত উচ্চ গোত্রীয় ছিলেন, তাই আম্বেদকর-এর সং শয় ছিল যে তাঁর পূর্বে প্রেরিত রচনা সম্মিলন চলাকালীন সম্পাদিত বা বিকৃত হতে পারে। আম্বেদকর-এর আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে সম্মিলন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং ভারতের রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অবশ্য পাঠ্য একটি গ
্রন্থের প্রকাশের সুযোগ ঘটে।

ভারতে জাত ব্যবস্থা একটি পুরাতন সামাজিক ব্যাধি। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ শিকার অন্ধকার ভারতের ৮৫ শতাংশ মানুষ। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র যখন সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের কবলে তখন হিন্দুধর্মের শৃঙ্খলে আটকে থাকা সব ধরনের দলিত (দলনের শিকার মাত্রই দলিত) জনগণ যার মধ্যে নারী, ধর্মান্তরিত মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধরা এব্যবস্থা উচ্ছেদে লড়াকু সাথী। বস্তুবাদী না-ধার্মিকরা তো থাকবেনই।

এই ব্যাপকতম যুক্তমোর্চার একদল সাথী হতে পেরে, যাঁরা মনে করেন যে জৈবিক ঘটনাক্রমে তাঁরা উচ্চবর্ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন অথচ জাতভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর থেকে কম লড়াকু নন। যাঁরা মনে করেন পূর্ব প্রজন্মের কমিউনিস্টদের জাত বিনাশের আন্দোলনে অনীহার জন্যই বর্তমান প্রজন্মের কমিউনিস্টদের ‘‘প্রায়শ্চিত্ত’’ করতে হবে, তাঁরাও এই সংগ্রামের সাথী। অবশ্য এই বিষয়ে বাধা দেবার লোকজনও আছে। নৃতত্ত্বের ইতিহাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাঁরা প্রচার করেন যে ভিনদেশী আর্যরা মাথায় টিকি, গলায় পৈতে, মনুস্মৃতি হাতে নিয়ে পৃথিবীর এই প্রান্ত দখল করে নিয়েছিল তাঁদের বোধোদয়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

এদেশে যেমন অনেক কমিউনিস্ট শ্রেণি সংগ্রামায় নমঃ বলতে বলতে শ্রেণি সমঝোতা করে, পুঁজিবাদের সেবা করে, তেমনই অনেক আম্বেদকরবাদী সকাল সন্ধ্যায় আম্বেদকর জিন্দাবাদ, সংরক্ষণ জিন্দাবাদ বলতে বলতে মনুবাদী দলগুলির পদতলে আশ্রয় নেয়। যাঁরা ভারত-এ শ্রেণি ও জাত-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে উদাসীন থাকেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

১) কলকাতার ৮০ হাজার ফুটপাত-ঝুপড়ির বাসিন্দারা মূলতঃ এস.সি. ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, এদের মধ্য উচ্চবর্ণ-র হদিশ পাওয়া যাবে না।

২) সারা ভারতে শিশু শ্রমিকদের ৯৮ শতাংশ উচ্চবর্ণ বা উচ্চবর্গ জাতি নয়।

৩) ফিক্সড স্যালারি ইনকাম গ্রুপ-এর ৯৩ শতাংশ উচ্চবর্ণ জাত।

৪) যে ৮২ টি শিল্পপতি গোষ্ঠী ভারতের পুঁজি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তাঁদের মধ্যে টাটা ব্যতিরেকে সকলেই বর্ণহিন্দু।

তাই জাত বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণকে আলাদা করে দেখার যে কোনো প্রচেষ্টা, উভয়কে সমান্তরাল হিসেবে বিবেচনা করা বা একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো একটি মারাত্মক ভুল। জাত ভেদ অবসানের জন্য লড়াই শ্রেণিসংগ্রাম এক ও সদৃশ নয়। তাঁরা একে অপরের বিপরীত বা সমান্তরাল নয় বরং তাঁরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত ও পরস্পরের পরিপূরক।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে পেশ করা যাক।

কোনো এক সভায় এক বক্তার ভাষণঃ

''আমাদের অর্থাৎ শূদ্রদের কোনোমতেই বামুন বলে চালানো ঠিক নয়। মানুষেখেকো বামুনদের মানুষ বলে চিহ্নিত করাও বেঠিক কাজ।''

উপরোক্ত ভাষণ শুনে এ ধারণা করা ভুল হবে না যে বক্তা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত এক রাগী মানুষ। অথবা অন্য একটি সভায় অন্য এক বক্তা ভাষণ দিচ্ছেনঃ-

''যদি কোনোদিন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে মিথ্যা ভগবান বা মিথ্যা দর্শন প্রচার করে যেসব সংস্থা টিকে আছে তা ভেঙে দেওয়া। যতসব ধর্মগ্রন্থ আছে তা উপনিষদ গীতা থেকে রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ সব বই কোনো পাহাড়ের গুহায় ঢুকিয়ে দেওয়া।''

এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ভাষণদানকারী একজন কড়া ধাঁচের মাথা গরম কমিউনিস্ট।

উপরোক্ত দুটি ভাষণের অর্থ পরিবর্তন না করে অন্যভাবে লিখিতাকারে পেশ করা যায়ঃ ' সম্প্রতি শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হোক— এই মর্মে একটি প্রস্তাব এসেছে। এতে আমার আপত্তি আছে। পৃথিবীর কোথায় একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সব মানুষকে নরখাদক বলে ঘোষণা করা হোক— এই মতে কিছুতেই সায় দিতে পারিনে।'

দ্বিতীয় ভাষণটিকে যদি এইভাবে লিখতে হয়ঃ

যদি কোনোদিন এখানে কমিউনিস্ট স্টেটের প্রতিষ্ঠা হয়, তার প্রথম কাজই হবে দেশব্যাপী যত ছোটো বড়ো মাঝারি সঙ্ঘ আছে সব ভেঙে দেওয়া। মানুষের মন থেকে false God এবং False philosophy দূর করা। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, 'এ-সব ঝুটা হ্যায়'। তারপরে কাজ হবে হিমালয়ের একটি গুহা আবিষ্কার করে এদেশের

যতকিছু ধর্মগ্রন্থ— উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ অরবিন্দ-এর ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের সমস্ত বই এই গুহার মধ্যে সমাধি দেওয়া।

উপরোক্ত দুটি ভাষণের অংশ কানে ঢুকলেই ধারণা হবে যে প্রথমটি কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী রাগী যুবকের এই সময় জেহাদী বক্তব্য। দ্বিতীয়টি নিশ্চিতভাবেও কোনো না-ধার্মিক কমিউনিস্টদের 'কালাপাহাড়ি' ঘরানার তেজী ধারণার বহিঃপ্রকাশ।

মজার কথা এই যে লিখিত দুটি অংশের রচয়িতার (একই ব্যক্তির) রচনাকাল আজ থেকে ৮২ বছর আগে। ২য় মজা— রচয়িতার পারিবারিক পদবী চক্রবর্তী। ভণ্ড আম্বেদকরবাদী এবং অর্ধশিক্ষিত কমিউনিস্টদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে রচনাকারের নাম শিবরাম [(তার ব্যবহৃত সকৌতুক বানানঃ শিব্রাম চক্রবর্তী) সূত্রঃ১. *শূদ্র না ব্রাহ্মণ— মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী*, (১৯৩৩) সূত্রঃ২. *নবশক্তি*, জুলাই ১৯৩৩।]

আজকাল বাজারে এক অদ্ভুত 'মূলনিবাসী' তত্ত্ব চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের একাংশ এও জানাচ্ছেন যে, ডি.এন.এ. পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায় যে, কারা বহিরাগত আর্য আর কারা ভূমিপুত্র মূলনিবাসী। জীববিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন তাঁরা এখনও পর্যন্ত যে কোনো মানুষের পূর্ববর্তী ৭(সাত) প্রজন্মের হদিশ খুঁজে পেয়েছেন। ডি.এন.এ. পরীক্ষায় বিগত দিনের মানুষ কোন ধরনের জল-বায়ু-প্রকৃতির মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, জিন বাহিত বংশানুক্রমিক কোনো রোগ ছিল কিনা, খাদ্যাভাস কী ছিল, শ্রমী বা শ্রমবিমুখ ছিলেন কিনা তার হদিশ পাওয়া যায়। সামান্য রুক্ষ ভাষায় বলতে হলে মধ্যভারতের গোন্দ উপজাতি, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জারোয়া, সেন্টেলিজ, লিটল আন্দামানীজ ছাড়া বাকি সব ভারতীয়ই সংকর প্রজাতি। আর্যরা লুঠেরা সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা সপরিবারে এ ভূখণ্ডে এসেছিল এরকম ভাবনা তো মূর্খেরাও ভাবতে পারে না। ডারউইন-এর বই পড়লে তো জানা সহজ যে, আমরা একই মানব-মানবীর সন্তান। তিন-সাড়ে তিন হাজারের ব্রাহ্মণ্যশাহী ব্যবস্থাকে ভাঙতে হলে 'কুয়োর ব্যাঙ' হলে চলবে না।

ডারউইন-এর আবিষ্কার (মানুষ এলো কোথা থেকে) বিশ্বজনের কাছে প্রচারিত হওয়ার পরে গত শতাব্দীর প্রথমভাগে একজন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ তুলনায় কম মেধাসম্পন্ন— এই পূর্বনির্ধারিত ধারণা নিয়ে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করল। ফল দাঁড়াল মারাত্মক। নৃতত্ত্ববিদ্যা(Anthropology) বিষয়টি প্রায় মৃত স্তরে পৌঁছল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর নৃতত্ত্ববিদ্যার সাথে যুক্ত হলো জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, জীবনবিদ্যা, জিনতত্ত্ব ইত্যাদি। নৃতত্ত্ববিদ্যা নতুন চেহারা জনসমক্ষে এলো ডি.এন.এ. পরীক্ষা এরই ফলশ্রুতি। ডি.এন.এ-র পুরো শব্দটি এরকম— Deoxyribo Nucleic Acid। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো ফিলোজেনেটিক্স। এই বিভাগের সহায়তায় নির্দিষ্ট

জনগোষ্ঠীর বিষয়ে গবেষণা শুরু হলো। ফলে পূর্বনির্ধারিত মত বা অনুমানের উপর নির্ভরশীলতা বিজ্ঞানচর্চায় গুরত্ব পেলো না। ভারতীয় উপমহাদেশের বসবাসকারীদের উপর যাঁরা গবেষণা করেছন তাঁদের মধ্যে কলিনস, গাওয়ার, অরবিন্দ চক্রবর্তী, ব্রেনাম, অলসন, তুষার চক্রবর্তী, রেইখ, কুমারস্বামী থঙ্গরাজ, প্যাটারসন, প্রাইস এবং লালাজী সিং-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে ক্রস মার্ক এবং নেচার পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ক্রস মার্ক পত্রিকার ভল্যুম সংখ্যা ৮৮-১৩ এবং নেচার পত্রিকা - সংখ্যা ৪৬১ পড়লে জানা যাবে যে গবেষকগণ বহিরাগত (আর্য এবং অন্যান্য লুঠেরা গোষ্ঠী) এবং ভূমি সন্তানদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁদের গবেষণাপত্র বা লিখিত বই পুস্তকে প্রাচীন উত্তর ভারতীয় (ANI) এবং প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় (ASI)— পরিষ্কার এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রাচীন উত্তর ভারতীয়দের মধ্যে বহিরাগতদের জিনের প্রভাব অন্যদের তুলনায় শক্তিশালী— এও পরিলক্ষিত হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ-এর উপরোক্ত বাসিন্দারা সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক সংরক্ষিত সম্প্রদায় (Protected Communities)। মধ্যভারতের গোন্ড উপজাতি স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়। ভারতে আর্য আক্রমণ বিষয়ে যাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন (রোমিলা থাপার, মার্ক কেনোয়ার, মাধব দেশপাণ্ডে, শিরীন রত্নাগর-এর নাম করা যায়), তাঁরা কেউই সংকর প্রজাতি ভারতীয়দের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করেননি।

এ বিষয়ে *ব্রাহ্মণ ও জাত ব্যবস্থার উদ্ভব* শীর্ষক রচনাটি ইউম্যান জেনেটিকস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে যাদবপুরের মলিকিউলার বায়োলজির গবেষক অধ্যাপক তুষার চক্রবর্তীর বক্তব্য লক্ষণীয়ঃ- ‘এমনকি যমজ ভাই-এর মধ্যেই জিনগত পার্থক্য পাওয়া যায়।’ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতে দুজন মানুষের চোখের মণি’র, দশ আঙুলের ছাপ, Pelvise (শ্রোণী)-র হাড়-এর মধ্যে অমিল থাকবেই।

‘মূলনিবাসী’ তত্ত্বের প্রচারকগণকে অনুরোধ যে, তাঁর যেন জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক পড়েন, যেখানে ছাত্রদের পড়ানো হয় এবং ছবি এঁকে দেখানো হয় যে, কালো, সাদা, বাদামী রঙ-এর পায়রার গর্ভে পূর্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন রঙ-এর পায়রা জন্ম নিতে পারে। জন্মদাত্রী ও সন্তান পায়রার রঙ আলাদা হতে পারে। জিনতত্ত্বের এই সীমাহীন রহস্যের কারণ না জেনে ‘মূলনিবাসী’ প্রচারকগণ প্রকৃতপক্ষে আর্য অহমিকার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন বা/এবং বিজ্ঞান ও সমাজচেতনা পাঠে অনীহা দেখাচ্ছেন।

—অন্যমনে

অন্তিম জবানবন্দী

প্রাককথন - ১

আমি তখন কলেজে ২য় বর্ষের ছাত্র। ডি.কে.বি. ক্লাসে একটি অঙ্ক 'বোর্ডে' লিখে আমাদের উত্তর জানতে চাইলেন। কিছুক্ষণ বাদে একজন ছাত্রকে উত্তর জানতে চাইলেন, ছাত্রটি জানালঃ- পারছি না স্যার। ডি.কে.বি. ছাত্রটির নাম জানতে চাইলেন। ছাত্রটি জানাল তার নাম আদিত্য মাল। ডিকেবি ছাত্রটির নাম পদবী বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করলেন, ক্লাসের এপাশ ওপাশ থেকে চাপা 'খি' 'খি' হাসি শোনা গেল। ডিকেবি এরপর আমাকে ধরলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বললামঃ- পারব না। এরপর বেশ কদিন কলেজে আদিত্যর দেখা পেলাম না। তখনও ছাত্র ইউনিয়নের মাতব্বরি করি। কদিন বাদে পানিহাটিতে আদিত্যর বাসায় গেলাম। মধ্যবয়স্কা দুঃস্থ চেহারার ওর মা এসে বললেনঃ- ''ছেলেটার যে কী হয়েছে? বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, খাওয়া ঘুমও কমে গেছে। বাপ মরা ছেলেটাকে নিয়ে কী যে করব?'' আদিত্যর সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালালাম। ওর ভাষায় ও যা বললঃ ''দ্যাখ্, পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় এসে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই। আমার পদবী নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি এখানে অনেক শুনেছি। ওসব গা সহা হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত যে তুই ঐ অঙ্কটার উত্তর বের করতে পারতিস। আমার প্রতি দয়া, করুণা, সহানুভূতির জন্য তুই চুপ করে ছিলি। ডিকেবি দের অপমান সহ্য হয় কিন্তু তোদের সহানুভূতিতে পেচ্ছাপ করি।''

প্রাককথন - ২

১৯৮৭ সালে দিল্লীতে একটা সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছি। বিষয় - এই সময় আম্বেদকর চর্চার প্রাসঙ্গিকতা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সভাস্থলে পৌঁছতে একটু দেরি হল। পৌঁছে আয়োজকদের কাছ থেকে চা খেয়ে মঞ্চে উঠলাম। নির্দ্ধারিত চেয়ারে বসার সময় শুনলাম সঞ্চালক অতিথি বক্তাদের পরিচয় দিচ্ছেন। দলিত আন্দোলনের বাঘা বাঘা নাম — কাঞ্চা আইলাইয়া, ভি.টি. রাজশেখর ইত্যাদি।

হঠাৎ সঞ্চালক বলতে শুরু করলেনঃ ‘‘মান্যবর কাশীরামজীর নেতৃত্বে দলিত আন্দোলন এখন সাফল্যের দরজার কাছে। এই সময়ে কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবনা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে নেতৃত্ব দখলের ধান্দা করছে। এদের গতিবিধি, বক্তব্যের প্রতি সতর্ক নজর দেওয়া দরকার।’’ সভার শ্রোতাগণের গুঞ্জন এবং মঞ্চে উপবিষ্টদের শরীরী ভাষা তাঁদের অস্বস্তির প্রকাশ ঘটাল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সামনে রাখা শব্দযন্ত্রটি চালু করে বললামঃ ‘‘আমি এখানে আমন্ত্রিত বক্তা, আমন্ত্রণ পত্র আমার কাছেই আছে। আয়োজকদের অনুরোধ সত্ত্বেও নিজের খরচে দিল্লী এসেছি। ৩দিন বাদে নিজের খরচে কলকাতা ফিরবো। এখানে এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেছি। সঞ্চালক যেসব আশঙ্কার কথা বলেছেন সেরকম বিপজ্জনক হবার যোগ্যতা আমার নেই। পৃথিবীর নামী দামি সাবান দিয়ে স্নান করলেও আমি আমার পূর্ব প্রজন্মের অপরাধের ময়লা পরিষ্কার করতে পারবো না। শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর *মস্কো বনাম পন্ডিচেরী* পুস্তকে *শূদ্র না ব্রাহ্মণ* প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদের নরখাদক বলেছিলেন, সেই বাক্য রোজ একবার মন্ত্রের মতো জপ করি। আয়োজকদের পয়সায় এককাপ চা খেয়েছি। তার দাম ২৫ পয়সা এখানে জমা রেখে এই আলোচনাসভা ত্যাগ করছি। আয়োজক এবং শ্রোতারা আমার ঔদ্ধত্যের জন্য মার্জনা করবেন।’’

সারা সভাস্থল জুড়ে ভয়াবহ গোলযোগ শুরু হল। সঞ্চালকের উপর বেশ কিছু উত্তর ভারতীয় গালমন্দ বর্ষিত হলো। ফলে সঞ্চালক-এর পরিবর্তন হলো। আমি বোকা বোকা চেহারা নিয়ে বক্তাদের মাঝে বসে রইলাম এবং যথাসময়ে আলোচ্য বিষয়ে বললাম।

প্রাককথন - ৩

সকালে ঘুম ভাঙ্গল এক মহিলার যন্ত্রবাহিত কণ্ঠস্বরে। তাঁর কথাঃ- আপনি তো ব্রাহ্মণ তবুও আমাদের দলিত সাহিত্য সম্মেলনে আসেন কেন? কেই বা ডাকে আর আপনার উদ্দেশ্যই বা কী? তোতলাতে তোতলাতে জানাইঃ- আপনাদের সাহিত্যচর্চা থেকে কিছু শিখতে চাই। মহিলা চটজলদি কর্কশ কণ্ঠস্বরে জানালেনঃ- আমাদের কাছে শিখে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যের দুনিয়ায় হাততালি কুড়োবেন নাকি?

প্রাককথন - ৪

১৯৮৮ সালে চেতনা লহর পত্রিকার ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তার একটি সংখ্যায় সলমন রুশদি-র স্যাটনিক ভার্সেস বইটির কড়া সমালোচনা করি। ক্রিক রো থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় এক বামপন্থী মহলে পরিচিত লিখলেন—চেতনা

লহর পত্রিকায় পেট্রোডলার সাহায্যপ্রাপ্তরা ইসলামিক মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

প্রাককথন - ৫

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ লাগু করার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছি। বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা সভা সংগঠিত করে বাম ঘরানার নেতৃস্থানীয়দের মতামত জানতে চাইছি। একটি সভায় আমার বলার পর লিবারেশন-এর তৎকালীন নেতা অরিজিত মিত্র যা বললেনঃ ‘‘এই আন্দোলন যারা সংগঠিত করছে তারা শ্রেণি সংগ্রামে বিভাজন আনার আন্তর্জাতিক চক্রের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে।’’

প্রাককথন - ৬

তসলিমা নাসরিন কে নিয়ে তখন বাংলা বাজারে তুলকালাম। অরিত্র পত্রিকায় লিখলামঃ ‘‘তসলিমার বেশিরভাগ লেখা বা সাক্ষাৎকার হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ শক্তিকে সংগঠিত হতে সাহায্য করছে। তাঁর রচনা *লজ্জা* তো রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রচার দলিল।’’ একটি আলোচনা সভায় অরিত্র-র ঐ রচনাটি-র কিছু অংশ পাঠ করে অধিকার আন্দোলনের এক ‘‘ভদ্র কর্মী’’ বললেনঃ ‘‘তসলিমার রচনা ইসলাম তোষণকারীদের সেকুলার দুনিয়া থেকে ছিটকে দিয়েছে।’’

প্রাককথন - ৭

১৯৭৪-এ এশিয়ার মুক্তিসূর্য-এর উত্তাপে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাই হতে চলেছে। এক বন্ধুকে জয়প্রকাশ-এর আন্দোলনের কথা জানালাম। তাঁর চটজলদি কথাঃ ‘‘ছোড়দা কামালপুরে যে দলিল জমা দিয়েছেন তাতে ৭০ দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে দেরি নেই। ওসব জয়প্রকাশ- টয়প্রকাশ বাদ দাও। এই অজ্ঞাত পরিচয়ের ‘‘ছোড়দার দলিল’’ অবশ্য আমি চোখে দেখিনি। ১৯৮১তে সেই বন্ধুর সাথে আবার দেখা। আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে। সে জানাল যে– যে কোন পিরামিড আকৃতির সংগঠনে বহুস্বর শোনা হয় না। দল, গোষ্ঠী, সংগঠন একজন– মাত্র একজনের আজ্ঞাবহ দাসে ভর্তি থাকে। বহুবার শোনা বিরক্তিকর কতগুলি শব্দ তার মুখ থেকে শুনলামঃ হরাইজনটাল, ভার্টিকাল ...। বন্ধুটি এও জানাল যে, আমি আসলে পিরামিডের নিচের স্তরে আছি। কয়েকবছর বাদে ওর সাথে আবার দেখ া। ও তখন একটি সুপরিচিত ফান্ডেড এন.জি.ও.-র পরিচালক। নির্দ্বিধায় বললঃ ‘‘তোমাদের সমাজ বদলানোর কাজটা আমাদের মেথডে করলে গৃহে স্বাচ্ছ্যন্দ এবং গৃহের বাইরে সমাজসেবী হিসেবে খ্যাতি বাড়বে। ভবঘুরের মতো পথ খুঁজে সময়

নষ্টর কোনও মূল্য নেই।”

প্রাককথন - ৮

এক সাংবাদিক বন্ধু, যে সংবাদপত্রের দুনিয়ার পরিভাষায় ‘পুলিশ বিট’-এর দায়িত্বে আছে, আমাকে জানালোঃ– তুমি একটু সাবধান থেকো, তোমার সাথে রাষ্ট্রদ্রোহীদের যোগাযোগ আছে এই রকমই গোয়েন্দা দফতরের ধারণা। আমি জানালামঃ- আমি তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলতে শুধুমাত্র মৃত্যুভয়হীন আদর্শবাদী কাউকে ভাবি না তদুপরি তাকে রাষ্ট্রের মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার প্রতি নির্ভরশীলতা ছাড়তে হবে। এরকম একজনকেই দেখেছি হাওড়া ব্রিজের মাথার উপরে লাফালাফি করতে। যার ফলে দমকল বাহিনীর কর্মীদের জান কয়লা হতে দেখেছি। ২ ঘণ্টা দমকল বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে প্রায় উলঙ্গ লোকটি ধরা পড়ে বলেছিল— ফির পুলিশ কো তং করেগা, যবতক্ আমজনতা ভূখা রহেগা, মেরেকো রোটি, কাপড়া মোকান কা জরুরত নেহি হ্যায়। এর থেকে বড় দেশদ্রোহীর দেখা আমি অন্তত পাইনি।

প্রাককথন - ৯

এক কলেজ শিক্ষক (প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী) গবেষণার কাজের জন্য আমার কাছে উত্তরবঙ্গের ‘‘বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ” (১৯৬৭)-এর অংশগ্রহণকারী সাধারণ কৃষকদের নাম পরিচয় জানতে চাইলো। যেহেতু যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কর্মীদের শ্রেণি-জাত সম্পর্কে জানাই আমাদের তৎকালীন কাজ ছিল, আমি বিনা দ্বিধায় ঐ গবেষককে আমাদের ‘ফিল্ড রিপোর্ট’ দিয়ে দিলাম। গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবার পর অন্যজনের কাছ থেকে শুনলাম যে গবেষক এই তথ্যসূত্রে আমার নাম লিখেছে এবং পরিচয় হিসাবে ‘ডবল এজেন্ট’ বলেছে। পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে আমাকে রাষ্ট্রের চরই বলা হয়েছে।

প্রাককথন - ১০

যাদবপুর-প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন পরিচিত ছাত্রছাত্রী, যারা পড়াশুনার ফাঁকে ক্যাম্পাস আন্দোলনে জড়িত থাকে, বস্তি-বাসিন্দা মুসলমানদের আর্থিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান জানার জন্য আমার সহযোগিতা চাইল। রাজাবাজার এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি মহল্লা ঘুরে ওরা স্থানীয় বাসিন্দার সাথে কথাবার্তা (inter-view) চালালো। ওখানে একটি ছোট খাবার দোকান আছে যেখানে পরিচিতির সুবাদে বিকালের দিকে খাওয়া আড্ডা দেওয়া যায়। ওখানে খাওয়াদাওয়ার পর কথাবার্তা চলাকালীন এক ছাত্রী হঠাৎ ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে ধূমপান শুরু করল।

একটু ধমকের সুরে ওকে সিগারেট খেতে বারণ করলাম। ও সিগারেটের বাকি অংশ (কাউন্টার) অন্য একটি ছেলের হাতে তুলে দিল এবং ছেলেটি বাইরে গিয়ে সিগারেট শেষ করল। খাওয়ার বিল মেটাতে গিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা পরিচিত ব্যক্তিটি প্রশ্ন করলেনঃ ''এ লেড়কি তসলিমা নাসরিন বননা চাহতি হ্যায় ক্যা?'' আত্মরক্ষার তাগিদে জানালামঃ ''পুরানে জমানে মে নবাব লোগোকা বেগম লোগ হুক্কা পিতি থি''। বেশ কদিন ঐ ছাত্রছাত্রীদের দেখা পাইনি। হঠাৎ ৮বি বাসস্ট্যান্ডে সেই মেয়েটির সাথে দেখা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে ও জানালঃ ''আপনারা মোল্লাদের পুরুষতন্ত্র ভাঙতে চান না। আমার সাথে সেদিন আপনার দুর্ব্যবহার আসলে সমস্ত নারী সমাজকে অপমান করা। নারী-পুরুষের সমানাধিকার আপনাদের এজেন্ডার মধ্যে নেই।'' সম্প্রতি শুনলাম যে মেয়েটির একটি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত পরিবারে বিবাহ হয়েছে এবং সেও দীক্ষিতদের একজন।

প্রাককথন - ১১

ইতিহাসবিদ কোসম্বীর সব রচনা পড়ে যখন অরিত্র পত্রিকায় লিখলাম যে কার্ল মার্কস-এর ভারতচর্চায় খামতি আছে এবং কোসম্বী মার্কসবাদী পদ্ধতিতেই জানিয়েছেন যে ভারতীয় সমাজে ক্লাস এবং কাস্ট-এর দূরত্ব কমে গেছে। আমার বামপন্থী বন্ধুরা আমাকে তন্‌খাইয়া (বেইমান) ঘোষণা করল। ভারতে মানবিক সমাজ গঠনে মার্কসবাদী, আম্বেদকরবাদী, পেরিয়ারবাদীদের যৌথ সংগ্রামে সাফল্য আসবে - এই ধারণা প্রচার শুরু করলাম।

নিজস্বী

বাল্যজীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছবার আগেই বুঝে গিয়েছি যে আমার পরিচয় অনেকের মতই একমাত্রিক নয়– বহুমাত্রিক। জৈব দুর্ঘটনা এবং পরিবার পরিবেশ আমাকে ব্রাহ্মণ, হিন্দু, পুরুষ, বাঙালি, বাঙলা ভাষাভাষী, মধ্য মধ্যবিত্ত ইত্যাদি কুঠুরিতে ভাগ করে দিয়েছে। আমার পিতামহ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কয়েকবছর বরিশালের বাড়ি ছেড়ে কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়িয়েছেন। শিক্ষকের মর্যাদার তুলনায় তিনি পৌরোহিত্য, দীক্ষাদানকে অগ্রাধিকার দিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত কারও বাড়িতে পূজো করতে যেতেন না, দীক্ষা দিতেন না। এমনকি অন্যদের ছায়াও স্পর্শ করতেন না। তার একটি বদভ্যাস ছিল, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় স্নান করতেন। শৈশবে দেখেছি আমার মা-ঠাকুরমা তাঁর জন্য স্নানের ৪ বালতি জল পুকুর থেকে এনে দিতেন। ওনার প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই আমার দেওয়ার ছিল না। নঞর্থে তিনিই আমাকে ব্রাহ্মণ্য ভাবনা বিরোধী করেছেন।

কৈশোরেই ডিরোজিয়ান পথে গোমাংস খেয়ে সবাইকে জানান দিতে চেয়েছিলাম আমি হিন্দু নই। শ্মশানের ডোমদের বাড়ির ঘন্‌ঘনিয়ার সাথে লুডো খেলে, পাঞ্জাকষা খেলে, ওর মার হাতে রুটি মাংস খেয়ে গোত্রচ্যুত হতে চেয়েছিলাম। বাড়িতে পৈতে (উপনয়ন)-এর উদ্যোগ নিলে বাড়ি থেকে পালাবার হুমকি দিতাম। ২৭ বছর বয়সে ১৭ জন বন্ধু মিলে আদালতে এফিডেভিট করে পারিবারিক ধর্মের পরিবর্তে মানবতাবাদকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। কাস্ট-এর জায়গায় কাস্টলেস লিখতাম। তবুও শুনতাম, কয়লার ময়লা যায় না শত ধৌত করিলে। স্বগোত্রের কাছে প্রতিদিন নিন্দিত হতে লাগলাম। ‘ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে’র মানুষজনকে সাথী হিসাবে তেমন পেলাম না। বন্ধু সুপরিচিত জৈব বিজ্ঞানী অধ্যাপক তুষার চক্রবর্তী কোনও একদিন বলেছিলেনঃ তোমাদের এই জাত-পাত-এর গপ্পো ছাড়ো। ব্যাঙাচী বা শিম্পাঞ্জীর বাচ্চাদের মধ্যে খামোখা বিবাদ লাগানো কেন? এসবের মধ্যে অর্থনীতি খোঁজ। আসল সত্য সেখানেই।

সূর্যাস্ত না হলে যেমন সূর্যের প্রয়োজন বোঝা যায় না তেমনই জীবনান্তই জানাতে পারে যে জীবনের প্রয়োজন কতটা ছিল। তাই বেছে নিলাম সেই পথ ঃ .... হে তুঁহু মম শ্যাম সমান। কোনও এক সময়ে দেহদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কল্পনায় আনা যায় না এমন এক দৃশ্য দেখছি। আমার দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এন.আর.এস হাসপাতালের মর্গের দিকে, সেখানে অপেক্ষা করে আছে আমার বন্ধু গণেশ ডোম। আমার দেহ বহন করছে আমার প্রাণাধিক প্রিয় অরিন্দম, আমাদের নাস্তিক্য পাঠের আসরের মধ্যমণি, আমার কৈশোরের বন্ধু আমান উল্লা, যে শিশু শ্রমিক হিসাবে হাওড়ার গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল। এখন দিনমজুর হিসাবেই দিন কাটায়। দেহের পায়ের দিকে রয়েছে কন্যাসম উৎসা আহমেদ যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনাময় গবেষক, উৎসার পাশে রয়েছে সুশান্ত (ভণ্ডুল নামেই বেশি পরিচিত) যে মতুয়া পরিবারে জন্মে লোকধর্ম নিয়ে গবেষণা করছে। সদ্য ঘনিষ্ঠ একদল নাট্যকর্মী ছেলেমেয়েরা গাইছেঃ আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছ তুমি...। তার পিছনে হোসিয়ারী জুটমিলের শ্রমিকরা ইনটারন্যাশনাল গান গাইছে— জাগো জাগো সর্বহারা অনশন বন্দী ক্রীতদাস। ওদের সাথে অনভ্যস্ত কণ্ঠে গলা মেলাচ্ছে মতুয়া কবিয়ালরা, দলিত আন্দোলনের কর্মীরা। আশ্চর্য দৃশ্য — জানাজায় অংশগ্রহণের যে পোযাক পরে মুসলমানরা শেষ যাত্রায় সঙ্গী হয় সেই পোযাকে পার্কসার্কাসের বেশ কয়েকজনকে দেখছি। আকুলনয়নে কাঁদতে দেখছি ‘বিস্ময় কিশোর’ রৌনক কে। মিছিলে পিছিয়ে পড়েছেন অনু বৌদির হাত ধরে প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন

ব্যাপারী। শেফালী বিশ্বকর্মকারের হাত ধরে নকশালবাড়ি থেকে এসেছেন খোকন মজুমদার যার সাহচর্য এর আগে বহুবার আমাকে আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। আমার বিদায়ে যাদের আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার কথা তারাও বিস্মিত নয়নে জন-জমায়েত দেখছে। কোন ফাঁকে আমার অলটারনেটিভ ইগো অসীম আমার ঠাণ্ডা শরীরে একটা লাল সালু চাপিয়ে দিয়ে বলে গেল — বিদায় কমরেড।

আমি তখন চিৎকার করে বলছি — হে ভাবী চিকিৎসক ভাইবোনেরা আমার শরীরে বার বার অস্ত্রাঘাত করে খুঁজে বের করো আমার বংশলতিকা যার শীর্ষে রয়েছে একটি অ্যামিবা যে হিন্দু নয়, ব্রাহ্মণ নয়, রাষ্ট্রদ্রোহী বা রাষ্ট্রের চর নয়, নারী বা পুরুষ নয়, বাঙালি বা ভারতীয় নয়, ইসলাম প্রচারক নয়, অথবা খোঁজো সেই প্রথম মানব-মানবীকে যারা পরস্পরের দেহে জলপাই পাতা ঢাকা দিয়ে বলেছিলঃ- আমরা দুজন স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে।

বরফের ট্রের মধ্যে শুয়ে আমি এরপর তুষার রায়-এর কবিতা আবৃত্তি করে চলেছি — চিতার আগুন নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখো পাপ ছিল কি না।

—চেতনা লহর

Caste Class Relations

We do not know any name of economists who studied India and denied the fact that Indian society was and is class divided. Economists seldom use these words such as proletariat, bourgeoisie, haves, have-nots, working class, capitalists etc. Their apathy to those words does not matter much. But there is much confusion within the social scientists whether Indian society is caste divided or not. Even some of the social scientists say that casteism in India is super structural phenomenon and it has no relation with economic structure or base, but it is connected with residual part of feudal system. This paper will deal with class-caste relations in West Bengal, mainly Kolkata, from an activist point of view. For overcoming primary level of ignorance of such people, who say that casteism is not an important factor in West Bengal, we request them to have a look in matrimonial pages of newspapers.

DAFODWAM (Democratic Action Forum of Dalits, Women and Minorities) made a survey on footpath dwellers of Kolkata with assistance from CMDA (presently KMDA) and the report was published by CMDA in its Bulletin on February, 2004. That report said that there was only one Brahmin among 10000 (ten thousand) footpath dwellers of kolkata. Mani Mohan Chakraborty was staying in a jhupri near 4 no. Bridge, Park Circus. He was a mentally challenged person and had the habit of begging in front of Big Mosque of Park Circus on every Friday (Zumma Bar) and in front of Park Circus Market on every Sunday. His family resided at two storied building at Netaji Nagar, Tollygunge, Kolkata (South). Rest of the footpath dwellers were either from the S.C. community or from the Muslim community. All of them were evicted from villages as they did not get any kind of

job there. Landlessness pushed them into the state of homelessness.

DAFODWAM worked on child labourers of Kolkata who are usually called *TENIA*. Usually they work at car repairing shops, tea stalls, bread and biscuit making factories, small restaurants (*bhater hotel*) etc. All of these child labourers are from SC, OBC and Muslim families. Unyan, a funded NGO somehow managed to get that report and published in their magazine in May, 1999.

In a magazine named Naba Udyog, published from Shibpur, Howrah in February issue, 2005, Bilyadal Mukhopadhyay wrote an interesting prose about beggars of Kolkata. After a long interaction with beggars of Kolkata his surprising reaction was like this: "Brahmin beggar earn twice, sometimes thrice in comparison with other beggars." (ibid)

According to the report submitted by Mass Education Department, Govt. of West Bengal on the success and setback in Sarvo Siksha Abhijan, May, 2011 Project, it was found that among the drop-out students, most of them were either from SC/ST community or from Muslim community. Do we see any class caste relation from the report mentioned above?

If not yet, let us discuss about BPL card holders of families residing under Dumdum Municipality, North Dumdum Municipality, South Dumdum Minicipality and Rajarhat-Gopalpur Municipality which are situated in the north-eastern part of Kolkata. Among 3000 BPL card holders (at random survey report, published in Deshkal, June, 2013) only 12 families were identified as upper caste Hindus.

Now let us look at the top-listed income-tax payers of Kolkata as reported by an RTI activist of DAFODWAM. From topper of that list to the 104th person all tax-payers are upper caste Hindus. The 105th person one is a Muslim and the 112th person is a Scheduled Caste person. Then why are Bengali "BHADRALOK BABUS" being pampered by rest of the Indian people for not allowing practices of casteism or discrimination based on caste, religion or gender.

There are three (3) layered reasons behind this kind of chauvinism.

The reasons are stated here in the following manner:

A. Myth of Bengal renaissance.

B. Hegemony of phony socialist, phony communist.

C. Weakness of non-Brahmin movements.

A. Myth of BENGAL RENAISSANCE:

It is a fact that the pioneers of Bengal Renaissance had no motive to mislead the people of colonial Bengal. But as Binay Ghosh, a wellknown sociologist and Saroj Dutta, a Marxist literati, wrote that Bengal Renaissance was limited to a radius of 20 km within Calcutta (now Kolkata). As conditions of Enlightenment were almost fulfilled in Europe and as that could not be implemented in colonial India an aborted form of Renaissance took position of the midwife to give birth to some BHADRALOK BABUS who were and are defenders of the status quo.

B. From late 1920s to present day many communists and socialists tried to fight casteism in their own way.

Singravelu Chettiar (1860-1946), first generation communist of South India was one of them. He was with E.V. Ramaswami Periyar in the self-respect movement and against untouchability.

Ram Monohar Lohia, a socialist leader, worked against casteism in his own way. Damodaran (of undivided CPI) wrote in New Age (January, 1960), party organ of undivided CPI, against casteism. D.V. Rao (CPIML) wrote in their Telegu (English magazine, forward (special issue, 1982) which contained the method of eradication of caste from Indian society. Even from last three decades different activist- writers from Marxist-Leninist camps like Anuradha Gandhy, Ranga Nayakma, Alok Mukhopadhyay, Devnathan, Govind Kelkar, Debi Chatterjee, Santosh Rana, Thomas Mathew have proved by their action that they are determined to build a classless and caste free society. It should be noted that there are personalities from democratic arena such as D.D. Koshambi, Rahul Sankrityana, Sukumari Bhattacharya, Debi Prasad Chattopadhyay, Ramkrishna Bhattacharya, Asish Lahiri, Kaniska Chowdhury, Arundhuti Roy,

Anand Teltumble, Kanchaillais, Gopal Guru, Babaia, Gail Omvedt who think that Dalit right is an important part of human rights. But phony communists (Kosambi called them Official Marxist) never took program against casteism but they considered the marginalized people as vote bank. Moreover, a section of them has used the word subaltern very carefuly. According to the Oxford Dictionary, the word subaltern means a person or groups who are in subordinated position for several reasons. During the Sepoy Mutiny, British Government named the rebellions as subalterns because rank of the rebels within the army was in the lowest stratum. Antonio Gramsci whose famous 'Prison Notebooks' was written in Mussolini's jail added that those forms of subordination were manifestations of consequences emerging from the victims' place in the hierarchies of race, class, professional strata, gender, language, religion, skin color etc. Prof. Ranajit Guha introduced subaltern studies following Gramsci. He did not object to the word "Nimnabarg" in the translation of his articles in Bengali. He wanted to mean the word Barga (in Bengali) as tier of society which is neither caste nor class.

But after Ranajit Guha the school of subaltern studies has now become the hunting ground of some pseudo democrats. Some of these Trojan horse have brought into subaltern studies a dangerous aspect, that of identity movement, as an alternative to class based movement. So their "subalterns" are either outclassed from calss or outcasted from caste. Post-Modernist writers have also used the word (sub-altern) to dilute the significance of it. Allan Sokal correctly unmasked these unscrupulous thinkers in his book, Post Modernism: Fashionable Nonsense. This type of intellectual bankruptcy will destroy the anti-caste anti-class movement.

C. Partition (1947) and Bangladesh War (1971) are main reasons, though other factors are there. In the 1950's refugees from upper caste families somehow managed to settle near Calcuta or suburbs. But refugees from Dalit communities (mainly Namasudras) who migrated around that war time are now facing insecurity due to Amended Citizens Bill (2003), passed in both Rajya Sabha and Lok Sabha without any opposition.

There was not a single leader of West Bengal from SC/ST/OBC/ Minority who had the courage and capability or organizing all discriminated people based on identity. There were some regional leaders and community leaders but that could not make any effect on Bengali society as a whole.

Matua, a folk religion based on non-Vedic and non-Brahmanical philosophy was founded by Harichand Thakur and strengthened by his son Guruchand Thakur, lost its potentiality when P.R. Thakur, grandson of Guruchand Thakur surrendered to Brahmanical political clique. Now Matua's position is almost similar to other traditional religious sects. For that reason anti-caste movement faced a major set-back.

Jogendranath Mandal who after tedious effort succeeded to send B.R. Ambedkar in Gana Parishad, had to leave East-Pakistan in the year 1950. He had to fight in defense of himself till his death (1967) for his attempt of Dalit Minority unity. His wide vision was misrepresented not only by hindutwadi leader Shyama Prasad Mukherjee but also by his own associate like Apurba Lal Majumder. His name is still being sarcastically called as 'Jogen Ali Molla' by those who do not want Dalit Miniroty unity.

In the decade of 50 when communists and socialists of different camps were being strengthened and abolition of caste system was not the agenda of those political groups. Ambedkar's idea could not reach to those people for whom Ambedkar spent his life. All marginalized section of people became silent vote bank of different rulling parties or seeking to be rulling parties. Truly speaking this fragmentation is still going on.

Now it should be concluded here that there is no Chinese wall between those dreamers who are seriously working for annihilation of caste and those who are committed to abolish the class exploitation.

Now, the call of day is

UNITE DALITS UNITE WITH DALITS

paper presented at Workshop,
organised by: Sociology department of St. Xaviers College (Sept. 2015)

Let us Carry on the debate with our teachers

Caste engrossed and poverty stricken country like India has enough capability to secure the first position in the race of backwardness. It is surprising to note that in such a country the followers of Karl Marx, B.R. Ambedkar and Periyar stand in a contradictory position which do not render due respect to the abovementioned teachers. Since, we are not able to turn them up in a symposium, we can try to unveil the true nature of Neo Ambedkarites, Neo Periyarists and spoiled Marxists, through the study of the works of Ambedkar, Periyar and Marx.

(a)

Ambedkar delivered a speech on Buddha or Marx in a Buddhist conference in Katamandu on 20 November, 1956 (16 days before his death). He mainly spoke on the life style of Buddhist monk in the conference. In his speech he expressed a skeptical notion regarding the question of dictatorship and use of force in Marxism. He never used any harsh comment about Marxism throughout his life, except in some personal talks. There are different views regarding the question of dictatorship and force in Marxist camp too. Some of them believe in multiparty system, even after formation of socialist Government. Some have doubt in Marx's famous observation that "Force is the midwife of every old society pregnant with the new one "(Capital, Vol-1, Note1). However, the point is, in order to launch working class movement, Ambedkar formed united front with the communists in Maharastra's workers movements several times. Consequently, dalits have nots, the most depressed (social & economic) section received a positive result from this kind of unity. Once Ambedkar opined, "We may accept MARX, may not. But we shal not leave the path Jyoti Ba.

Note: 1. this observation, however, is not advocacy; it is observa-

tion. It is taking account of the fact-certainly a fact when Marx was writing - that hitherto social changes sufficiently fundamental to be called Revolutions had not occurred peacefully.

A section of Marxists or "Marxists" thinks that abjuring violence Parliamentarian form of movement only can lead India or other countries towards a better society. Another section, who glorifies violence, thinks without active support and participation in movements demanding partial issues of all kind of depressed people only armed action will reach its goal. Major section of Marxists are in a position that combination of peaceful and non-peaceful, parliamentary and extra parliamentary, violent and non-violent movement will change the future of society. Accordingly to third section's opinion, path of violence should not be glorified or denounced and until abolition of state, class violence cannot be avoided.

Therefore, it is subject to research that why a section of Ambedkarites hate Marxism.

Periyer, throughout his career had not encountered any sort of conflict with the communists. He and Singeravellu, a first generation communists of South India, together carried out a rigorous and constant struggle against untouchability in 1930's. The experience of his Soviet tour made him interested in Socialism and Atheism. Not a single sentence against communists can be found in his collected works.

Probably, Neo-Periyarists do not want to know about this.

Marx's study on India is remarkable and unique, but not unquestionable.

Kosambi, D.P. Mukherjee did not agree with the observation of Karl Marx regarding the study of India. The fact is Marx's study on India was based on those works which were not acquainted sufficiently with caste - based unequal society of India. But having a lot of difficulties Marx commented on casteism in his 'German Ideology' (1845-46) and 'Capital' (1867).

Marx criticized *'The philosophy of poverty'* of Prudhon and wrote a book *'The Poverty of Philosophy'* (1847).

Marx says in *'The Poverty of Philosophy'*;

"Under the patriarchal system, under the caste system, under the

feudal and corporative system, there was division of labour in the whole of society accordingly to fixed rules. Were these rules established by a legislator? No. Originally born of the conditions of material production, they were raised to the status of laws only much later. In this way these different forms of the division of labour became so many bases of social organization. As for the division of labour in the workshop, it was very little developed in all these forms of society." (151-152, first published in 1847 French Edition).

Marx apprised the caste division several times in his work *'The Critique of Political Economy'* (1859) He wrote, "... Or legal system may give the ownership of land to some families or may determine some families as the hereditary land worker."(P-201).

In 1853 he observed in his article *"The Future of British Rule in India:"* Modern industry resulting from the railway system, will dissolve the hereditary divisions of labour, upon which rest the Indian castes, those decisive impediments to Indian progress and Indian power" (P-497 1977, Vol-1).

But the expereince of today does not show as Marx dreamt of. Marx did his research on caste as profession and class in his famous work 'The Capital' with special reference to the condition of India and Egypt.

Point should be noted here that insufficient information is responsible for the incompleteness of Marx's work. Today, some of the unpublished works are going to be translated and printed, of them some letters on India are there.

Somehow Marx missed the track of national movements took place earlier than 1857. For that reason, 'subalterns researchers' after Ranajit Guha have accused Marx without any hesitatiion. Regarding this question we are eager to know the reaction of Ranajit Guha. Perhaps, honest person like Dr. Guha would not appreciate his unqualified students.

How far is it correct to say that Marxist groups and parties have not done anything against the casteism, communalism and patriarchy? Answer is both YES and NO. In fact, most of the communists thought that after the socialist or new democratic revolution (like Russion

on 7 November and Chinese on 1 October) new government would proclaim that the issue of casteism, communalism and patriarchy will disappear.

Before that the issue should not be emphasized in their programme. Point is that they don't want to understand that the emancipation from these three evils, mentioned above, is closely connected to the question of politicial revolution.

It is mentioned in the first part of the present article that Periyar and Ambedkar worked jointly with the communists.

Damodoran a communist leader, wrote a series of articles against the caste system in New Age (Journal) published May, June, July & August 1960.

Debiprasad Chattopadhyaya also wrote valuable articles against the caste system. The ardent followers of *Manu* may not stand with those articles. (*Indian Atheism - People Publishing House, New Delhi*).

At the same time V.T. Rajashekhar's article published in 'Dalit Voice - '*Why Marx failed in Hindu India*' has to studied and answered carefully.

India is a defacto upper caste Hindu state and Brahminism derived from Manusanghita is still the guiding Philosophy of Indian ruling classes. Until the abolitions of caste systems and discriminations based on gender, community (religious and linguistic), there is no chance of victory of class struggle, in whatever form.

At present, the time has come to turn back, to look back to judge the correctness and incorrectness of the past activities. Since, Indian state has, with the command of imperialism, declared war against the 90% of population, in various ways.

So, we badly need UNITY– UNITE DALITS, UNITE WITH DALITS.

paper presented at Chandigarh,

organised by: Arvind Memorial Trust

পবিত্র জল

ভিআইপি রোডের দমদম পার্ক বাস স্টপেজে নেমে বোনের বাড়ির দিকে হাঁটছি। বোনের বিয়ের পর ওর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হয়নি। ৮ বছর প্রেম করে বোন চন্দনা কানাইকে বিয়ে করেছে। কানাই-এর বাবার ৪ বছর আগের কথাগুলো মনে আঙ্খ ছে— ‘‘দমদম পার্কের প্রথম বাসিন্দা আমি। প্রতিষ্ঠাতাই বলা চলে। অনাদি মুখার্জীর নাম বললে একবারে লোকে বাড়ি দেখিয়ে দেবে”। মুখার্জী মশাই এরপর আমার বোনের ঠিকুজী-কুষ্ঠি দেখতে চাইলে আমি বলেছিলামঃ- ‘‘থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষাটাই জরুরি”। মুখার্জীবাবুর মন্তব্যঃ-‘‘আজকাল প্যাথলজিক্যাল ইনস্টিটিউট বাজারে দালাল ছেড়েছে”। গ্রীষ্মের তাপে পথ চলা দায় হয়ে পড়ছে। বোনের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি একটা কল থেকে জল পড়ে একটা বালতির জল উপচে পড়ছে। জলের অপচয় বন্ধ করতে জল পড়া বন্ধ করে দিলাম। কোথা থেকে একটা লোক দৌড়ে কাছে এসে হম্বিতম্বি শুরু করলঃ- ‘আপনি অদ্ভুত লোক তো। গোপালের ভোগের জন্য এ জল তুলছি। আপনি কে, কোন জাত কে জানে? খাটনিটাই বেকার হলো।’ অপ্রস্তুত হয়ে পাশের বোনের বাড়িতে কড়া নাড়লাম। বোন বেরিয়ে এলে ওকে কলতলার ঘটনাটা জানালাম। বোনের সাথে কলতলার দিকে আসতে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক জল ফেলে আবার বালতি বসিয়েছেন। বোনের সাথে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ- বৌমা, ইনি আপনার কেউ হন? আত্মীয় কি? বোন বললঃ- হ্যাঁ, ও আমার দাদা। নিজেরই দাদা। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু গলায় বললেন, ‘ভাই— মাফ করবেন। আপনি ব্রাহ্মণ জানলে এতসব হতো না। আসলে আমরা তো ঘোষ-গয়লা ঘোষ। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বংশধর। এসব নিয়মকানুন একটু মেনেই চলি। গোপালের ভোগ পবিত্র না হলে চলবে কেন’? আমি বালতির দিকে তাকালাম। প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। গলার মধ্যে শরীরের যতটা থুতু-কফ জমে থাকে বের করে, তার সাথে ঘৃণা মিশিয়ে জলভরা বালতির মধ্যে ফেলে বললাম, ‘নিয়ে যান জল। বামুনের থুতু মেশানো জলে আঙ্খ পনার গোপালের ভোগ পবিত্র হবে।’

—জনমন

আলবানিয়া-ভারতে নিরীশ্বরবাদ চর্চা—
একটি তুলনামূলক দৃষ্টিপাত

আলবানিয়া (ক)

‘‘আলবানিয়ার ধর্ম আলবানিয়াবাদ’’— আলবানিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান এনোভার হোজা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বহুবার উচ্চারণ করেছেন। যদিও সুবিখ্যাত সাহিত্যিক পাস্কো ভাসা (১৮২৫-৯২) এরকমই ভাবতেন। বাক্যটির মধ্যে কড়া জাতীয়তাবাদের গন্ধ থাকাতে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা হোজার এই স্লোগানকে গুরুত্ব দিতেন না। হোজার সময়কালে স্তালিন ব্যতিরেকে সারা পৃথিবার কোনও কমিউনিস্ট নেতাকে আলবানিয়ান নেতারা মান্য করতেন না। রোজা লুক্সেমবার্গ - গ্রামাস্টি-কাস্ট্রো-হোচিমিন তো বটেই, মাও সেতুংও আলবানিয়ান কমিউনিস্টদের চক্ষুঃশূল ছিলেন। আলবানিয়ায় জাতীয়তাবাদ নূতন চেহারা নেয় পৃথিবীর একমাত্র নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরের মাধ্যমে। অথচ যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপপ্লবের মাধ্যমে নির্মাণ-বিনির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণের দ্বারা একটি রাষ্ট্র নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হতে পারে, আলবানিয়ার ইতিহাস তার মান্যতা দেয় না। দেশটি কোনও দিনই শিল্পে উন্নত ছিল না — কোনও শিল্প বিপ্লবের প্রচেষ্টার ইতিহাস নেই — রাষ্ট্র ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করার কোনও আন্দোলন সে দেশে হয়নি— সেখানে ৭০ শতাংশ মুসলমান, ২৫ শতাংশ খৃষ্টান। প্রাক্ কমিউনিস্ট কালে আলবানিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনের দুনিয়ায় এমন কোনও ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না যিনি ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিতকে ধাক্কা দিয়েছেন। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সুফল হিসাবে যে কটি দেশে সমাজবাদ এসেছিল বা কমিউনিস্টরা শাসন ক্ষমতায় এসেছিল, আলবানিয়া তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম, সব বিষয়ে পশ্চাদ্পদ দেশ।

ভারত (ক)

‘‘হেতুশাস্ত্র (লজিক) অবলম্বন করে কেউ যদি শ্রুতি স্মৃতি অবমাননা করে, তাহলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে দূর করে দেবেন। বেদ নিন্দুকরা নাস্তিক’’– (মনু সংহিতা — ২/১০)

‘‘হৈতুকাঃ নাস্তিকাঃ, নাস্তি পরলোকা, নাস্তি দত্তং হুতম স্থিত প্রজ্ঞার’’—(মেথাতিথি)— (অর্থ— হৈতুক বা হেতুবাদী মানেই নাস্তিক, তাদের স্থির বিশ্বাস যে পরলোক, দান, হোম অর্থহীন)।

প্রাচীন ভারতেই জিজ্ঞাসু আন্দোলনের জন্ম। চার্বাক-জাবালী-কেশকম্বলী নাস্তিক্য-সংশয়বাদের প্রথম যুগের পথচারী। ‘‘চার্বাক বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি’’—(সর্ব দর্শন সংগ্রহ, মাধাবাচার্য)। চার্বাক দর্শন (অন্য নামে লোকায়ত দর্শন) বিষয়ে আধুনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপধ্যায়, অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর অসংখ্য রচনা থেকে। প্রায় দুই শতাব্দী আগে অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন মুক্তমনা মানুষ তৈরির কাজে। তবুও অনাধুনিক সমস্ত ধরনের কুভাবনা আজ এ দেশ জুড়ে বিরাজমান। তা সে ক্ষুধার্ত আমলাশোল হোক বা তথ্যপ্রযুক্তি প্লাবিত শহর হোক। ভারতে না হয়েছে শিল্পবিপ্লব— না হয়েছে রেনেসাঁস। চিন্তার মুক্তি, লোকাচারের দাসত্বমোচন, ধূমায়িত আঁধারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের অভাবে ভারতবাসী বিস্মৃত হয়েছে তার পরম্পরা। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঘরানার বামপন্থীরাও দায় এড়াতে পারবেন না।

আলবানিয়া (খ)

১৯৪৪ সালে অক্টোবর মাসে বেরাট সম্মেলনে এনোভার হোজার নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ধর্মীয় আচার পালনের এবং না-পালনের অধিকারের দাবী করেন। ক্ষমতায় আসার দীর্ঘকাল পরেও এমন কোনও সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি যাতে জনসাধারণের মনন জগতে ঈশ্বর ভাবনা দূরীভূত হয়। এমন বহু আলবানিয়ান নাগরিককে পাওয়া যায় যাদের দুটি নাম-পরিচয়। মুসলমান পরিচয়ে তারা ট্যাক্স না দেওয়ার সুবিধা পান (যেহেতু তারা ধর্মীয় উৎসবের সময় ‘জাকাত্’-‘ফেতরা’ দান করেন)। অন্য পরিচয় ক্যাথলিক যার ফলে তারা সৈন্যবাহিনীতে যোগ না দেবার সুবিধা পান। ইউরোপীয় এক সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকারে এক মধ্যবয়স্ক কমিউনিস্ট নেতা বিনা দ্বিধায় জানান যে এনোভার হোজা একজন স্বর্গ থেকে প্রেরিত দেবদূত। ছয় এর দশকের মধ্যকাল হতে সাত এর দশকের মধ্যকাল পর্যন্ত আল্ব লবানিয়ার সরকারি উদ্যোগে নিরীশ্বরবাদ চর্চা এক অন্য চেহারা নিল। সমালোচকরা যাকে ‘‘কালাপাহাড়ি আচরণ’’ বলেন। অবশ্য এনোভার হোজার রচনাবলীতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহের প্রশ্নে সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়া আছে। ১৯৬৭ সালে আলবানিয়ায় সমস্ত ধরনের ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ হতে শুরু হল। ধর্মস্থানগুলি ভেঙে ফেলা হল বা বন্ধ করে দেওয়া হল। ১৯৭৬ সালে ধারা ৩৭ এবং ১৯৭৭ সালে ধারা ৫৫

মোতাবেক আলবানিয়া ধর্মরহিত বা নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হল। ধর্মীয় আচার পালনকারীদের ১০ বছর জেল এমনকি মৃত্যুদণ্ডও ঘোষিত হল। ১৯৮৪ সালে নরওয়ে সাংবাদিক পিটার প্রিফটি লিখেছেন যে পুলিশের নজর এড়িয়ে এককালে কমিউনিস্টরা যেমন মার্কসবাদের বই পড়তেন তেমনি আলবানিয়ার বেশিরভাগ মানুষই এনোভার হোজার শাসনকালে গোপনে কোরান ও বাইবেল পড়তেন। আলবানিয়ার নিরীশ্বরবাদ চর্চার ''উত্থান'' ও ''পতন'' বিষয়ে যা প্রবন্ধ পুস্তক পাওয়া যায় তা খৃস্টান বা ইসলামি দৃষ্টিকোণে রচিত। ব্যতিক্রম– নির্বাসিত আলবানিয়ান সাংবাদিক ক্যুটিন সেগু (যিনি আলবানিয়ার কমিউনিস্ট নেতা মহম্মদ সেগুর দত্তক পুত্র)। তিনি তাঁর ''রাইজ এন্ড ফল''– আলবানিয়ান সোসালিজম'' পুস্তকে লিখছেন, হোজা সারা পৃথিবীতে একজনকেই নেতা হিসাবে মানতেন— তিনি স্তালিন। চীন বিপ্লব প্রসঙ্গে স্তালিনের উপদেশ মাও সে তুং অমান্য করায় তিনি মাও-এর সমালোচনা শুরু করেন। ধর্মান্ধ বা ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং খৃস্টান অধ্যুষিত আলবানিয়াকে বিপ্লবের আগে ও পরে যে দীর্ঘ বৈচিত্রময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে সেকুলার রাষ্ট্র এবং পরবর্তীকালে নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হয় সেকথা হোজা এবং তার সাথীরা ভুলে গেলেন। স্তালিন আজারবাইজান-এর মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের দাবীপত্র অসাধারণ বিচক্ষণতার সাথে বাতিল করে দিয়েছিলেন তাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।'' ধর্মকে যারা জনগণের আফিম বলে কাজ শুরু করে মার্কসের উদ্ধৃতির আগের অংশ পরের অংশ উল্লেখ করেন না তাদের ক্যুটিন সেগু ''লজ্জাহীন বদমানুষ'' বলতে দ্বিধা করেন নি। আজ্ব জারবাইজানের ইমামদের সংগঠন স্তালিনের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবী (১৯২৬) করে যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে দারিদ্রের চাপ আগের তুলনায় কম হলেও সঞ্চয়ের সুযোগও তেমন নেই। আজারবাইজানের প্রায় দু-হাজার হজ যাত্রায় আগ্রহী তাদের পাথেয়র জন্য সরকারি অনুদান চান। স্তালিন বিশদ আলোচনায় নমনীয় ভাষায় (কুটিনের ভাষায়— অস্তালিনীয় কায়দায়) জানান (১) একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের পরিচালক সরকারের কোষাগার থেকে তীর্থযাত্রার জন্য অর্থ ব্যয় সম্ভব নয়। (২) ইসলামী আইন অনুসারে নিজ বা পরিবারের উপার্জিত অর্থ ব্যতিরেকে অন্যের অনুদানে হজ যাত্রায় পুণ্যফল পাওয়া যায় না।''

ভারত (খ)

ভারতে কমিউনিস্ট দলের যাত্রা শুরু ১৯২৫ সালে (মতান্তরে ১৯২১)। বর্তমানে মার্কসবাদের কথা বলা দলের নজরে পড়া সংখ্যা ২০। এদের বা এদের কোনও গণ সংগঠনের কর্মসূচীতে নিরীশ্বরবাদ তো দূরের কথা কুসংস্কার মুক্তির বিষয়ে বেশি কথা পাওয়া যাবে না। দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে নৈতিক অধঃপতন মানে আর্থিক দুর্নীতি, পুলিশের গুপ্তচর বা নারীঘটিত কেচ্ছা। এমনও একজনকে পাবেন না যিনি

''পৈতে'' পরার অভিযোগে সমালোচিত। নীচের তলায় তো ধর্মবিশ্বাসীদের দখল। কালীপুজোগুলো যদি কংগ্রেসিদের দখলে থাকে তবে দুর্গাপুজো বামপন্থী ইন্‌ডাসট্রি। রক্তপাতহীন বামপন্থী 'ক্যু' তে দমদমের ভীম বা সুজিতের পুজোকমিটি চলে যায় অন্যের দখলে। ভবানী সেন বহুকাল আগে লিখেছিলেন যে, শ্মশানের কাপালিক যদি সবসময় কারণসুধা পান করেন তবে তার চ্যালা একটু আধটু গঞ্জিকা সেবন করবে, তাতে আশ্চর্য কী? ফলে আমরা বিনা দ্বিধায় অভ্যস্ত হই এই দেখতে যে দেশের সবচেয়ে বড় বামপন্থী দলের সর্বোচ্চ নেতা মাথায় পাগড়ি পরে থাকেন। পলিটব্যুরো নেতার উদ্যোগে তার নাতির 'উপনয়ন' হয়। সাত এর দশককে যদি বিদ্রোহের দশক ধরা যায় তখন কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 'পৈতে' ত্যাগী ব্রাহ্মণকে, গোমাংসভোজী হিন্দুকে 'উগ্রপন্থী' বলা হত। যাদের বলা হত তারাও শ্লাঘা বোধ করতেন বোধহয়। বিবাহিত মহিলা শাখা সিঁদুর না পরলে তো কথাই নেই। যারা মূর্তি ভাঙার পক্ষে ছিলেন তারা এ কাজের জন্য গণ-সমালোচিত হলেও একটা সুফল পাওয়া গেছে— 'নবজাগরণে'র মহাপুরুষরা যে ত্রুটির উপরে নয়, সময়ের সীমাবদ্ধতায় বন্দী ছিলেন সে নিয়ে গবেষণা বিতর্ক আজও চলছে। মূল কথা অন্য-ইতিহাসজাত নেতার মূর্তি আক্রান্ত হল — খুচরো কনস্টেবল খুন হল— একটা পাড়ার রাস্তার শনি মন্দিরে ঢিলও পড়ল না। যে ঘরানার হোক না কেন ঈশ্বর বিশ্বাস— ধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় বামপন্থীরা চিরকালই অবামপন্থীদের মতোই সমঝোতাবাদী। কেউ কেউ চাপে পড়লে বলেন— আগে সমাজতন্ত্র আসুক তারপর ভাবা যাবে। অন্যজনেরা বলেন আমরা ডুডুও খাব তামাকুও খাব।

আলবানিয়া - ভারত (খ)

নিরীশ্বরবাদ চর্চায় আলবানিয়া এবং ভারতে প্রচেষ্টার তুলনা বাস্তব বোধহীনতার ফসল। কারণ সংক্ষেপে (১) আলবানিয়ার নিরীশ্বরবাদ চর্চাচর কোনও ইতিহাস ছিল না। কমিউনস্টরা শাসন ক্ষমতায় এসে আইন বলে উপর থেকে দেশটিকে পৃথিবীর একমাত্র আরোপিত নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। যে সাংস্কৃতিক বিষয়ের অবিচল প্রক্রিয়া এই কঠিন পথ পরিক্রমা সাফল্যে নিয়ে যায় — আলবানিয়ায় তা করা হয়নি। গণ বিচ্ছিন্ন অগ্রণীরা বীরের মর্যাদা পান— শহীদ হলে শ্রদ্ধা পান— ইতিহাস গড়ার নায়করা ব্যাপক মানুষের সহায়তায় চিলস্মণীয় হন। (২) ভারতে বস্তুবাদী দর্শন তথা নিরীশ্বরবাদ চিরকালই ব্রাত্যজনের ভাবনা। ক্ষমতার কেন্দ্র মূলস্রোত তাকে কোনদিন সহ্য করেনি। প্রান্তবাসীরা আপন খেয়ালে অসংগঠিত থেকেছেন। ভারতে নিরীশ্বরবাদীদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। প্রথমটি বিপজ্জনক— রাষ্ট্র এদের মান্যতা দেবে-পুরস্কৃত করবে-''কো-অপ্ট'' করবে— ফলে নষ্ট করবে। ২য় পথ কঠিন— কাঁটাভর্তি। কিন্তু যুদ্ধে জয় নিশ্চিত। পুরস্কার এক সুখী দুনিয়া— যেখানে

ভাসমান মাতৃভাষা

স্লাইড-১

বাগুইআটি বাজারে সন্ধ্যাবেলায় মহিলাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলাম। শরীরের রং যত সাদা হওয়া সম্ভব ততটাই। পরনের পোষাক দেখে বোঝার উপায় নেই যে উনি ভারতের কোন্ প্রান্তের বাসিন্দা বা আদৌ ভারতীয় কি না। বয়সে বিগত যৌবনাই বলা চলে। ঠোঁট রক্তিম মনে হচ্ছে। শাক সব্জির দোকানে ঘুরছেন। চাহনিতে তীক্ষণতার ছাপ। শারীরিক ভাষা বিস্ময়ের, নিজের অজান্তে ওনার থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে হেঁটে চলেছি তা নিজের খেয়াল নেই। উনি কোন্ ভাষায় দোকানীর সাথে কথা বলছেন তাই জানার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনও কারণ থাকার কথা নয়। শুনতে পাওয়া যায় এমন দূরত্ব বজায় রেখে বুঝলাম যে উনি দেখছেন মাত্র, কথা বলছেন না। টাটকা মাছের বাজার পার হয়ে উনি যখন শুঁটকি মাছের দোকান দুটির কাছে গেলেন আমি তখন লজ্জার মাথা খেয়ে মহিলার সাথে দূরত্ব কমালাম। শুঁটকি মাছের বিক্রেতা ও আমাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রমহিলার বিশুদ্ধ সিলেটি ভাষায় প্রশ্ন - সিদল মাইছ্ কথ্ কইর‍্যা ?

স্লাইড-২

অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক মিত্র তখন বাংলা ভাষা নিয়ে সভা, আলোচনা সভা চালাচ্ছেন। বিপদগ্রস্ত এক মহিলাকে নিয়ে অশোক মিত্র-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রমহিলার স্বামী সেনাবাহিনীর রাঁধুনীর কাজ করতেন। সেনাবাহিনী মহিলাকে জানিয়েছে যে মহিলার স্বামী সেনা বাহিনীর ছাউনি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। মহিলা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সেনাপ্রধানসহ বিভিন্ন ক্ষমতাবানদের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে কখনো হিন্দি, কখনো ইংরাজি ভাষায় ৩ বছর ধরে ওনার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে অশোক মিত্র তাঁর অপারগতা স্বীকার করলেন। শ্রী মিত্রকে প্রশ্ন করি যে কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দিতে চিঠি দেওয়ার কারণ বোঝা যায়। তবে আপনাদের সরকার ইংরাজিতে চিঠি লেখে কেন ? অশোক মিত্র-এর স্বগতোক্তি— সবাই সাহেব হয়ে গেছি।

মূলকথা

মাতৃভাষা বাংলা ভাষাভাষীর সাথে আবেগে জড়িয়ে আছে। বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ এর জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন। যদিও বেশ কিছু মুখ এখনো বলে— আমরা বাঙালি ওরা মুসলমান। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা অনুপাতে বাংলা ভাষাভাষীর স্থান ৫ম। ওপার বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য যতটা সরকারি বেসরকারি সক্রিয়তা দেখা যায় এপার বাংলা তেমনই উদাসীন। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ— স্লোগানটি যারা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখেছিল তারা সরকারি কাজে ইংরাজি ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করে না। বেশ কয়েকটি কমিশন বসার পরেও সরকারি বদান্যতায় বেসরকারি ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তামিলরা মাতৃ ভাষার প্রশ্নে যতটা দৃঢ়,বাঙালি (বাংলাদেশীরা বাদে) রা ততটা নয়। এখানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঠিক বা ভুল ইংরাজি বলতে পারলে সমাজে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায়ও যে বিজ্ঞান চর্চা করা যায় তা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু থেকে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ীর লিখিত মতামত পাওয়া যায়। তবে একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকারে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয় না, তেমনই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কয়েকটি ভাষাকে এবং ভাষাভাষীকে মাথা তুলতে দেয় না। এর মধ্যে, রাজবংশী, গোর্খালী, লেপচাই, সান্তালী, উর্দুভাষা যথোচিত সরকারি সহযোগিতা পাচ্ছে না। এর কারণ কউম-এর অধিকার বা পরিচয়ের বৈচিত্রকে ক্ষুন্নিততর করার চেষ্টা। সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নরওয়েতে ৩/৪টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা পায়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশভাষা ছাড়া অন্য যে কোনও ভাষায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পড়াশোনা চালানো যেত। আসলে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান যাদের মুখ থেকে নিয়মিত শুনতে হয় তাদের হাত থেকে মুক্ত হতে ভিন্ন পথ ধরতে হবে। সারা বছর ধরে অনেক দিবস পালিত হয় কিন্তু কঠিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল ৩টি দিন— মাতৃভাষা দিবস, মে-দিবস এবং নারী দিবস। ‘পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা’ দিবস শেষ পর্যন্ত ছুটির দিন হিসেবেই চালু থাকে। আসলে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ক্যালেন্ডার প্রয়োজন। মেঘনাদ সাহা এরকম একটি কাজ শুরু করেছিলেন। নেহেরু সরকারের অসহযোগিতায় সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যে ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয় তা গ্রীক ক্যালেন্ডারের অনুকরণে। জানুয়ারি থেকে জুন গ্রীক দেবদেবীর নাম। ১২ মাসে বছরের পরিবর্তে অতীতে ১০ মাসে বছর থাকাতে সেপ্টেম্বর (৭ম), অক্টোবর (৮ম), নভেম্বর (৯ম), ডিসেম্বর (১০ম) থাকা সত্ত্বেও জুলিয়াস সিজার নিজের নাম অক্ষয় রাখবার জন্য ৭ম মাসের নাম রাখলেন ‘জুলাই’, আর ভাইপো, পরবর্তী সম্রাট অগাস্টিন ৮ম মাসকে অগষ্ট নামে ‘চিহ্নিত’ করলেন। ধর্ম নিরপেক্ষ ক্যালেন্ডারের অপেক্ষায় থেকে স্থানীয় ক্যালেন্ডার চালু করা দরকার। ১লা বৈশাখ এতো কম গুরুত্ব পায় কেন? ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ১৩৫৮ সালের মাঘ মাসের কতো তারিখ ছিল তা কতজন জানে?

পুস্তক - পত্রিকা সমাচার

রামমনোহর লোহিয়া বহুদিন আগে লিখেছিলেন যে ভারতে রাজনৈতিক কাঠামোয় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তিনটি শর্তের অন্তত দুটি শর্ত পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। (১) ধনী পরিবারের সন্তান (২) ব্রিটিশ ধাঁচের শিক্ষায় শিক্ষিত (৩) উচ্চ-বর্ণ হিন্দু পরিবার জাত।

রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরে যে কোনও রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখলে লোহিয়াজীর বক্তব্যের যথার্থতা জানা যায়। শ্রী রণজিৎ গুহ জাতীয় পণ্ডিতদের সাব-অল্টার্ন স্টাডিসের বইপত্র পড়লে অবশ্য প্রান্তবাসী বেশকিছু গুণী মানুষের কথা পাওয়া যায়। অবশ্য তার অনেকটা শীল মাছ কিরকম মানুষের মতো নাচে (রাশিয়ান সার্কাস), দৃষ্টিহীনরা কিরকম অসাধারণ নাটক করে (অন্যদেশ)-এ জাতীয় মুলস্রোতের বাবু শ্রেণির এক ধরনের বিনোদন বা বিশ্ববিদ্যালয়-লাইব্রেরী-আর্কাইভ ঘোরা গবেষকদের গিনিপিগ বৃত্তান্ত। ব্যতিক্রম যে নেই তা তো নয়- নতুবা আমরা লালনের চর্চা এখনো করি কেন যিনি ব্রাত্যজনের দুনিয়ার মানুষ হয়েও বাঙালি মনে চিরস্থায়ী জায়গা দখল করে নিয়েছেন অথবা বর্তমান বাংলাদেশে আরজ আলী মাতুব্বর, স্বশিক্ষিত হেতুবাদী এই মানুষ আজও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-আধুনিক মানুষের কাছে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

মূল বিষয়ে আসা যাক। ভারতে বামপন্থী আন্দোলনে এমনকি নক্‌শালপন্থী আন্দোলনে যতই সর্বহারার নেতৃত্ব, দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকের রাজ, শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র বলা হোক না কেন, বাস্তবত প্রকৃতপক্ষে প্রান্তবাসী প্রতিনিধিত্ব, প্রচার বা সাংগঠনিক কাঠামোতে নেই। অশোক মিত্র লিখেছিলেন বটে যে নক্‌শালবাড়ি আন্দোলনে জঙ্গল সাওতাল বা আব্দুল হামিদ তথা খোকন মজুমদারের নামের চেয়ে চারু মজুমদার-সৌরেন বসুদের কথাই বেশি শোনা যায়। পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) খোকন মজুমদার তথা আব্দুল হামিদের নাম পাওয়া যায়। ৬৭ সালের নক্‌শালবাড়ি

আন্দোলনে নক্‌শালবাড়ি এলাকায় প্রথম সারির সংগঠকদের অন্যতম খোকন মজুমদার কমিউনিস্ট আন্দোলনে তার যোগদান এবং সারাজীবনের অভিজ্ঞতার সংকলন করেছেন এই বইটিতে। লালন বা আরজ আলী মাতুব্বরের মতোই লেখকের রচনায় কোন শহুরে 'পালিশ' নেই বইটিতে। অত্যন্ত অগোছালো অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদ সত্ত্বেও গত ৬ দশকের একটি মানুষের রাজনৈতিক পথ পরিক্রমা দেখা হবে এই বইটিতে। তার অনেক প্রাক্তন সহকর্মী এখনো সত্তর দশককে পণ্য করে বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন (সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামাফোন) নিশ্চিত করেছে– তখনও জীবনের সায়াহ্নে এসে খোকন মজুমদার তাঁর রচনায় জানাচ্ছেন আশার কথা, বইটি ঐতিহাসিক দলিল যা তাঁর গত ৬ দশকের অনেক সহকর্মীকে লজ্জায় ফেলবে, আবার নতুন প্রজন্মকে অনেক অজানা তথ্য পৌঁছে দেবে।

নক্‌শালবাড়ির রাজনীতি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে, থাকুক। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত পাঁচশোর বেশি বই লেখা হয়েছে। সম্ভবত এই বইটিই প্রথম প্রকাশনা যার লেখক অবসরপ্রাপ্ত-অবসাদগ্রস্ত-বিপ্লবী নন - গবেষক নন - তথাকথিত শিক্ষিত নন।লেখক এখনো আমাদের সমাজের বাতিল জনগণের সাথে দিন কাটান। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও জানাই যে, মুক্তাঙ্গনে-হেতুবাদী আয়োজিত নিরীশ্বরবাদী সম্মেলনে খোকন মজুমদার বক্তব্য রেখেছিলেন— ''আমি লেখাপড়া শিখিনি, গরীব চাষীর ঘরে জন্মেছি, বিড়ি বেঁধে- ইঁট বয়ে কৈশোর কাটিয়েছি। ঘটনাাচক্রে জন্মেছি মুসলমান পরিবারে। সারা জীবনের অনাহার-অসুখ-ফেরারী জীবন- জেল জীবন-প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি— তবুও কখনো ঈশ্বরকে ডাকার বা খোঁজার দরকার পড়ে নি— সাধারণ গরীব মানুষ সাথে থাকলে ঈশ্বরের প্রয়োজন পড়ে না।

ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ - লেখক— খোকন মজুমদার
প্রকাশক-নারায়ণ চন্দ্র রায়/নর্মদা বাগান, চাম্পাসারি, শিলিগুড়ি-৩
মূল্যঃ ৫০ টাকা

—হেতুবাদী

জাত-শ্রেণি সম্পর্ক

ভারতের অর্থশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা আর্থিক অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। যদিও তাঁরা কমিউনিস্ট বা সমাজবাদীদের মতো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বুর্জোযা, সর্বহারা, পাতি বুর্জোযা, শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি শব্দগুলি ব্যবহার করেন না। তাতে অবশ্য ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রটির কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান চর্চাকারীদের সমস্যা হল যে এঁদের অনেকেই ভারতে যে জাত ভিত্তিক বিভেদ ভযাবহ ভাবেই বিদ্যমান, তা স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। কেউ কেউ অবশ্য জাতভেদ ব্যবস্থাকে সমাজের উপরিকাঠামো হিসাবে দেখতে চান যার সাথে নাকি সমাজকাঠামো অর্থব্যবস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে এঁদের কাছে জাতভেদ যতটা চিন্তন জগতে বিদ্যমান ততটা অর্থকাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতভেদ ব্যবস্থা হিন্দু বাঙলিকে স্পর্শ করে না- এ জাতীয় ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের প্রাথমিক অজ্ঞতা কাটানোর জন্য যে কোনও দৈনিক পত্রিকার ‘পাত্রী চাই পাত্র চাই’ বিজ্ঞাপনের বিশাল ক্রোড়পত্র দেখার অনুরোধ জানাই। ডাফোড্যাম কোলকাতার ফুটপাথ বাসিন্দাদের উপর একটি তথ্য অনুসন্ধান চালায় যা সি.এম.ডি.এ কর্তৃপক্ষ তাদের বুলেটিনে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ছাপায। এ সমীক্ষায় দশ হাজার ফুটপাথ বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র একজন ব্রাহ্মণকে পাওয়া যায় যিনি (মনিমোহন চক্রবর্তী) মানসিক ভারসাম্যহীন অথচ টালিগঞ্জ অঞ্চলের একটি দ্বিতল বাড়ির মালিক। ফুটপাথের বাকি বাসিন্দারাই এস.সি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত যারা গ্রাম বাংলার ভূমিহীন কৃষক পরিবারজাত।

ডাফোড্যাম কলকাতার শিশু শ্রমিকদের নিয়ে এক সমীক্ষা চালায। এই শিশু শ্রমিকরা চাযের দোকান, মোটর গ্যারেজ, রুটি-বিস্কুটের কারখানা, ‘ভাতের হোটেল’-এর দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিমযে। এরা এস.সি, ও.বি.সি, মুসলমান পরিবার থেকে এসেছে। উন্নয়ন নামে একটি ফান্ডেড এন.জি.ও ১৯৯৯ সালের মে মাসে তাদের মুখপত্রে প্রকাশ করে, যদিও ডাফোড্যাম-এর নাম জানানোর সৌজন্য তারা দেখায় নি।

শিবপুর, হাওড়া থেকে প্রকাশিত নব উদ্যোগ পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি - ২০০৫)

বিল্বদল মুখোপাধ্যায় কলকাতা ভিখারিদের বিষয়ে একটি সমীক্ষাভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির শেষাংশে (৩৫ পৃঃ) শ্রীমুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণ ভিখুকরা অন্য ভিক্ষুকদের তুলনায় দ্বিগুণ বা তার বেশি উপার্জন করে।

সর্বশিক্ষা অভিয়ান-এর মে ২০১১-এর রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাস এডুকেশন বিভাগ জানাচ্ছে যে বিদ্যালয়ছুট ছাত্রদের প্রায় সবাই দলিত, আদিবাসী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত।

দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভার বি.পি.এল কার্ড-এর মালিক ৩০০০ জনের মধ্যে ৩২টি পরিবার বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সমীক্ষা দেশকাল পত্রিকার জুন - ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

আর.টি.আই কর্মীদের অনুসন্ধানে কলকাতার বাসিন্দা ধনী আয়কর দাতাদের নামের তালিকা থেকে জানা যায় যে আয়কর দান-এর অনুসারে ১০৪তম ব্যক্তি একজন মুসলমান এবং ১২২তম ব্যক্তি একজন দলিত। প্রথম ১০৩জন বর্ণহিন্দু। এরপরও বাঙালি ‘ভদ্রলোক’-দের প্রাযশই উক্তি ঃ পশ্চিমবঙ্গে জাতভিত্তিক আর্থিক শোষণ নেই। এইসব ভ্রান্ত ধারণার ৩টি বড় কারণ ধরা পড়ে -

১) বাংলার নবজাগরণের অতিকথন

২) ভেজাল কমিউনিস্টদের আধিপত্য

৩) অব্রাহ্মণ আন্দোলনের দুর্বলতা।

১) বাংলার নবজাগরণের অতিকথনঃ

এটা সত্য যে বাংলার ‘নবজাগরণ’-এর প্রবক্তাগণ কোনও অসাধু উদ্দেশ্যে ওই কাজে হাত দিয়েছিলেন- বিষযটি এরকম মোটেই নয়। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ তাঁর ‘বাংলার নবজাগৃতি’-তে লিখেছেন (অধ্যায়-বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা) ‘‘...ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মডেলটি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের দেশে যাঁরা প্রয়োগ করতে অত্যুৎসাহী হয়েছেন তাঁরা একজাতের অভিজাত কলেজে হয়তো শিক্ষালাভ করেছেন (যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজ)। পরীক্ষার প্রতিয়োগীতায় অন্য সকলকে টপকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন’’। ‘ভদ্দরলোক’ বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রুপ করে তিনি লিখেছেন - ‘পুঁথি পুস্তকগত বাস্তবতার সঙ্গে প্রকৃত সামাজিক জীবনের বাস্তবতার পার্থক্য দেখে আমরা পদে পদে অবাক হয়ে যাই। তথাপি পুঁথিগত বাস্তবতার লেজ ধরে, গরুর লেজ ধরে অন্ধের নগর দেখার মতো, আমরা এগিয়ে চলি। যদিও সামাজিক পরিবর্তন-বিবর্তন-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি কিন্তু প্রকৃত জীবন সত্য ও সমাজ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাই। আমরা চোখ মেলে দেখি না, মন খুলে চাই না যে সামাজিক চিন্তাভাবনা, সামাজিক ব্যবহার, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম - সবকিছুরই বিভিন্ন স্তর আছে, বিভিন্ন গড়ন আছে এবং অনেক সময় এক

একটি স্তরে, একই গড়নের চৌহদ্দির মধ্যে এগুলি বেশ স্থায়ীভাবে বিরাজ করে। পরিবর্তন-এর কোনও ঢেউ-এর আঘাতে বিচলিত হয় না। যেমন আমাদের দেশে জাতি বর্ণ ভেদ ব্যবস্থা। শত শত শতাধীর নির্মম কশাঘাত সহ্য করে, শত সহস্র রাষ্ট্রনায়কদের জাতি সাম্যের বাণী বিধিনিষেধের আইনকানুন আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করে, আজও যখন দেখা যায় যে জাতভেদ ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে সবচেয়ে মজবুত ভিত হয়ে প্রায় অটুট রয়েছে অথচ অর্থনীতি-টেকনোলজির অগ্রগতি-উন্নতি অনস্বীকার্য। তখন ভাবতে হয় যে এই ব্যবস্থাটি কী এবং তার অন্তর্নিহিত কোন জাদু বলে এই অমর অক্ষয় রূপ আজও প্রকট"।

অধ্যায়-এর শেষ পর্বে বিনয় ঘোষ লিখছেন- "আমাদের দেশের বৃহত্তম জনশ্রেণী কৃষকরা শূদ্র বর্ণভুক্ত হবার ফলে যে রাজনৈতিক ট্রাজেডি ঘটেছে তার আরও শোচনীয়। চিনের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি সহজেই গ্রামভিত্তিক ও কৃষক নির্ভর করতে পেরেছে, যা ভারতের রাজনীতিতে কদাচ হয়েছে। ... বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণটি একটি অতিকথন। এ কঠিন সত্য বাস্তব ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে"।

বিনয় ঘোষ যখন দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন - "... তবে জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি নবজাগৃতি কেন্দ্র হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য জ্যোতির কনক পদ্মের মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও ১৫০ বছর পরেও কেন অমাবস্যার চেয়ে অন্ধকার?" মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলের নেতা সরোজ দত্ত অবশ্য এত তত্ত্ব কথায় যাননি। ১৯৭১ সালের ৭-৮ই আগস্ট কলকাতা ময়দানে পুলিশের হাতে নিহত হবার আগে পর্যন্ত শশাঙ্ক ছদ্ম নামে 'মূর্তি ভাঙার সমর্থনে' গোপন ইস্তাহারে ছোট প্রবন্ধ লিখে গেছেন। ফল হয়েছে নানা ধরনের-

(ক) 'মাথাগরম কিছু ছেলে ছোকড়া' - কলকাতা শহরে (মফস্বলে কম, অন্য রাজ্যে মোটেই নয়) মূর্তিভাঙা শুরু করল এবং গণবিচ্ছিন্ন হল।

(খ) একই সাথে মূর্তিভাঙা এবং 'নবজাগরণ'-এর সমালোচক গোষ্ঠী তৈরি হল যাঁরা মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসারে ভারতের ইতিহাস চর্চায় অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের নেতাদের কর্মজীবন সম্পর্কে পুনঃপাঠের কাজ শুরু করল।

২। ভেজাল কমিউনিস্টদের আধিপত্য ঃ

ভারত তথা বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে দুর্বল হলেও একটি ধারা প্রবাহিত ছিল। যে ধারা বর্ণভেদ ব্যবস্থার বিরোধী। মহারাষ্ট্রে যেমন কমিউনিস্টরা কিছুদিন আম্বেদকর-এর সাথে যৌথ আন্দোলন করেছিলেন বা দক্ষিণ ভারতের প্রথম

যুগের কমিউনিস্ট সিরিংগাভেল্লু চেট্টিয়ার (১৮৬৩-১৯৪৬) রামস্বামী পেরিয়ারের সাথে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রাম করেছিলেন, অবিভক্ত বাংলা বা দেশভাগ-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ভেজাল কমিউনিস্টদের আধিপত্য থাকায় আম্বেদকর-এর জাত বিনাশ আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট সোস্যালিস্টদের শ্রেণি বিনাশের সংগ্রাম হাত ধরাধরি করে চলতে পারেনি। দেশভাগের পর কিছুদিন কমিউস্টি পার্টি বেআইনি ছিল। আইনী হবার পর পশ্চিমবঙ্গের নীতি নির্ধারক রাজ্য কমিটির সদস্যদের অধিকাংশই 'ভদ্ৰ দ্দরলোক' বাবুদের সন্তান। ব্যতিক্রম যে একদম ছিল না তা নয় কিন্তু তাঁরা অল্পসংখ্যক এবং প্রায় সময় নির্বাক। অবশ্য তেভাগা বা নকশাল বাড়ি আন্দোলনের সময়ে যে নামগুলি প্রচারে চলে এসেছিল (প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে বা শহিদদে তালিকায) সে নামগুলি প্রান্তজনের। 'ভদ্দরলোক' নেতারা সমাজ পরিবর্তনের কমসূচিকে কুলুংগিতে তুলে দিয়ে বিধানসভা লোকসভার সংখ্যার 'সাপ লুডু খেলায়' ব্যস্ত থাকলেন। জাতভেদ ব্যবস্থা, বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং পুরুষতান্ত্রিকতাকে নিয়ত বিরোধ না করলে এক অদৃশ্য ব্যাপক রক্তক্ষরণ হয় তা নেতারা মাথায় আনেননি। ফল হোল মারাত্মক। ভোট রাজনীতিতে ব্যর্থতা ও গণভিত্তিকে ক্ষয়।

জাতভেদ ব্যবস্থাকে নজরে আনার চেষ্টা একদম ছিলনা তা নয়। শিবরাম চক্রবর্তী নিশ্চযই এমন সব মানুষের সাহচর্যে ছিলেন যাদের উৎসাহে তিনি মস্কো বনাম পন্ডিচেরি (১৯৩৩) বইটিতে ব্রাহ্মণদের নরখাদক বাঘের সাথে তুলনা করেছিলেন। দামোদরণ কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকায় (জানুয়ারি ১৯৬০- নিউজ) জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অন্দ্রের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ডি.ভি. রাও (পরবর্তীকালে নকশালবাদী) ফরওয়ার্ড নামক পত্রিকার (বিশেষ সংখ্যা ১৯৮২) প্রবন্ধে জাত ব্যবস্থা উচ্ছেদের আহ্বান জানান।

কমিউস্টি ঘরানায় লালিত ডি.ভি. কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুকুমারী ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য একমুহূর্তের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদকে রেহাই দেননি। তবুও এত প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে কেন? বিপ্লব তো দূরের কথা, সামান্যতম গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশ চাওয়ার জন্য যখন দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং মহিলারা ব্যাকুল তখন সরকারি মার্কসবাদীরা (কৃতজ্ঞতা - ডি.ডি. কোসম্বী) সরকারি ক্ষমতার জন্য যে কোনও ধরনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ আনন্দ হাইত (দলিত), নুরুল ইসলাম (মুসলমান)-দের রক্ত বেচে যারা ১৯৬৭ সালে মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেযেছিল তারা জাত বা শ্রেণির সমস্যা তো বুঝবেই না বরং যতদিন পারবে স্থিতাবস্থার ওকালতি করে যাবে।

সাব অলটার্ন স্টাডির নামে আর এক দল উপদ্রবকারী ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। অধ্যাপক রনজিত গুহ-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁর অনুগামী নামে পরিচিত গাযত্রী চক্রবর্তী স্টিভাক, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায, সুদীপ্ত কবিরাজ

প্রমুখের অপকর্ম রণজিত গুহ-এর দুর্নামের কারণ ঘটাচ্ছে। পরিচয়ের সংকট যখন পরিচয়ের রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয় এবং তা পরিচয়ের ঔদ্ধত্যকে লালন করে তখন যে কোনও গণতন্ত্রপ্রিয় সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মীর দায়িত্ব এই যে পরিচয়ের সংকটের উৎস সন্ধান করে তার প্রতিষেধক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়া। সিধু, কানহু, বিরশা মুন্ডা, তিতুমীরদের সাব অলটার্ন বলা যাবে কি যাবে না সে বিতর্ক থাকলেও তাঁরা তো মঙ্গল গ্রহর বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁরা এই সমাজের দ্রোহী নেতা। তাঁদের পথ ধরে বস্তারের আদিবাসী যুবক যুবতী রক্ত ঝড়াচ্ছে স্বাধীন ভারত তৈরি করার স্বপ্নে। তাঁদের সংগ্রাম পদ্ধতির সাথে সবিনয় দ্বিমত পোষণ করা যায়, সংগ্রামী জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তাঁদের শ্রেণি-জাত বহির্ভূত কোনও আলাদা পরিচয় দাগার দরকার নেই। উত্তর আধুনিকতাবাদী, উত্তর গঠনবাদী, উত্তর ঔপনিবেশকতাবাদীদের কাছে অনুরোধ আপনারা উড়োজাহাজ থেকে বন্যা দেখার অভ্যেসটা আপাতত বন্ধ রাখুন।

৩। অব্রাহ্মণ আন্দোলনের দুর্বলতা

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বেশ কযেকজন আঞ্চলিক পর্যায়ের দলিত আন্দোলনের নেতা ছিলেন। সদ্যপ্রাপ্ত 'স্বাধীনতা'র স্বপ্নভঙ্গ হতে তখনও বেশ দেরি। গান্ধীর 'স্বরাজ' না আম্বেদকর-এর 'সুরাজ' এসেছে কিনা এ নিয়ে অনেকেই সংশয়ে ছিলেন। অবদমিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও যেসব নেতারা ছিলেন তাঁরাও ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যত সময় দলিত উদ্বাস্তু আন্দোলনে সময় দিতে পেরেছিলেন তার থেকে তাঁকে সময় ব্যয় করতে হয়েছে তাঁর প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া 'বিশ্বাসঘাতক যোগেন আলি মোল্লা' তকমাটি কাটাতে। জনসংঘী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি থেকে শুরু করে যোগেনবাবুর প্রাক্তন সহকর্মী অপূর্বলাল মজুমদার এই কুকর্মের জন্য দায়ী।

আম্বেদকর-এর 'দেবত্ব' বা মহত্বর প্রভাব তখন তেমনভাবে ভারতের এই প্রান্তে পৌঁছোয়নি। বিস্ময়ের খবর এই যে বাংলা ভাষায় প্রথম আম্বেদকর-এর একটি ছোট জীবনী ছাপা হয় ১৯৬৫ সালে। লেখক প্রয়াত গুণধর বর্মন। নমো সম্প্রদাযের মধ্যে যে সংগ্রামমুখী চেতনা তৈরি হযেছিল হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের কল্যাণে গুরুচাঁদের পৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর-এর কংগ্রেসে যোগদান অবৈদিক অব্রাহ্মণ আন্দোলনে এক বড় ধাক্কা। হরিচাঁদের ধর্মসংস্কারে বস্তুবাদের প্রভাব, গুরুচাঁদের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন বিফল হতে চলেছে ভাববাদের পচা পাঁকে ডুবে। পি.আর. ঠাকুরের বংশধররাও হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের নাম ভাঙিয়ে বিপুল আত্ম্ব য় করছেন, দলিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দাসত্ব করছেন, সমগ্র মতুয়া সমাজকে আন্দোলনবিমুখ করে তুলছেন। তবুও আশার কথা এই যে জাতভেদ ব্যবস্থা, বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধী একদল মুক্তমন যুব প্রজন্মের দেখা পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা মনে করেন আম্বেদকর-এর স্বপ্ন জাত বিনাশ এবং কমিউনিস্ট ইস্তাহারের শ্রেণি-বিনাশ এর মধ্যে কোন চিনের প্রাচীর তৈরি করা নেই।

সংকটগ্রস্ত ধর্ম অথবা/এবং বিপন্ন প্রান্তবাসী কৌম

বেশিরভাগ মানুষের শরীরের বাম হাত-বাম পা, ডান হাত-ডান পা-এর তুলনায় দুর্বল হয়। চিকিৎসকের মতে এটা নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক কোষের প্রভাব। কোনও বুদ্ধিমান নিশ্চযই এ-কারণে দুর্বলতর অংশকে বাতিল অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দেবেন না। এতো চুল-দাড়ি নয় যে ছেঁটে কেটে দিলে আবার গজাবে। বহু কাজেই দুজোড়া হাত-পা ব্যবহার করতে হয়। আমাদের সমাজ কাঠামোয় এভাবেই বহুজনকে দুর্বল, অপ্রয়োজনীয় এবং কার্যতঃ বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। মনুসংহিতায় শূদ্র ও নারীর অধিকার খন্ডনের নির্দেশ আছে। শূদ্র ও নারীর চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা উঠলেই আধুনিক মনুবাদীরা (যাদের মধ্যে অনেকে প্রগতিশীল, সমাজবাদী, মার্কসবাদীও আছেন) 'গেল গেল' রব তোলেন। কেউ মেধার কথা তোলেন, কেউ বা শ্রেণিসংগ্রাম ব্যাহত হবার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা আরবদেশ থেকে আসেনি। এটা অনেকেই জানেন যে এ প্রান্তের নিম্নবর্গীয় সমাজের একাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে ধর্ম পরিবর্তনের পথ বেছে নেয়। ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমানরা দুধ-ঘি-এর বন্যায় ভেসে গেছেন এমন নয়। উপরন্তু গোঁড়া হিন্দুদের কাছে তারা 'ঘর-গেরস্তালির কাজ ছেড়ে অন্য বাড়িতে কাজ নেওয়া দাসী'র মতই না পসন্দের। মাঝেমধ্যেই দাঙ্গার মাধ্যমে রাষ্ট্র জানান দেয় যে এদেশে তাদের বেঁচে থাকাটাই উপরি পাওনা। চাকরি, শিক্ষা, সর্বোপরি মর্যাদা থেকে দূরে রেখে শূদ্র ও নারীদের মতোই তাদের বাতিল-অপ্রয়োজনীয়-অক্ষম সাব্যস্ত করা হয়। পেশায় পুলিশ অথচ কবি, সংগীতরসিক আয়ান রসিদ খান *সেভেন্থ ম্যান* নামক একটি তথ্যচিত্রে ৭ জন কলকাতাবাসীর ১ জন মুসলমানদের পেশা, আর্থিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। নন্দন-অঞ্জ্যাকাডেমি, কবিতা, নাটক, ফিল্ম-উৎসব, লিটলম্যাগ, কফিহাউস প্রভাবিত বিদ্বজ্জন ঐ তথ্যচিত্রটিকে গুরুত্ব দেননি। সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরও এঁদের বিশেষ হেলদোল নেই। অথচ ঐ রিপোর্ট জানাচ্ছে, যেসব রাজ্যে অধিকসংখ্যক মুসলমান বাস করে তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং আসামে মুসলমানদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এমতাবস্থায়, মুসলমানদের সংরক্ষণ বা অন্যান্য সংস্কার, উন্নয়ন বা সুযোগ সুবিধার সুপারিশ এলেই আধুনিক মনুবাদীরা 'প্যান্ ইসলামিজ্ম'-এর গন্ধ পান।

প্রান্তবাসী সমাজ নিয়ে যারা (উত্তর আধুনিকবাদীরা এবং / অথবা এন.জি.ও) 'করে কম্মে খাচ্ছে' তাদের ভূমিকাও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।

দাঙ্গা হল সাম্প্রদায়িকতার একটি সহজবোধ্য বহিঃপ্রকাশ, যা নেহাতই আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন। একধরনের রক্তপাতহীন সাম্প্রদায়িকতা সততই বিদ্যমান, যা আমাদের দেশবাসীর এক বিপুলাংশকে মূলস্রোত থেকে প্রতিদিন সরিয়ে দিচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির চর্চার প্রয়োজন আছে। সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের বৃহদংশ যখন 'বৈষ্ণব ধর্মে' দীক্ষিত হয়েছে (কাউটস্কি-ক্রুশ্চভ দীর্ঘজীবি হোক), বিশ্বায়নের মৌতাতে বিভোর হয়ে বিশ্ববিক্ষার অভিমুখ বদলে ফেলেছে তখন এটা ভাবার কারণ নেই যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ তার অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করবে বা স্থায়ী-অস্থায়ী শত্রুশিবিরের সন্ধান করবে না। গত ২/৩ দশকে বিশেষতঃ ইরাক, আফগানিস্তান যুদ্ধ বা ১৯১১-র পর মার্কিন শাসকদের নিদ্রাহীনতার কারণ ঘটিয়েছে তথাকথিত মুসলিম দুনিয়া। হাল্কাভাবে বলা যায় যে আরবি নামধারী মাত্রই এখন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত প্রচারে সন্ত্রাসবাদী। উদাহরণ - তারিক আজিজ (সাদ্দাম মন্ত্রিসভার সদস্য, জন্মসূত্রে বিশ্বাসে খৃষ্টান), জিদান (ফ্রান্সের ফুটবলার-মুসলিম ধর্মীয় আচরণরহিত), চিত্রাভিনেতা আমির খান (হিথরো বিমানবন্দরে ৬ ঘণ্টা আটকে রাখা হযেছিল), অভিনেতা কামাল হাসান (সাতকূলে কেউই মুসলমান নয় -পরিবর্তিত ফিল্মিনাম)। নিম্নবিত্ত মুসলমান মাত্রই যেন জন্ম অপরাধী। বাঙ্গালোরে চিকিৎসক হানিফ বা কাশিপুরের শ্রমিক আঞ্জু নসারিই হোক, অভিযোগ ওঠে লাদেনের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। যদিও এই মুসলিম দুনিয়ার এক সামান্য অংশই মুতাজ্জেলা ভাবনার (আরব দুনিয়ার জিজ্ঞাসু চিন্তা-৮০০ খ্রীঃ) মুক্ত চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। অধিকাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দেশিত হচ্ছে এক গোলমেলে ধর্মান্ধশক্তির দ্বারা, যাদের নীতিনির্ধারণ বা পরিবর্তনের পেছনে কোনও আদর্শবোধ-যুক্তিবোধ কাজ করে না। ৮০০ খৃষ্টাব্দে আরব দুনিয়ায় বিজ্ঞান চর্চার এক প্লাবন বয়ে গিয়েছিল যা পরিবর্তিত হয় ইসলামের স্বর্ণযুগ বা মুতাজ্জেলা আন্দোলন নামে। নব্য মুতাজ্জেলাবাদীদের সংগঠিত উত্তরসূরিরা এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ২০০৭-এর জুলাই মাসে এদের সম্মেলন হয় ইস্তাম্বুল এবং জাকার্তায়। কামাল পাশার অনুগামীরা সারা পৃথিবীতেই সংগঠিত হবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

সার্কাসে গ্লোবের মধ্যে দুরন্ত গতিতে মোটর সাইকেল চালানোর খেলা যখন চালু হল তখন এক 'ওস্তাদ' চালক, হরিমাধবন হিন্দু পত্রিকার সাক্ষাৎকারে জানান যে মাইনে নয়, অ্যাড্ভেঞ্চার নয়, খেলার শেষে সমস্ত দর্শককে নির্ভেজাল আনন্দ দেওয়াই তাঁর কাজ। কারও ক্ষতি করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। কারও কারও কথা বলা যায় যাদের প্রায় প্রতিদিনের আচরণ সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

তার আগে একটি সোজা অংক কষে ফেলা যাক -

যশলোভ + বিতর্ক প্রেম + কাণ্ডজ্ঞানহীনতা + অপশক্তির প্রশ্রয় = ফেম্ কোহলিজ্ম্।

সংক্রামক ফেম কোহলজি্ম -এর শিকার একজনের নাম হতে পারে ইদ্রিশ আলি। ১৯৮৯ সালের গতি পত্রিকার (পরে নাম বদলে নতুন গতি) ঈদ্ সংখ্যার ইদ্রিশের নাম প্রথম ছাপা হয়। পত্রিকা আয়োজিত এক চড়ুইভাতিতে ইদ্রিশ তরল রঙ্গরস পরিবেশন করছিলেন - সেই বৃত্তান্ত। ইদ্রিশের 'নেশার হাতেখড়ি' সেই সময়েই। এরপর যত দিন যায় ইদ্রিশের একমাত্র কর্ম প্রচার মাধ্যমের আলোকে আলোকিত হবার নির্লজ্জ ক্লান্তিহীন প্রয়াস। বৈদ্যুতিন মাধ্যম চালু হবার পর তার সফলতা কেবলমাত্র মূল সাক্ষাৎকার দাতার (মাধ্যমের ভাষায় যার 'বাইট' নেওয়া হয়) পাশে নীরব অবস্থান। এক অদ্ভুত কুরুচিকর আত্মমৈথুন বিলাস।

যে ইদ্রিশ, সংবাদপত্রের কর্মীদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল নভেম্বর' ০৭-এর একদিনের ঘটনায় সে হয়ে উঠল মাধ্যমের কাছে 'মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান'। তার সর্বভারতীয় সংখ্যালঘুদের সংগঠনে না আছে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ বা অন্যান্যদের উপস্থিতি, না আছে রাজ্য বা দেশের অন্যস্থানের প্রতিনিধিত্ব। গল্পে আছে যে হনুমান নিজের ল্যাজের আগুন নেভাতে না পেরে এত দৌড়ঝাঁপ করেছিল যার ফলে লঙ্কার রাজপ্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হয়। যশলোভী কান্ডজ্ঞানহীন ইদ্রিশের সূচনায় একটি কু-নাটক আমাদের দুনিয়ার সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিল আয়ান রসিদ খানের সেভেন্থ্ ম্যানদের। সাচার কমিটি যা পারেনি, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের চ্যানেলে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোসাল স্টাডিজের অধিকর্তা সুগত মার্জিতকে বলতে হয় যে তারা ডাইভারসিটি অ্যান্ডেক্স প্রোজেক্টে সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে কাজ করবেন এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবেন। পার্কসার্কাস ময়দানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হয় যে এটা লজ্জার কথা যে সরকারি চারকিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব কম।

ফেম্ কোহলিজ্ম্-এর আর এক শিকার কি তসলিমা নাসরিন? তাঁর বিষয়ে আসার আগে বরং পেন্টিং-এর বাজার দর (নাগপালের হিসাব অনুয়াযী) জানা যাক। বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ পাইনের চিত্রকলার বাজারদর বেশ চড়া। সরস্বতী ও মাধুরি দীক্ষিতকে বিবসনা করেবাজারে পিছিয়ে পড়া মকবুল ফিদা হুসেন গৃহে স্বচ্ছন্দ্য এবং গৃহের বাইরে পরিচিতি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হলেন। বিতর্ক এবং বাণিজ্য যদি হাত ধরাধরি করে সমান গতিতে এগোয় তবে য়েকোনও সৃজনশীল কাজের মান হ্রাস পেতে বাধ্য। তসলিমা ও রোগের শিকার হতে তো সর্বনাশ। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যম যখন একটি নিরীহ ও শক্তিশালী অস্ত্র - কলম, এবং তিনি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক বলেই সমাজ পরিচিত। ইদ্রিশের ক্ষেত্রে অবশ্য সে ভয় নেই। কোনও মতবাদ বা দর্শনবোধ তাঁর আছে বলে বোঝা যায় না।

দুই বাংলার নারীবাদ বা নাস্তিক্যবাদের চর্চা বহুদিন চলছে। আরজ আলি মাতুব্বর প্রশ্ন তোলেনঃ- সৃষ্টিকর্তা যদি সবই সৃষ্টি করিয়াছেন তবে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করিল কে? হুমায়ুন আজাদের 'নারী' পাঠ করলে জানা যায় ও প্রান্তে নারী অধিকার আন্দোলন কতটা মজবুত। লেনিন-এর নারী-পুরুষ সম্পর্ক (গ্লাস ও জল - উল্লেখ্য) বিষয়ে আহমেদ শরিফ, বদরুদ্দিন ওমরের রচনাও উল্লেখযোগ্য। ঢাকার মুক্তমন গোষ্ঠী এবং অন্য অনেক প্রকাশনা সংস্থার কাজ ও প্রান্তের ধর্মান্ধতা বিরোধী সংগ্রামের সজীবতার পরিচায়ক। মানগত দুর্বলতার কারণে বাজার সংকুচিত হবার আশঙ্কা থেকেই অনেক লেখক বিতর্ক নামক অক্সিজেন সিলিন্ডার সাথে নিয়ে চলমান। আমিই যুক্তিবাদের প্রথম ও শেষ কথা বলার হক্‌দার - এরকম নির্বোধ দাবিদার কলকাতাতেই আছে।

মাঝেমধ্যেই এদের অবশ্য বিপদে পড়তে হয়। গল্পের হনুমানের যেমন ল্যাজের আগুনে মুখ পুড়ে যায় বা সার্কাসের খেলুড়ের হাত-পা ভাঙে।

মিনা আহাদী এবং মরিয়ম নমাজি নামে দুই ইরানি (বর্তমানে পেশার টানে জর্মনবাসী) ইউরোপের প্রগতি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। সব ধরনের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জেহাদ তাঁদের রচনায় -আলোচনা সভায় -মিছিলে। ইসলামে (অন্ন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেও) নারীর অবস্থান নিয়েও তাঁরা সরব প্রতিবাদী। মুসলিম প্রধান দেশগুলির উপর মার্কিনী হামলা-হুমকির বিরুদ্ধে তাঁদের নিরলস কর্মসূচি প্রশংসার দাবি রাখে। বুশ-শাসনে সারা দুনিয়া জুড়ে 'ইসলামোফোবিয়া' প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাঁরা নিজেদের ধর্মরহিত অবস্থানকে দৃঢ় রেখেছেন। গড়ে তুলেছেন সংগঠন যার নাম সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ এক্স মুসলিম্‌স। এঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে ইউরোপের সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল হচ্ছেন। যে কোনও প্রতিবাদ, বিরোধিতা বা আন্দোলন যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দর্শনহীন হয় তাহলে তা সাধারণের কোনও কাজে আসে না। বরং কখনো কখনো তা উল্টো ফল দেয়।

হাওড়া স্টেশনের ঝোলানো সাইনবোর্ডের বিজ্ঞাপনের ধাঁধার প্রসঙ্গে আসা যাক। সাইনবোর্ড লেখা আছে - তের কাপ নুন। আসলে ওটাঃ- তাঁতের কাপড় কিনুন-এর বিজ্ঞাপন। নিম্নরেখ বর্ণগুলি সময়ের ডাকে অদৃশ্য হয়েই বিপত্তি। বিশ্ব পরিচিত দার্শনিকের উদ্ধৃতি (ধর্ম জনগণের আফিম) নিয়ে ধার্মিক এবং না-ধার্মিক মহলে চটকানি কম হয় না। উদ্ধৃতিটি আগা-পাশ-তলা (নিঃসম্বলের সম্বল, আর্তের দীর্ঘনিঃশ্বাস) না পড়লে সাইনবোর্ডের দর্শকের মতো বোকা বনতে হয়। অজ্ঞ ধার্মিক, না-ধার্মিকের দল এগুলো না জেনে ভুল পথে হাঁটেন। অবশ্য ইদ্রিশ, তসলিমা অজ্ঞ নয়। এদের হাতে অন্য কেউ তামুক খেয়ে যাচ্ছে না তো?

—হেতুবাদী

মার্কিনী কাবুলিওয়ালা এবং

এদেশে আফগানদের সাধারণতঃ কাবুলিওয়ালা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্য ছোটগল্প অবলম্বনে তপন সিংহের সুপরিচালিত ফিল্ম ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দি দুটি মসলা ফিল্মে ''কাবুলিওয়ালা'' চরিত্রে যথাক্রমে অমিতাভ বচ্চন এবং প্রাণ অভিনয় করেছিলেন। ঋত্বিক কুমার ঘটক পরিচালিত কোমলগান্ধার ছবিতে নির্মল ঘোষ এক কাবুলিওয়ালার চরিত্রে এক দৃশ্যের জন্য অভিনয় করেছিলেন যে চরিত্রটি নাটকের দলকে সুদে ধার দেয়। আমরা বরং ঋত্বিকের কাবুলিওয়ালাদের নিয়েই আলোচনা করি। ভারতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ১ লাখের কাছাকাছি। তিব্বতি, ইরানি, প্যালেস্তাইনী, বার্মিজদের মতো এরা ভারতে বিদেশি উদ্বাস্তু। রাষ্ট্রপুঞ্জের তহবিল থেকে এদের অনুদান দেওয়ার জন্য ভারত সরকার প্রচুর টাকা পায়। এই কাবুলিওয়ালারা কয়েক দশক আগে হিং, কিসমিস, আখরোট ফেরি করত। এখন সুদের ব্যবসা চালায়। এ এক মৃত্যু ফাঁদ।

কোনও ব্যক্তি যদি এদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নেয়, হাতে পাবে আট হাজার টাকা। প্রতি মাসে সুদ দিতে হবে এক হাজার টাকা, অর্থাৎ বছরে ১২ হাজার টাকা সুদ। সুদের হিসাবে যা বাৎসরিক ১৫০ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংকের আইন অনুসারে যা বেআইনি- এরা এই ব্যবসাকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইনানুগ করে নিয়েছে! লাখ লাখ মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মের নির্দেশে সুদ নেওয়া এবং দেওয়া গুনাহ (পাপ)। ভারতে কোনও ইসলামি ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে এই কাবুলিওয়ালাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করতে শোনা যায় নি। কলকাতা শহরে ভবানীপুরে এক মসজিদে এদের একটি ডেরা। কাবুলিওয়ালাদের সুদ ব্যবসাও এ প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। অনেক মৌলানা মৌলবীরা, অনেক ''ধার্মিক'' রাজনৈতিক নেতারা ইসলামের নামে এমন সব ফতোয়া দেন যা কোরান-হাদিশেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তালাক (এই শব্দটি শুনলে নাকি হজরত মহম্মদের আসন কেঁপে উঠত) এখন মুসলিম সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রধান

অস্ত্র। সুদ ব্যবস্থা এড়াবার জন্য ইসলামি ব্যাঙ্ক আরেক ধরণের জোড়াতালি দেওয়া ধোঁকাবাজি। ইসলামে ছবি আঁকা, ছবি তোলা নিষিদ্ধ। ফলে যারা পাসপোর্ট করে ''হজে'' গেছেন তাঁরা কতটুকু গুনাহ করেছেন কতটুকু পুণ্য অর্জন করেছেন তা বিচার্য। ইসলামে জাতিভেদ মান্যতা পায় না। তবুও শেখ, সৈয়দ, জোলা, আনসারি ইদানীংকালে ওবিসি মুসলমান ফারাক থাকে। মীর মুসারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু পড়ার পর কেন তাজিয়া নিয়ে ''মোচ্ছব'' কে ন্যায্যতা দেবো? মরুভূমির দেশে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য, অনাহারের কষ্টর প্রতি সহমর্মিতা জাগানোর জন্য রমজান মাসে রোজা রাখার প্রথা চালু হয়েছিল। এখন রমজান মাস মানে অতিব্যয়ের মাস, দরিদ্র-মুসলিম পরিবার আরও ঋণগ্রস্ত করার মাসে পরিণত হচ্ছে। ''সুন্নত'', বুরখা ধারণ প্রাক ইসলাম যুগে মধ্য প্রাচ্যের লোকাচার, আজকের সময়ে তা অবশ্য পালনীয় নাও হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য, ইস্তাম্বুল, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ-সহ বিভিন্ন দেশে ইসলাম অনুগামীরা তাদের নিজেদের মতো করে জীবন যাপন করে যার মধ্যে ধর্মীয় বিধানে সমতা থাকলেও প্রয়োগে বিভিন্নতা আছে। হজরত মহম্মদের জন্মদাতার নাম আরবী। তিনি মুসলমান ছিলেন না। কোনও মুসলমানকে আরবী নাম নিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রনায়িকা মেঘবতী সুকর্ণ এক মুসলিম পরিবারে জন্মেছেন।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এক সুপরিচিত সমাজ সংস্কারক তার অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছিলেনঃ ''অন্নগ্রহণের সময় খোঁজ নেওয়া যে তোমার গৃহের দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পূর্বের কোনও প্রতিবেশী অভুক্ত আছেন কিনা।''

অন্যত্র তিনি বলছেন যে– মজদুরের ঘাম মাটিতে পড়ার আগেই তাঁদের মজুরি দিতে হবে। তবুও সমাজবাদের নাম শুনলেই মুসলিম দুনিয়ার শাসককুল রক্তচোষা ''কাবুলিওয়ালা''র মতো আচরণ করে।

ওসামা বিন লাদেনকে খুন করে নদীর জলে মার্কিন সেনারা ফেলে দিয়েছিল বিচারের তোয়াক্কা না করে। সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এক ''পরবের'' দিনে। এসবই মার্কিন সরকারের নির্দেশে ঘটেছে। দুনিযার তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলি এব্যাপারে বিশেষ মতামত দেয়নি। মুসলিম দুনিয়ার উপর সাংস্কৃতিক আঘাত অনেকেরই নজর এড়ায়।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল ব্যবসায়ীকূলের মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যতটা আগ্রহ, নামাজী প্রার্থনাকারীদের জানমান রক্ষায় ততটা আগ্রহ নেই।

আজ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবী জুড়ে ‘ইসলামোফোবিয়া’’ ছড়াচ্ছে, ইরাক আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে। তখন মুসলিম সমাজকে আধুনিক দুনিযার দিকে তাকিয়ে পথ চলতে হবে। একজন মুসলমানের একটি অনৈতিক কাজ তসলিমা নাসরিন, সলোমন রুসদির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করবে যা ভবিষ্যতের পক্ষে মোটেই শুভলক্ষণ নয়। প্রার্থনাস্থলে আটকে থেকে বাইরের দুনিযা না দেখলে প্রার্থনা স্থানও আক্রান্ত হতে পারে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস তার একটা নমুনা। ভারতে মুসলিম সমাজ যদি তাদের দলিত, আদিবাসী জ্ঞাতিভ্রাতা-ভগ্নিদের সাথে একতা না গড়ে, বারবার গুজরাট, ভাগলপুর, নেলী, মীরাটের মতো গণহত্যা ঘটবে। হিটলার ইহুদি নিধনের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের সূচনা করেছিল। ভারতে ফ্যাসিবাদ আসতে পারে বর্ণহিন্দু আধিপত্যবাদ এবং বিশ্বায়নের যৌথ ষড়যন্ত্রে। ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে এক ব্যাপক যুক্ত মোর্চার গঠনের চেষ্টা চলছে যেখানে আন্তর্জাতিক স্বৈরতন্ত্রর প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরোধী শক্তিকে জমায়েত করা যায়। এ সংগ্রামে যে শত্রু নয় সেই বন্ধু।

হিন্দু-মুসলমান বিবাহ কিছু তথ্য-কিছু কথা

উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের ঠাকুরনগর সম্মেলন (১৪/৩/৯৮) বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার বক্তৃতার কিছুটা অংশ- ''বাংলাদেশে আমাদের ঘরের মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে মুসলমানরা বিয়ে করছে। ওদেশের তো বটেই, এদেশের সেকুলাররা এ বিষয়ে চুপ করে আছে। মোল্লারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলছে - হিন্দুর জাত মারা গেল। ওদেশে বা এদেশে য়দি একটি হিন্দু ছেলে কোনও মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে, তবে তো দাঙ্গা বেঁধে যাবে। আপনারা শপথ নিন যে আর একটিও ঘরের মেয়েকে মুসলমানদের লুঠের মাল হতে দেবো না।''

এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিবাহ নতুন ঘটনা নয়। সম্রাট আকবরের অসংখ্য স্ত্রীর বেশির ভাগই হিন্দু। অনেক ঐতিহাসিক এই কারণে আকবরকে অসাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন। মহাভারত কল্পকথা হলেও অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা বা ভীম-হিড়িম্বার ধর্মাচার লোকাচার অভিন্ন ছিল না। এর মধ্যে সম্প্রীতি খোঁজা মূর্খামি। রাজত্ব দখল এবং তা বজায় রাখার চতুর কৌশল মাত্র। কবির সাহায্য নিযে বলা যায় 'জেনেছ এতদিন ধার্তরাষ্ট্রের হাত থেকে ছিনিযে নিতে হবে কৌরব উত্তরাধিকার। শুধু এই কুমারী লক্ষ্যের দিকেই তোমার দৃষ্টি, তাই অনাযাসে তুমি সরে যাও এক নারী থেকে অন্য রমনীতে। তোমার পূর্ব পুরুষ যেমন একদা এক তৃণপ্রান্তর নিঃশেষ করে চলে যেত বনান্তরে।''

(*কৃষ্ণা-সব্যসাচী দেব*)

নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বেশ কিছু সুপরিচিত ব্যক্তির নাম তালিকা দাখিল করা যায় যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিবারের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আঙ্ম বদ্ধ হযেছেন। অনেকেই এই ধরনের দম্পতিকে সাধুবাদ জানান। মহান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেন। এই ধরনের প্রশংসা শুনে শুনে ওই দম্পতিরা শ্লাঘাবোধে আপ্লুত হন। একথা ঠিক ওই পুরুষ বা মহিলা নিজ নিজ পারিবারিক ধর্মীয় পরিচয় এবং তার রীতি-নীতি-নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাকে কিছুটা পরিমাণে এড়িয়ে

গেছেন - এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং তা আজকের দিনে অত্যন্ত ইতিবাচক কাজ। কিন্তু এ ধরনের বিবাহের ফলে দেশ-সমাজ জুড়ে সম্প্রীতির বন্যা বয়ে য়ায, এ ধরনের ধারণা অমূলক। এই অমূলক ধারণা শুধুমাত্র বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তাই নয়- ওই নারী-পুরুষের সম্পর্কের গভীরতাকে ওদের ভালোবাসাকে অবমূল্যায়ন করে। অনেকেই বলেন, কেউ কেউ লিখেও থাকেন যে যত বেশি হিন্দু-মুসলমান বিবাহ হবে তত বেশি ধর্মান্ধতা কমবে। ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতা এত সহজ ভঙ্গুর বস্তু নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-রাজনীতি এই বিভাজনকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কয়েকটি বিবাহ এ পাহাড় সরাতে পারবে না। এই ধরনের ইতিবাচক কাজের প্রতি সন্মান রেখেও বলা যায় যে সাম্প্রদায়িকতা নামক রোগটি নিরাময়ের জন্য শল্য চিকিৎসকের সহায়তা প্রয়োজন, অন্য ওষুধে কাজ হবে না। এবার রাহুল সিনহার কথায় ফেরা যাক। কোনও হিন্দু পুরুষ যদি কোনও মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করেন তবে রাহুল সিনহার কথায় মোল্লারা দাঙ্গা বাঁধাবে। বাংলাদেশের উদাহরণ দেওয়া যাক। বিখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত-গায়িকা ফিরোজা বেগমের দাম্পত্য শুরু হয় প্রায় ৬ দশক আগে। বাংলাদেশের নাট্য সংস্কৃতি আন্দোলনে সুপরিচিত রামেন্দু মজুমদার মুসলমান পরিবারের জামাই হয়ে অসুবিধায় নেই। কোথাও তো দাঙ্গা বাঁধেনি। এদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিন্তামণি করের স্ত্রী মুসলমান পরিবার থেকে এসেছেন। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা পি. সুন্দরাইয়ার স্ত্রী এক বোম্বাইবাসী মুসলমান। সুপরিচিত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক অমলেন্দু দে’র স্ত্রী টিপু সুলতানদের পরিবারজাত। ফিল্মি দুনিয়ায়ও উদাহরণ কম নয়। সুনীল দত্ত নার্গিসের কথা তো অনেকে জানেন। কিশোরকুমারের অন্যতমা স্ত্রী মধুবালা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। সম্প্রতি জনপ্রিয় নায়ক ঋত্বিক রোশন প্রাক্তন নায়ক সঞ্জয় খানের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের প্রখ্যাত সোসালিস্ট নেতা মুবারক মজদুরের কন্যা বর্তমানে সাংবাদিক নোরা বিবাহ করেছেন চিকিৎসক অরবিন্দ চোপরাকে। কয়েক বছর আগে কলকাতা কাঁপানো ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য বিয়ে করেছেন চেতলারই এক মুসলিম শিক্ষিকাকে। এত গেল উঁচুতলার সুপরিচিত শিক্ষিত মানুষদের প্রেম বিবাহের তথ্য। ‘নীচুতলার’ মানুষদের মধ্যে এধরনের বিবাহ কত হয় সে হিসাব কে রাখে। দৃষ্টিহীনা-সুগায়িকা-অভিনেত্রী মর্জিনা খাতুন বিয়ে করেছেন আর এক নাট্যকর্মী বাবুন চক্রবর্তীকে। এককালে পথশিশু বর্তমানে মঞ্চ-চলচিত্রে সফল অভিনেত্রী নাজমা খাতুন আর এক নাট্যকর্মী নীলাদ্রি ব্যানার্জির ঘরনী।

রাহুল সিনহারা যখন চিৎকার করে বলেন যে মুসলমানরা হিন্দু জামাই পছন্দ করেন না, তখন সেকুলারদের অবস্থান দেখা যাক। বিভিন্ন স্টাডি সার্কেল, সেমিনার,

কফি-চায়ের দোকানে প্রগতিশীল শিবিরের অনেককেই বলতে শোনা যায় মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় আন্তধর্মীয় বিবাহে মুক্তমনা নয়। সহিষ্ণু হিন্দুরা যদিও মুসলমান জামাইকে কোনওরকমে মেনে নেন, মুসলমানরা হিন্দু জামাই মেনে নেবার মতো মুক্তমনা নয়। ধর্ম-বর্ণ-ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ প্রশ্নে পশ্চিমের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। Inter Community maiirage info-র তথ্য অনুয়াযী কৃষ্ণাঙ্গ স্বামী-শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীর তুলনায় শ্বেতাঙ্গ স্বামী-কৃষ্ণাঙ্গিনী স্ত্রীর সংখ্যা অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে তো বটেই, পৃথিবীর সবদেশেই, এমনকি 'আধুনিক' পশ্চিমে পুরুষরা বিয়ে করে এবং মেয়েদের বিয়ে হয় বা বিয়ে দেওয়া হয়। বাছাই-এর চাবিকাঠিটা প্রধানতঃ পুরুষদের হাতে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষার উর্দ্ধে থাকে পুরুষতান্ত্রিকতা। অসংখ্য মেয়েদের নিজেদের শরীরের রং, চুলের দীর্ঘতা ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনা করে (আনন্দ) বাজারে বিজ্ঞাপন দিতে হয় পাত্রের সন্ধানে। তাই 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন 'পাত্রী চাই'-এর তুলনায় কাগজের নিউজপ্রিন্ট বেশি খরচ করে। আসলে সমস্যা ধর্মীয় পরিচয়ের নয়, নারী-পুরুষ সম্পর্কে যত বেশি ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরে থাকবে- তত বেশি মানবিক মূল্যবোধ-যুক্তিবোধ-ইতিহাস চেতনা বৃদ্ধি পাবে, আমরা তত বেশি নতুন পৃথিবীর দিকে এগোবো। বছর কয়েক আগে Times of India-য় একটি খবরের শিরোনাম ছিল Biggest show on the earth. খবরের বিষয় ঃ- এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় ৫ কোটি ১২ লক্ষ পুণ্যার্থী জমায়েত সর্বকালের সর্বাধিক জনসমাবেশ যা মক্কা (২.১২ কোটি), ভ্যাটিক্যান সিটি (২ কোটি), বোধগয়ায় (৭৫ লক্ষ) জনসমাবেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। 'আমরা ওদের তুলনায় বেশি প্রগতিশীল' এই ইঁদুর দৌড়ের দিন শেষ। ধর্মের প্রচারকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মানবতার এত বড় শত্রু পৃথিবীতে নেই। বর্তমানে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠী- শাসককুল-শাসন-ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য, আনুগত্যময়ে ভরপুর রাখতে প্রাক-আধুনিক ভাবনাকে আধুনিক মোড়কে চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানমনস্ক শক্তিকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শেণি লিঙ্গ ভিত্তিক শোযন বৈষম্য উচ্ছেদের এক বিশ্ববীক্ষা আমাদের অজানা থাকার কথা নয়। 'ঈশ্বর' প্রভাবমুক্ত সুখী দুনিয়া গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার দর্শন আমাদের মুঠোয়। সুদিন আসবেই।

—হেতুবাদী

অপ্রকাশিত প্রকাশ

প্রকাশ আমার সহপাঠী বন্ধু এটা অনেকে পছন্দ করে না। প্রকাশ এমনিতে কম কথা বলে, তবে যখন যা বলে তা আমাদের ক্লাসঘরে তো বটেই পরে সারা স্কুলে সকলের মুখে মুখে ঘোরে। বাংলার স্যার কৃষ্ণবাবু একদিন আমাদের প্রবন্ধ লেখা শেখাচ্ছেন। ১২টা বাক্য দিয়ে একটি রচনা লিখতে হবে। আমরা লিখলাম। স্যারের কাছে জমা দিলাম। কৃষ্ণবাবু কয়েকজনের শব্দচয়ণ, বাক্য নির্মাণ শুধরে দিলেন, বানান ভুল তো তাঁর নজরও এড়ায় নি। প্রকাশের খাতা দেখে ওকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই অরব শব্দটির মানে কী? প্রকাশের নির্বিকার উত্তরঃ আপনারা যাকে নীরব বলেন। কৃষ্ণবাবু বললেনঃ তাহলে নীরব লিখলেই হয়। নীরব আর অরব সমার্থক নাকি? প্রকাশঃ হ্যাঁ স্যার, জীবন স্যার তাই লিখেছেন।

কৃষ্ণঃ জীবন বাবু নামে আমাদের কোনো মাস্টারমশাই নেই। উনি কি তোমার প্রাইভেট টিউটর?

প্রকাশঃ না স্যার। প্রাইভেট টিউটর রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। জীবন স্যার মানে কবি জীবনানন্দ দাশ। লাইব্রেরীতে ওনার বই আছে, দেখে নেবেন।

এরপর ক্লাস তেমন জমল না। ঘণ্টা বাজার আগে কৃষ্ণবাবু ক্লাস ছাড়লেন।

অঙ্কের ক্লাসে যুগলবাবু বোর্ডে একটা গণিতের প্রশ্ন লিখলেনঃ ^{2}Ö64 + ^{3}Ö99=? আমরা চেষ্টা করছি। প্রকাশকে খাতা কলম হাতে নিয়ে না দেখায় যুগলবাবু প্রশ্ন করলেনঃ প্রকাশ, কী ব্যাপার? তুমি হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ কেন? চেষ্টা করো। প্রকাশের নিরুত্তাপ উত্তরঃ বরানগরে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের কোনও মাস্টারমশাই এই অঙ্কটা করতে হিমসিম খাবেন। আমি বেকার খাটতে যাবো কেন? এ তো প্রশ্ন নয়, অত্যাচার মাত্র।

তখন ক্লাস নাইনে পড়ছি। ইন্টার ক্লাস ফুটবল ফাইনালে নাইন(এ)র সাথে ইলেভেন সাইন্সের মুখোমুখি। ইলেভেনের ছেলেরা বয়সে বড়। একটু মেরে খেলে। হাফটাইমের মধ্যে আমরা ৩ গোল খেলাম। আমাদের তারকা খেলোয়াড় সনৎ সদ্য

জন্ডিস রোগ থেকে সুস্থ হয়েছে। ও একদম ওর মতো খেলতে পারছে না। হাফটাইমে সনৎ মাঠের বাইরে এসে শুয়ে পড়ে বলল— অন্য কাউকে নামা। আমি আর খেলতে পারব না। হঠাৎ প্রকাশ জামা বুট খুলে সনৎ-এর জার্সি পরে মাঠে নেমে গেল। খেলা শেষ হবার ৫ মিনিট আগে প্রকাশ গেম টিচার কাম রেফারীকে কিছু একটা ব'লে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলো। খেলার ফল তখন ৭-৪। আমরা জিতছি। প্রকাশ হ্যাটট্রিক তো করলো আর ওর পাসে বাকি গোল। প্রকাশ মাঠ ছেড়ে জার্সি খুলে জামা-বুট পরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ- কোথায় যাচ্ছিস? খেলা তো শেষ হয়নি। ওর উত্তরঃ বড় বাইরে পেয়েছে। এইভাবেই আমরা ক্লাস ইলেভেনে উঠলাম। প্রকাশকে নিয়ে সারা স্কুলে আলোড়ন। টিচার্স কাউন্সিল, ম্যানেজিং কমিটি, হেডস্যার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে– প্রকাশকে অভিভাবক মাকে নিয়ে কাউন্সেলিং-এ হাজির হতে হবে। হেডস্যার প্রকাশকে মেন্টালি ডিসএব্‌লড বললেন। অনেক স্যার তাতে সায় দিলেন। রথীনবাবু পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী। কলেজের চাকরি ছেড়ে আমাদের 'ছ্যাদরা' স্কুলে কেন এলেন কেউ জানে না। তাঁর বক্তব্য অন্যরকম। উনি দেশবিদেশের ম্যাগাজিন পড়েন। প্রচুর পড়াশুনা। উনি বললেনঃ প্রকাশ ডিফারেন্টলি এব্‌লড। উন্নত দেশগুলি এদের জন্য স্পেশাল এডুকেটরের ব্যবস্থা করে। বুঝে বা না বুঝে দু-একজন স্যার একথায়ও সায় দিল। বিধবা মাকে নিয়ে প্রকাশ ম্যানেজিং কমিটির 'বিচারশালায়' উপস্থিত হল। আশঙ্কায় থরথর ক'রে কাঁপছেন প্রকাশের মা।

হেডস্যারঃ- প্রকাশ, সামনে টেস্ট পরীক্ষা, তার কয়েকমাস বাদেই উচ্চমাধ্যমিকের ফাইনাল। তোমার পড়াশুনার ব্যাপারে আমরা খুবই চিন্তিত।

প্রকাশ-এর মাঃ- ও ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে। ওকে কষ্ট ক'রে বড় করেছি। ও কিন্তু বাড়িতে যতক্ষণ থাকে বইখাতা নিয়ে থাকে। বাজে কোনও আড্ডায় যায় না। ওকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দেবেন তো?

হেডস্যারঃ- আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমরাও প্রকাশের শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমরা ওর কাছে কিছু জানতে চাই।

প্রকাশঃ- স্যার, আপনারা আমাকে যা পারেন প্রশ্ন করুন। মাকে বিব্রত করবেন না।

হেডস্যারঃ আমি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের লিখিত রিপোর্ট পড়ে তোমায় স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করব। সব শিক্ষকরা একইরকম কথা বলেন যে তোমার পড়াশুনার পরিধি অনেক বড়ো। হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বড়ো। তুমি ক্লাস ফাইভ থেকে এই স্কুলে পড়ছ। প্রত্যেক পরীক্ষায় তুমি কঠিন প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর লেখ আর সাধারণ প্রশ্নগুলির উত্তরই লেখো না। ফলে কোনও

সময়ই তোমার নম্বর ৬০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছয় না। এরপর টেস্ট বা ফাইনাল আসছে। পরীক্ষকরা তোমাকে বুঝতে ভুল করবেন। তুমি এরকম করো কেন? কেউ কেউ তো তোমাকে অসুস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন বলেন।

প্রকাশঃ- কে কী বললেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। শুনেছি আপনি ম্যানেজিং কমিটির কাছে আমাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যাই হোক টেস্ট পর্যন্ত আমার খেলা এরকমই হবে। তারপর কী হবে এখন বলতে পারছি না। হয়তো ফাইনাল পরীক্ষায় হলে-ই আসবো না। আপনারা ছাত্রদের ল্যাব-এর ব্যাঙ মনে করেন। সহজ প্রশ্নের মধ্যে ঘুষ লুকিয়ে থাকে। কঠিন প্রশ্ন প্রশ্নকর্তার জ্ঞানগরিমার প্রকাশ।

বাড়ি ফেরার পথে প্রকাশ একবারও ক্রন্দনরতা ওর মাকে কোনও কথা বলেনি। প্রকাশ টেস্টে নম্বর পেল ৫১ শতাংশ। রথীনবাবুও হতাশার সুরে বললেনঃ- এমন ধাক্কা আমি জীবনে কম খেয়েছি। ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে আমি তো বিজ্ঞানের কোনও ছাত্রের উপর অভিভাবকত্ব আরোপ করতে পারি না। যথাসময়ে উচ্চমাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষা হলো। রেজাল্ট বেরোবার দিন ঘোষিত হয়েছে। আমাদের খাওয়া আর খেলা ডকে উঠল। সেদিন মঙ্গলবার ভোরবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পথচলা লোকজনের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভাঙল। বেরিয়ে শুনলাম সবাই প্রকাশের নাম বলছে। দৌড়ে প্রকাশের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি প্রচুর লোকের ভিড়। পুলিশ ভিড় সামাল দিচ্ছে। শুনলাম সাংবাদিকরাও এসেছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলো না তো? প্রকাশ ভালো আছে তো? ভিড় ঠেলে প্রকাশদের ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি প্রকাশের মা আকুল নয়নে কাঁদছেন আর মাঝেমধ্যে পুলিশ অফিসার আর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রকাশের এক প্রতিবেশী কাকা প্রকাশের ঘর থেকে একটা চিঠি বের করে বললেনঃ- দেখুন তো বৌদি এটা আপনার ছেলের চিঠি কিনা? মাকে লেখা প্রকাশের চিঠির বয়ান এরকম— মা, চিন্তা করো না। আমি কিছুদিনের জন্য গ্রামবাংলায় ঘুরবো। আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা কেন স্কুলে যেতে পারেনি সেটা তাদের কাছ থেকেই শুনতে চাই। এসময় উচ্চশিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করা বিলাসিতা। আমায় ক্ষমা কোরো।

অঝোর নয়নে কাঁদছেন প্রকাশের মা। পুলিশের অফিসার প্রকাশের একটা ছবি চাইছেন। সাংবাদিকদের মধ্যে সবাই বললো— আমাদেরও ছবি চাই। একটা অসাধারণ রিপোর্ট হবে। রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও ২৪ পরগণার কৃষ্ণেন্দু মেমোরিয়াল স্কুলের প্রকাশ নস্কর কেরিয়ারকে উপেক্ষা করে সমাজ সেবায় নিজেকে নিবেদিত করলো।

—অরিত্র- বিশেষ সংখ্যা- ১৯৮৭

গোরু

'ড্রইং স্যার' পল্লব বাবু ছাত্রদের আঁকা সমস্ত কাগজগুলো নিয়ে হেড স্যার-এর ঘরে ঢুকলেন—

দেখুন স্যার, ছেলেগুলিকে সেল্ফ পোর্ট্রেট আঁকতে দিয়েছিলাম। সবাই তো মোটামুটি ভালই এঁকেছে কিন্তু এই বদমাইস ছেলেটা কী এঁকেছে দেখুন। সেল্ফ পোর্ট্রেট-এ গোরুর ছবি এঁকেছে।

হেড স্যার বললেন— গোরুটা কেটে দিন আর গার্ডিয়ান কল করুন।

পল্লব বাবু বললেন— কী বলছেন স্যার? আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, আমি গোরু কাটব! গো হত্যা মহা পাপ।

হেড স্যার বললেন— তাহলে আমিই কাটি। যদিও আমার ছোটবেলায় পৈতে হয়েছিল। ঘোষালরা তো ব্রাহ্মণই হয়।

পল্লব স্যার বললেন— ছেলেটার ফাঁদে পা দেবেন না স্যার।

বদমাশটার নাম কুতুবুদ্দিন আলি মণ্ডল।

অনুপ্রেরণাঃ শিবরাম চক্রবর্তী

অনুগল্প সংকলনঃ প্রাক্‌চিন্তা প্রকাশনী- ১৯৭৪

নিষিদ্ধ দেশ নিষিদ্ধ কথা

সাও-কো-লাই-এর অনেকদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হলো। ছোটবেলা থেকেই দেশ-বিদেশের রহস্য উপন্যাস পড়ে ওর গোয়েন্দা হবার বড় ইচ্ছা ছিল। এদিকে চিন দেশে গৃহযুদ্ধ চলছিল। পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটেছিল। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর স্থিতাবস্থা এলো। নতুন সরকার চাকরির দরখাস্তে কে কোন দফতরে কাজ পেতে আগ্রহী তা জানাবার সুযোগ দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে সাও চাকরির দরখাস্ত করল। পুলিশ বিভাগে চাকরি জুটেও গেল। তা গোয়েন্দা বিভাগেই একবছর ট্রেনিং শেষ করে আজ সাও-এর প্রথম ডিউটির কারণে রাস্তায় নামা। ওর সিনিয়র ওকে পাখি পড়াবার মতো পড়িয়েছেন যে কী কী করতে হবে।

সিনিয়রের ভাষণ— নূতন সরকার চিন দেশে দেহ বিক্রি বলতে যা বোঝায় সেই বৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যে মহিলাগণ এই পেশায় যুক্ত ছিলেন তাঁদের সম্মানজনক পথে রোজগার করার সুযোগ দিয়েছে। তাঁদের পারিবারিক জীবনে ফিরে যাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। তবুও মেয়েদের মধ্যে একটা সামান্য অংশ টাকার লোভে বা অভ্যাসবশতঃ এ পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। তোমার চেহারার মধ্যে একটা আভিজাত্য ফুটে ওঠে। তুমি কিছুটা দামী পোষাক পরে শহরের উত্তর-পশ্চিম অংশে ঘোরাফোরা করলে ওরা তোমাকে নিশ্চয়ই 'কাস্টমার' ভাববে। এরপর হাতেনাতে ওদের গ্রেফতার করা সহজ হবে। টেসিং এমন একটি মহল্লা যেখানে নানা ধরনের 'ডিপার্টমেন্টাল স্টোর' আছে। দু-একটি সিনেমা হল আছে সেখানে বিদেশী ফিল্ম দেখানো হয়। সাও-এর প্রথম কর্মদিন শুরু হলো টেসিং থেকে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তার নজরে পড়ল এক তরুণীর দিকে। মেয়েটির পোষাক আধুনিক কিছুটা পশ্চিমী ঘরানার। ইদানীংকালে মেয়েরা যেরকম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাজগোজ করে বাড়ির বাইরে বেরোবার চল বন্ধ করে দিয়েছে মেয়েটি সেই ধরনের নয় মনে হলো। একটি দোকানে মেয়েটির থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে সাও মেয়েটির অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বুঝলো তাঁর কর্মজীবনের প্রথম অভিযুক্তকে ধরতে চলেছে। দোকান থেকে বেরিয়েই মেয়েটি সরাসরি সাও

কে বললো— আমাকে অনুসরণ করো। বাজার এলাকার পেছনদিকে একটা পুরনো বাড়ির পেছনদিকে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ধরে সাও মেয়েটির সাথে একটি ছোট কামরায় ঢুকলো। মেয়েটি বললো— আমাদের পরস্পরের নাম জানার দরকার নেই। কারণ এই পেশায় আমরা কাস্টমার-এর সঠিক নাম পাই না। সাও সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে সহমত জানালো। এখন তো শুধু গ্রেফতারের পালা। সাও-এর পকেটে একটি শক্ত তালা-চাবি রয়েছে। যেহেতু সরকারি নির্দেশে কোনও মহিলাকে গ্রেফতার করতে হলে মহিলা পুলিশই দরকার তাই সিনিয়র-এর নির্দেশ ছিল যে অভিযুক্তকে ঘরে তালা বন্ধ করে নিকটস্থ থানার মহিলা পুলিশদের খবর দিতে হবে। ইতিমধ্যে ভিতরের কোন ঘর থেকে পোষাক বদলে একটি পাতলা নাইটি পরে মেয়েটি এঘরে এলো। মেয়েটির নির্মেদ শরীরের প্রত্যেকটি ভাঁজ সাও-এর কর্তব্য পালনে কি দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছে? কর্মজীবনের প্রথম দিনেই সাফল্য অথবা নিজের কুমারত্ব ভাঙ্গার দ্বন্দ্বে কোন্‌দিকে যাবে সাও? দ্বিধা কাটিয়ে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে সাও মেয়েটিকে জানালো— তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে খিলখিল স্বরে হেসে উঠল—আমাদের পুরো দিনটাই মাটি হলো। তুমি আমি একই দফতরে কাজ করি। পুরুষ কাস্টমার ধরাই আমার এখন ডিউটি।

তিস্তা-তোরসা-নববর্ষ সংখ্যা ১৯৮৮
তরাই-ডুয়ার্স - শরৎ সংখ্যা ১৯৮৮

রাতের অতিথি

বারাসাত থেকে বাসে চড়েছি। নামতে হবে এয়ারপোর্টের ২নং গেটে। বাসটা বেশ ফাঁকা। দ্রুতই চলছিল। বিরাটি পার হবার পর কন্ডাক্টারকে টাকা বাড়িয়ে দিয়ে টিকিট চাইলাম। কন্ডাক্টর বললেন— ''এ কী করছেন দাদা! ছোট ভাইকে অপরাধী করবেন না। আপনার কাছ থেকে ভাড়া নিলে মহাপাতক হবো''। বাস থেকে নামার আগে পেছন ফিরে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তাঁরা ভাবছেনঃ- এ কে বাবা? এরকম ঘটনা ঘটেছিল কয়েকমাস আগে। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল যাচ্ছি। বালী, উত্তরপাড়ায় জানলায় জানলায় কোন এক জনসেবক চিৎকার করে বলে যাচ্ছে— সামলে যাও। শ্রীরামপুরে চেকিং বসেছে। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে। সত্যিই শ্রীরামপুরে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজন পুলিশ, দুজন চেকার সহ এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমাদের কামরায় উঠলেন। আমার সামনে এসে টিকিট দেখা দূরের কথা সরাসরি অতি পরিচিতের মতো বললেন— স্যার, আপনি লোকাল ট্রেনে যাচ্ছেন? গাড়ি কি সার্ভিস করতে দিয়েছেন? এরকম ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে। রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী যাচ্ছি। যারা সাধারণতঃ খাবার দেয় তাদের একজন এসে আমায় জিজ্ঞেস করলো— ভেজ না নন্ ভেজ? তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন টিকিট চেকার ছেলেটিকে ধমকে বললেন— কিছুই জানিস না দেখছি। উনি জন্ম থেকেই শাকাহারী। রাতে কামরার সহযাত্রী মুরগীর ঠ্যাং চিবোলো আর আমি স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন পনীর-এর তরকারি খেলাম।

ময়দানের কালিঘাট ক্লাবের মাঠে একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে চলেছি। পার্কস্ট্রিটের রাস্তা পার হবো। সিগন্যালে একটি দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। পেছনের গেটের কালো কাঁচ নামিয়ে এক সুদর্শনা মহিলা গগলস খুলে আমার দিকে কয়েকটি শরীরি ভঙ্গিমা প্রকাশ করলেন। আমি অবাক! পাশের এক পথচারী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ মহিলা আপনাকে চেনে? আমি বললাম— না তো! পথচারীর প্রশ্ন— উনি আপনাকে চোখ মারলেন। ফ্লাইং কিস দিলেন আর আপনি বলছেন চেনেন না! উনি

মুনমুন সেন, সুচিত্রা সেনের মেয়ে।

জীবনের প্রথম বিমান যাত্রা। ভেলোর থেকে এক বন্ধুর বাবার মৃতদেহ নিয়ে আসতে হবে। জরুরি তলব। দমদম বিমানবন্দরে ঢুকতে গিয়ে শেষ সিকিউরিটি চেক স্পটে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের কী একটা যন্ত্র দিয়ে সারা শরীরে বোলানো হচ্ছে। আমার পালা আসার পর দায়িত্বশীল সিকিউরিটি অফিসার বললেন— ''বেশ কদিন বাদে দেখছি স্যার। ভালো আছেন তো?'' আমার শরীরে কোনো তল্লাশি হলো না। ব্যাপারটা আমরা মোটেই ভালো লাগছে না। একি ভ্রান্তিবিলাস ফিল্মের দুই উত্তমকুমার বা দুই ভানু ব্যানার্জী? কিম্বা লুকোচুরি সিনেমার দুই কিশোরকুমার? বোম্বের মশলা ছবির জুড়ুয়া ভাই যারা ছোটবেলায় আলাদা পরিবেশে আলাদা পরিবারে বড় হয়েছে। এসব আমার ক্ষেত্রে ঘটে থাকলে আমি কি কিছুই জানতাম না? সিদ্ধান্ত নিলাম, এরপরে এরকম ঘটনা ঘটলে সোজা কলার ধরে জিজ্ঞাসা করব আমার উপর এই অত্যাচারের কারণ টা কী? ঠাট্টা ইয়ার্কির তো সীমা-পরিসীমা থাকবে!

বুলবুলের কাছ থেকে একটি সমাজতত্ত্ব-এর বইয়ের খোঁজ নেওয়ার জন্য ওর বাড়ি যাচ্ছি। একটা সরু গলি আর বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। গলিতে ঢোকার আগে মুখেই তিনটে ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক আমার সামনে চলে এল। দুজনের হাতে ছুরি বাকিজনের কাছে পিস্তল। তাদের পেছনে কেশব ঘোষাল। কেশব ঘোষালকে লোকজন আগে কেশা গুণ্ডা বলেই চিনত। এখন রাজনৈতিক ছাতার তলায়, ফলে তিনি এখন সমাজপতি। কেশব ঘোষাল আমাকে বলল— ফের যদি কোনোদিন আমার মেয়ের পেছনে লাইন দিস তাহলে ছুরি, গুলি তোর শরীরে ঢুকিয়ে দেবো।

বাবা পিঠে একটা ধাক্কা মেরে বলেন— এ তো এক জ্বালাতন দেখছি। শুলেই কুম্ভকর্ণের ঘুম আর তার সাথে গোঁ গোঁ আওয়াজ। কাল থেকে তোর মার কাছে শুবি। স্বপ্নে কাকে দেখে ভয় পাস তুই?

—তরাই-ডুয়ার্স নববর্ষ সংখ্যা - ১৯৭৬

দেবতা না দানব

বেশ কয়েকজন মানুষের নাম বলা যায় যাঁরা গভীর সংকট মুহূর্তে এমন কাজ করতে বাধ্য হন যা তাঁর নীতি আদর্শবোধের সাথে খাপ খায় না। ব্যতিক্রম তো আছেই। ভগৎ সিংকে যখন ফাঁসির দড়ি লাগানো হচ্ছিল তখন তাঁকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলা হয়। তাঁর দুই সাথী প্রার্থনা করলেও ভগৎ সিং নিরীশ্বরবাদী অবস্থান বজায় রেখে প্রার্থনা করেন নি। আসলে প্রত্যেক মানুষই তার সময়ের সন্তান এবং একইসাথে সময়ের শেকলে বাঁধা। স্তালিন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে কেউ তাঁকে দেবতা বলবেন কেউ দানব আখ্যা দেবেন। বনবিহারী চক্রবর্তী, মণি গুহ, বিজয় সিং সর্বোপরি আলবেনিয়ার আনোয়ার হোজা স্তালিন-এর কোনো ভুল দেখেননি। ত্রৎস্কিবাদী সহ ইদানীং নানা ধরনের 'নয়া বাম' রা শুধু স্তালিন নয়, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। স্তালিনকে মুচির বাচ্চা বলার লোক কম নেই (কুণাল চট্টোপাধ্যায়-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 'স্তালিন একটি কষাই'- ভাস্কর নন্দী)। মাও সে তুং, আনা লুইস স্ট্রং সহ এদেশের জ্যোতি ভট্টচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখাপাধ্যায় স্তালিন সম্পর্কে নির্মোহ সমর্থন জানিয়েছেন। কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের পাঁচ শিক্ষকদের মধ্যে স্তালিনকে গণ্য করেন। এই রচনাটি স্তালিন-এর ব্যক্তি জীবনের এক কম-আলোচিত অংশ নিয়ে তথ্য মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বলশেভিক সেনাবাহিনীর তরুণ সদস্য স্তালিন-এর এক পুত্র ইয়াসা ইয়াকভ জর্মন ফ্যাসিবাদীদের হাতে গ্রেফতার হয়। জর্মন শাসকরা এটিকে 'বিগ ক্যাচ' মনে করেন। জর্মন নাজি বাহিনীর তরফ থেকে বার্তা পাঠানো হয় যে সোভিয়েত শিবিরে আটক জর্মন ফিল্ড মার্শাল ফ্রেডরিক পৌলসকে মুক্তি দিলে স্তালিন-পুত্রকে মুক্ত করা হবে। স্তালিন-এর কাছে খবর পৌঁছল। বিষণ্ণ বিমর্ষ স্তালিন জানান— ''আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। তবুও আমি আমার জীবনসঙ্গিনী .... -এর সাথে কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।'' পরের দিন স্তালিন জানান— ''সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এক তরুণ সেনার বিনিময়ে কোনো জর্মন ফিল্ড মার্শালকে মুক্তি দেওয়া সঠিক কাজ হবে না। ইয়াসা (ইয়াকভ)-এর সমস্তরের

কোনো জর্মন সেনাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। এটা আমার মত। আপনারা সমবেত আলোচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন"। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী স্তালিন-এর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধায় তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে সহমত হন এবং জর্মন বাহিনীকে জানিয়ে দেন। জর্মন সেনাবাহিনী এই সিদ্ধান্তের অর্দ্ধাংশ ইয়াসা (ইয়াকভ)কে জানায়। বন্দী বিনিময়ের কথা উহ্য রাখে। ইয়াসাকে জানানো হয় যে স্তালিন সহ ইয়াসার পরিবারের প্রতি সৌজন্য দেখাবার জন্য তারা ইয়াসাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে চেয়েছিল কিন্তু স্তালিন জর্মনদের দায় গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তরুণ ইয়াকভ কিছুটা পরিমাণে অবসাদে ভোগেন। এর কিছুদিন বাদে নাৎসী শিবিরের দোতলা থেকে জর্মন সেনারা ইয়াকভকে নীচে ফেলে দেয়। একটি বড় পাথরে মাথায় আঘাত পাবার পর ৫দিন বাদে বিনা চিকিৎসায় ইয়াকভ-এর মৃত্যু ঘটে। জর্মন সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সারা বিশ্বে জানান দেয় যে স্তালিন-এর করুণাহীন সিদ্ধান্তে হতাশ হয়ে স্তালিনপুত্র আত্মহত্যা করেছে। বিশ্ববাসীর একাংশ স্তালিন-এর প্রশংসা করলো। বাকিদের কাছে স্তালিন-এর নির্দয় দানব পরিচয়ের কল্পকথার সঙ্গে আর একটি ঘটনা যুক্ত হলো।

—অরিত্র-শীত সংখ্যা - ১৯৭৯

আনন্দ - বৌদ্ধ ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র

অনন্ত আচার্য

হুগলি জেলার বাসিন্দা বরুন বরুয়া (নাম সামান্য পরিবর্তিত) মহা সংকটে পড়েছিলেন। সরল প্রকৃতির মানুষ বলেই লোকজন তাঁকে চেনে। কারও সাথে দেখা হলেই 'জয় ভীম - নমো বুদ্ধা' বলে সম্ভাষণ করেন। নিজেকে বৌদ্ধ এবং আম্বেদকর অনুগামী পরিচয় দেওয় ায় তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। সম্প্রতি তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে নিকটজনের মৃত্যু পরবর্তীকালে যেসব নিয়ম কানুন পালন করতে হয় তার জন্য বরুয়া মশাই এক ভান্তে (বৌদ্ধ পুরোহিত)-র শরণাপন্ন হলেন। ওই ভান্তে যে লম্বা ফর্দ তৈরি করলেন তার খরচ প্রায় বরুন বরুয়ার তিন মাসের রোজগারের সমান। তিনি এতদিন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কড়া সমালোচনা করতেন। এখন এই ভান্তেকে কী বলবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি অন্য ভান্তেদের কাছে গেলেন। খরচ বা নিয়ম রীতির কোনও হেরফের হল না।

বৌ-বাজারের মাছের দোকানে এক মহাস্থবির-এর দেখা মিলল। বৌদ্ধ ধর্ম যাজকরা যেমন পোশাক পরেন তেমনই তাঁর পোষাক। একটি বড়মাপের শোল মাছ কিনছেন। জ্যান্ত মাছটাকে সামাল দিতে মাছ বিক্রেতা হিমসিম খাচ্ছে। অবশেষে মাছটা কাটার পর বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ব্যাগে পুরে স্বগৃহে ফিরলেন।

ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞের সাথে পশুবলির পরম্পরার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা– নিজ জিহ্বার লালসা চরিতার্থ করতে কোনও প্রাণী হত্যা ধর্ম বিরুদ্ধে কাজ।

২০০২ সালে জলপাইগুড়ি শহরে একটি বড় বিজ্ঞান মেলা হয়। মেলা অফিসে একটা লম্বা নির্দেশনামা টাঙানো ছিল। কী করা উচিত ও কী করা উচিত নয়– সংগঠনের বিজ্ঞান চেতনা ও সমাজবন্ধু হওয়ার প্রাথমিক এবং দীর্ঘকালীন শিক্ষা।

১। কর রেখা গণনা নিষিদ্ধ

২। শুভ-অশুভ চিহ্ন বিচার অর্থহীন

৩। বজ্রপাত থেকে ভবিষ্যতবাণী অসম্ভব

৪। স্বপ্নের সাথে ভবিষ্যতবাণী করা যায় না।

৫। দেহের কোনও চিহ্ন থেকে ভবিষ্যত কথন অসম্ভব

৬। ইঁদুরে কাটা কাপড়ের দাগ দেখে ভালো মন্দ বিচার

৭। হোম বা যজ্ঞ জাতির কাজে কোনও উপকার হয় না

৮। শরীরে গাঁট বা অংগ প্রতঙ্গের সন্ধিস্থান দেখে ভাগ্যগণনা।

৯। বাড়ির জমি দেখে ভালোমন্দ বিচার অযৌক্তিক (বাস্তুতন্ত্র)

১০। শেয়ালের ডাক শুনে ভালোমন্দ বিচার যুক্তিহীন

১১। ভূত তাড়ানোর মন্ত্র অর্থহীন কারণ ভূত-এর অস্তিত্ব নেই

১২। মাটির বাড়িতে বাস করলে পৃথক মন্ত্র উচ্চারণ বুদ্ধিহীনতা

১৩। সাপকে বশ করা যায় না

১৪। মন্ত্র উচ্চারণে বিষ তাড়ানো যায় না

১৫। বিছে ইঁদুর কামড়ালে ঝাড়ফুঁক অর্থহীন

১৬। পাখির ডাকের মানে বোঝা যায় না

১৭। কাকের ডাক শুনে শুভ অশুভ বিচার সম্ভব নয়

১৮। কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী অসম্ভব

১৯। কোনও মন্ত্র তীরের আঘাত আটাকতে পারে না

২০। সব প্রাণীর ভাষা বোঝা সম্ভব নয়

যে কোনও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এ ধরনের ভাবনাচিন্তাকে জনমনে স্থাপিত করাই সমীচিন মনে করেন। যুক্তি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে আজও বহু মানুষ এই কুসংস্কারের অন্ধকারে পড়ে আছে। অথচ আশ্চর্যের কথা উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজগুলিকে বর্জন করার উপদেশ দিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ বা সিদ্ধার্থ। তাও প্রায় দুই হাজার বছর আগে। (সুত্রঃ ব্রহ্মজাল মুক্ত-দীর্ঘনিকায়-রাহুল সাংকৃত্যায়ন-বৌদ্ধ শিক্ষা পরিষদ-১৯৭৯)। নব আম্বেদকরবাদী, নব বুদ্ধরা যদিও রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর মতো প্রাক্তন ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ, তারও পরে কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসীদের রচনাবলীকে অস্পৃশ্য মনে করতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধের কথায় কোনও কোনও শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যখন শ্রদ্ধাদত্ত ভোজন ভোগ করেও হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন তখন তাদের বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত (১/২/২১ - ত্রিপিটক বা পালিভাষায় ত্রিপিটক), অস্বীকার করা যায় কি?

আরও একটি সমস্যা আছে। কোন ঘরানার বৌদ্ধ? হীনযান না মহাযানী না ব্রজযানী? প্রথম ৩টি সঙ্গীতি (বৌদ্ধ সম্মেলন) তে বুদ্ধবচন সংকলন করা হয়েছিল কিন্তু তা লিখে রাখা হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫ নাগাদ ৪র্থ সঙ্গীতিতে (সিংহলের রাজা

বট্টগামনীর সময়ে) বুদ্ধের মৃত্যুর ৫০০ বছর বাদে বুদ্ধবচন লিপিবদ্ধ হল। মূল থেকে তা সরে যাওয়ার আশংকা থেকেই যায়। তবুও এত বছর আগে বৌদ্ধদর্শন এতটা বস্তুবাদী হল কী করে? সাধারণভাবে আমাদের ধারণা যে যে বস্তুবাদী দর্শন যুক্তি বিজ্ঞান চর্চার ফসল। এ বিষয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি* প্রবন্ধে লিখেছেন (পরিচয় - ১৯৭৬, পুনর্মুদ্রণ - চেতনা লহর - জুলাই - ২০১৫ - পৃঃ - ২৪)– গৌতম বুদ্ধও কোনওদিন রাজশক্তির প্রতি খুব বড়ো একটা সম্মান দেখাননি। অজাতশত্রুর মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষকার বজ্জিদের বিরুদ্ধে রাজ অভিযানের জন্য গৌতমের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার পর ভিক্ষুদের ডাক দিয়ে গৌতম বলেছিলেন– বজ্জিদের ওই গণ সমাজ বা ট্রাইবাল - সমাজের গণবন্ধনটিকে সার্থকভাবে অনুসরণ করার উপর বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

তবুও নববুদ্ধরা, যারা প্রধানত ভারতের দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত, বৌদ্ধ ধর্মর মূল সারাংশকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলেন। কেন না ব্রাহ্মণবাদী ষড়যন্ত্রে গৌতম বুদ্ধ ‘ভগবান’ বা ‘অবতার’ হিসেবে মেনে নেওয়ার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন আছে।

আম্বেদকর বৌদ্ধ ছিলেন মাত্র সাত সপ্তাহ, কিন্তু ওই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য যা করেছেন, অশোকের পরে সম্ভবত আর কোনও ভারতীয় করতে পারেনি, তাঁর মৃত্যুর সময় সাড়ে সাত লক্ষ অস্পৃশ্যদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছিল এবং তার কয়েক মাস শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মানুষ একই পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাদের নেতার আকস্মিক মৃত্যুজনিত অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, (আধুনিক ভারতে বৌদ্ধধর্ম- টি. বিজয়েন্দ্র - চেতনা লহর - এপ্রিল - ২০১১)। দলিতদের সংগ্রামে আম্বেদকর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম, তবে সেখানে বৌদ্ধধর্মের কোনও লক্ষণীয় ভূমিকা ছিল না। গ্রাম্য নববুদ্ধদের ঝোঁক ছিল বুদ্ধ আর আম্বেদকরকে মিলিয়ে এক নতুন দেবতা নির্মাণের দিকে। এর একমাত্র কারণ এই সব নববুদ্ধদের ধর্ম শিক্ষার কোনও শিক্ষক ছিল না। বিশ্ববিক্ষা ও বস্তুবাদী জীবনচর্চার অভাবে এরা হয়ে রইলেন এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে লিখিত বরুন বরুয়া বা উক্ত মহাস্থবিরের মতো নামেই বৌদ্ধ আদতে আপাদমস্তক হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু। ধর্মীয় ধান্দাবাজদের মৃগয়াক্ষেত্র এই ভারতে তাই খুবই সহজে আশ্রয় পেলেন তিব্বতের দলাই লামা যার একমাত্র পরিচয় বিলাশী ধনকুবের এবং দাস ব্যবসায়ী। নেহরুর প্রশ্রয়ে কয়েক'শ কোটি টাকার অলংকার সহ দলাই লামা হলেন ভারতে ধনীতম শরণার্থী। বজ্জি উপজাতিদের সাম্য সম্প্রীতির দর্শন চাপা পড়ে গেল ভারতের ধর্মশালায় নির্মিত দলাই লামার প্রাসাদোপন বাসগৃহে।

চীনা ভ্রমণকারী হি উয়েং সাঙ (৬৩০ খৃঃ) তাঁর *বৌদ্ধ ভারত* বইয়ে লিখছেনঃ

যিনি বৌদ্ধপণ্ডিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহের তিনটি শ্রেণি বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাকে দেখাশোনা ও আদেশ মান্য করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেবাদাস আবণ্টন করা হয়েছে– যে বৌদ্ধ পণ্ডিত পাঁচটি বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারেন তাঁকে হস্তিবাহিত রথ আবণ্টন করা হয়েছে– যিনি ধর্মগ্রন্থের ছয়টি শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারেন তাঁকে পরিবেষ্টনকারী রক্ষী দেওয়া হয়...(অনুবাদক - লেখক)

ইতিহাসবিদ কোসাম্বী-এর অনুসন্ধান পর্ব তাঁর স্বভাবজাত নির্মোহ এবং নির্মম রুক্ষ। তিনি লিখেছেন– বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতি ও সভ্যতামূলক কাজকর্ম খৃষ্ট জন্মের সপ্তম শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যায়। 'অহিংসা' সম্পর্কিত উপদেশাবলী সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। যদিও অনুশীলিত হয়নি, বৈদিক পশুবলি দান পরিত্যক্ত হয়েছিল যদিও তা অর্থনীতির উপর কোনও প্রভাব পড়েনি। অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে কৃষকদের কাজে লাগানো হোত। ব্রাহ্মণ ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে রাজি করানো হোত। বৌদ্ধধর্মের ভারত ছাড়ার জন্য দায়ী শংকরাচার্য, কুমারিল ও উদয়ন-এর মতো বৈদান্তিক ও মীমাংশক আচার্যরা। পণ্ডিত সমাজের বড় অংশ বৌদ্ধধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন এবং সাধারণ স্তরের বৌদ্ধজনতা তাদের শিক্ষকের অভাববোধে শৈব ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণের পথ ধরলেন। নবম ও দশম শতকে নেপালের তরাই অঞ্চলে নাথপন্থী যোগীরা একই সাথে শিব ও বুদ্ধের উপাসনা করতো, নেপালে আজও শিব ও বুদ্ধ একই পরিবারে পুজ্য।

কী করিতে হইবে?

আর.এস.এস.-এর রামরাজ্যে গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর অনুগামীদের কী চোখে দেখা হবে তার কিঞ্চিত উদাহরণ দেওয়া যাক।

বাল্মীকি রামায়ণ-এর অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি বলে এক ঋষির কথা রামের আলাপের বিবরণ আছে। জাবালিকে রাম কড়া সুরে বলছেনঃ– আপনার বুদ্ধি বেদ বিরোধী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করেছিলেন আমি তাঁহাকে নিন্দা করি। বৌদ্ধরা তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিকদের মতো তাদের দণ্ড দিতে হবে। রামের চোখে চার্বাক, বৌদ্ধ ও চোর– একই স্তরের প্রাণী। আধুনিক অভিধানে ইউটোপিয়া শব্দটির অর্থ রামরাজ্য। বৌদ্ধ ইতিহাস চর্চার আনন্দ একটি বর্ণময় চরিত্র। বুদ্ধের খুব কাছের মানুষ ছিলেন আনন্দ। বুদ্ধ এবং বুদ্ধের 'মহানির্বাণের' পর আনন্দ-এর জিজ্ঞাসা আর সংশয় প্রায়ই সঙ্ঘ কর্তৃপক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলতো। আনন্দ-এর আনুগত্যের প্রতি অনাস্থা পোষণ করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আনন্দ ছিলেন লয়াল অপজিসন। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের বন্যা প্রবীণ শ্রমণদের সংকটে ফেলতো। ধর্মাচরণে মহিলাদের অধিকার পুরুষদের থেকে কোনও অংশে কম থাকা

উচিত নয়— এটা আনন্দ বিশ্বাস করতেন। শ্রমণরা এর জন্য আনন্দকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি, আনন্দ তাঁর বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে যুক্তি দিয়েও সঙ্ঘের প্রতি অনাস্থা পোষণ করেননি। এদেশে আজ যাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি নূতনভাবে আকর্ষিত হচ্ছেন তাঁদের অনেকেই নিজেদের আম্বেদকর অনুগামী মনে করেন। তাঁদের নির্ণয় করতে হবে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের কোন শাখার প্রতি আনুগত্য দেখাবেন।

১) গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থ-এর মহানির্বাণের ৫০০ বছর বাদে ৪র্থ 'সংগীতি'তে গৃহিত ত্রপিটক বা ত্রিপিটকে আত্মদ্বীপ (বা আত্মদীপ) আত্মশরণ, অনন্য শরণ, ধর্মদ্বীপ (বা ধর্মদীপ), ধর্মশরণ, অণন্য শরণ হয়ে চলো।

অথবা, ২) আনন্দ বর্ণিত বজ্জি উপজাতির 'সাম্যবাদী' গণসমাজ।
অথবা, ৩) 'অবতার' গৌতম বুদ্ধের বিরামহীন ভজনা।
অথবা, ৪) অসামাজিক দলাই লামার নির্দেশিত জীবনচর্চা।
অথবা, ৫) বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক উপাদান- বস্তুবাদ চর্চা।
অথবা, ৬) রাহুল সাংকৃত্যায়ণ-এর বুদ্ধ ভাবনা।
অথবা, ৭) আম্বেদকর-এর স্বল্পকালীন বৌদ্ধ ধর্ম্মচর্চা।
অথবা, ৮) জাতভেদভিত্তিক হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দ্রোহী বুদ্ধের অনুশরণ।

আজ যখন ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদী তথা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্ষমতাশীল হয়ে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে তখন হিন্দু পরিচয় অস্বীকার করা অত্যন্ত ইতিবাচক কাজ। কাগজ কলমে অহিন্দু না হতে পারলে ও আচার আচরণে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া কাম্য। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কোনও সুফল পাওয়া যাবে না। বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী দলাই দামার মতো নামেই বৌদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম তাদের মানবিক হতে দেয়নি। রোহিংগার মুসলমানরা তার শিকার। আধুনিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রয়োজন আছে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রথম যুগের গৌরবগাথাকে চিরস্মরণীয় করেছে। আজ আনন্দ-এর মতো হাজার হাজার যুবার প্রয়োজন যাঁরা বলতে পারেন— আত্মদীপ ভব (নিজের আলোকে আলোকিত হও)।

জীবনে মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি আসে যখন আনন্দ-এর মতো কেউ কেউ একা পড়ে যায়। পাশে দাঁড়ানোর মতো একজনও থাকে না। সবাই ঘিরে ধরে জোর করে কবুল করাতে চায়— বলো তুমি অপকর্ম করেছ ...

একেবারে একলা তবু কীসের জোরে আনন্দ এমন অচল অটল থাকতে পারলেন? নিজের কাজকে তিনি কিছুতেই ভুল বলে মানবেন না - চারশ নিরানব্বুই জন বললেই না। আবার সঙ্ঘ-র শৃঙ্খলাও তিনি ভাঙবেন না ...

আনন্দ জানতেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সত্যের উপরে, সমর্থন করার মতো একজনও নেই- তাতে কী এসে যায়? ... কেন মেয়েরা বুদ্ধের শরীর আগে বন্দনা করবেন না? কেন মেয়েরা ভিক্ষুণী হতে পারবেন না? বুদ্ধকে যাঁরা মানুষ করেছিলেন, তাঁর সেই মাসি, ধাই মা— কেন তাঁরা বঞ্চিত হবেন এই অধিকার থেকে?

সঙ্ঘ-র স্বার্থে বহু-র মত মানতেই হয়। কিন্তু উচিত তো আর তাই বলে অনুচিত হয়ে যায় না। আনন্দ জানতেন বহু-র মতকে আপাতত না মেনে নিলে সঙ্ঘ টিকবে না। তবু তাঁর মনে হয়েছিল, কথাটা বলা দরকার। (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য - চেতনা গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্মারক গ্রন্থ - ১৯৮৯-৯০)

বৌদ্ধ ইতিহাসে আনন্দ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র যিনি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন আমিই (একা) বিকল্প।

ব্রাহ্মণ কারা? জাতভেদব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুদ্ধ-এর এক অভিনব পন্থার কথা জানাই। বুদ্ধ-এর কাছে সোমদণ্ড নামের এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেশ কয়েকজন প্রজ্ঞাবান ব্রাহ্মণদের নিয়ে উপস্থিত হলেন।

বুদ্ধঃ– মহাশয়, কোন কোন গুণ থাকলে আমরা একজন পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলতে পারি?

সোমদত্তঃ– ১) মাতা ও পিতা দুজনেই সদ্‌বংশজাত হবেন ২) বেদাধ্যায়ী মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং বেদজ্ঞ হতে হবে, ৩) সুন্দর, সুপুরুষ, পরিচ্ছন্ন গাত্রত্বকযুক্ত হতে হবে, ৪) সদাশয় হতে হবে, ৫) যজ্ঞ-দক্ষিণা প্রাপকদের মধ্যে উচ্চস্থান থাকতে হবে,

বুদ্ধঃ– এই পাঁচটি শর্তের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিলেও চলবে?

সোমদত্তঃ– শরীরের রং টি কে বাদ দেওয়া যায়।

বুদ্ধঃ– আর একটি?

সোমদত্তঃ– মন্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে বাদ দেওয়া যায়

বুদ্ধঃ– আর একটি?

সোমদত্তঃ– উঁচু জাতটিকে বাদ দেওয়া যায়।

উপস্থিত ব্রাহ্মণরা চিৎকার শুরু করলেন। সোমদণ্ডের প্রতি তাঁরা বললেন, আপনি বর্ণকে বাতিল করলেন। বেদকে প্রত্যাখ্যান করলেন, জাতকে অস্বীকার করলেন, আমদের আর রইল কী?

বুদ্ধঃ– আপনাদের মধ্যে কেউ যদি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সোমদণ্ড-এর থেকে প্রজ্ঞাবান

থাকেন তিনি কথা বলুন।

সোমদত্তঃ– আমার ভাগ্নে আছে এখানে উপস্থিত ওর মধ্যে এই পাঁচটি গুণই আছে।

বুদ্ধঃ– এতো গুণ থাকলেও যদি অঙ্গদ অব্রাহ্মণকে ঘৃণা করেক, হিংসা করে, অন্যকে ঠকায়, মিথ্যাকথা বলে, তবে উচ্চকুল জাত হয়ে লাভ কী?

(সোমদত্ত সহ ব্রাহ্মণরা নতমুখে বসে রইল)

বুদ্ধঃ– তাহলে কি আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে জাত-বর্ণর তুচ্ছতাকে অস্বীকার করে গুণকে পরিবার/জন্মের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

[তর্কে পরাজিত ব্রাহ্মণগণ নিশ্চুপ রইলেন] (বুদ্ধ - রাহুল সাংকৃত্যায়ন)

১৯৫৬ সালের ২মে পার্লামেন্টে জনৈক মদন আম্বেদকরকে উদ্দেশ্য করে বলেন– ভগবান আপনার আত্মাকে রক্ষা করুন। আম্বেককর-এর চটজলদি জবাব ছিল– ‘‘আমার কোনও আত্মা নেই। আমার আত্মার শান্তি কামনার জন্য কারোরই প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। আমি ঈশ্বর মানি না। আত্মাকেও মানি না।’’ আজ কতজন আম্বেদকরবাদীকে পাওয়া যাবে যাঁরা আম্বেদকর-এর মতো নিজেদের নিরীশ্বরবাদী বলতে দ্বিধা করবেন না? বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে ভারতের গবেষকদের মধ্যে রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বলরাম মূর্তি, রাম বিলাশ শর্মা, মুলুকরাজ আনন্দ, কোসাম্বী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তো বটেই রিম ডেভিড্‌স, রবার্ট চামার্স, ইউজেন বুলুফ, এইচ. টি. কোলব্রুক বৌদ্ধ ইতিহাস চর্চায় সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছেন বস্তুবাদকে। বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রের করায়ত্ব হবার ফলে তার মধ্যে অবক্ষয়ের সম্পর্কে এঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই বারংবার আনন্দ-এর মতো দ্রোহী চরিত্রের সন্ধানে ছিলেন।

আজ যাঁরা বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি সামান্যতম আনুগত্য প্রকাশ করতে চান তাঁদের আনন্দ-এর সন্ধান করতে হবে। দলাই লামা বা পাড়ার স্বঘোষিত ‘মহাস্থবির’-এর ফাঁদে পড়লে গৌতম বুদ্ধ-এর বস্তুবাদী দর্শন ভাববাদী খাঁচায় ঢুকে শাসকশ্রেণির রক্ষাকবচে পরিণত হোতে বেশি সময় লাগবে না। যদি আজ গৌতম বুদ্ধ বা অন্তত আনন্দ-এর মতো। তাঁদের প্রকৃত অনুগামী থাকেন তবে তাঁকে রোহিংগার মুসলমান উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াতে হবে। ভাববাদী ‘ভগবান’ বা অবতাররা তাদের উপযুক্ত স্থানে থাকুক, গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থকে ওদের পাশে রাখা অনুচিত কাজ হবে।

—অন্যমনে

তুমি তো তেমন গৌরী নও

শঙ্খ ঘোষের কবিতার প্রতি ঋণ স্বীকার না করে এই প্রবন্ধ রচনা সঠিক কাজ হবে না। গৌরী (লঙ্কেশ)-এর সাথে আমার পরিচয় 'ডাফোড্যম' (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন ফোরাম অফ দলিত উওমেন অ্যান্ড মাইনরিটিস)-এর মহিশূর সম্মেলনে আমার ইংরেজি ভাষার ভাষণের অনুবাদ করেছিল গৌরী, কন্নড় ভাষায়। ক'দিন বাদে ওর নিমন্ত্রণে লঙ্কেশ পত্রিকার অফিসে দুপুরের খাওয়া আর আলোচনা বেশ জমেছিল। গৌরীর প্রশ্ন ছিল আমার কাছে– বাংলায় কি জাতভেদ আছে? ঘটনাচক্রে আমার কাছে একটি আনন্দবাজারের রবিবারের সংখ্যা ছিল। হিন্দু পত্রিকার চেন্নাই সংস্করণও ছিল। দুটি পত্রিকার 'পাত্র চাই, পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের ক্রোড়পত্র দেখিয়ে আমাকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমাণ করতে হল যে পশ্চিমবঙ্গে জাতভেদ আছে। সে সময় আমি কয়েকটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলাম যা পরেও বিভিন্ন লেখায়, সেমিনারের নিদর্ভে, বক্তৃতায়ও ব্যবহার করেছি যা এখন বহু গবেষকের কাজে লাগছে, যেমন– অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড কাস্টিজম, কাস্টিজম বিলো দ্য কার্পেট, হিডন কাস্টিজম ইত্যাদি। বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যেমন রক্তপাতযুক্ত হলে নাম হয় দাঙ্গা, রক্তপানহীন হলে তা বঞ্চনা, অবহেলা। তেমনই দলিত মহল্লা জ্বালিয়ে দেওয়া, দলিত হত্যা বা দলিত মহিলা ধর্ষণকে শুধুমাত্র জাতভেদ হিসেবে চিহ্নিত করা নিঃশব্দ অবহেলাভিত্তিক জাতভেদের তুলনায় সহজবোধ্য, সদা আলোচিত।

বিস্মিত গৌরী বলেছিল– এভাবে তো ভাবিনি কোনওদিন। জাতভেদ ব্যবস্থাকে তো নতুন দৃষ্টিতে কাটাছেঁড়া করা দরকার। গৌরীর বাবা শ্রীলঙ্কেশ সম্পর্কে একটু জানা দরকার। তাতে গৌরীর পারিবারিক পরম্পরাকে একটু বোঝা যায়। ছ'য়ের দশকের মধ্যভাগে সারাভারতে হাংরি জেনারেশন নামে একটি নতুন ধাঁচের সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়, ছ'য়ের দশকের শেষপ্রান্তে বাংলা সাহিত্যের হাংরি-রা আনন্দবাজারের গর্ভস্থ হয়।

অন্য রাজ্যের হাংরিরা দলিত, মার্কসবাদী, সমাজবাদী শিবিরের সাহিত্যচর্চায় যোগ দেন। গৌরীর পিতা এরকম একটি গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন। স্বচ্ছল পরিবারে জন্মেও

গৌরী বাল্যকাল থেকেই জনকল্যাণমুখী কাজকর্মে জড়িত থাকত, লেখাপড়ায় মেধাবী ছিল, প্রথাগত শিক্ষার বাইরের বই পড়ায় ওর কোনও বাছবিচার ছিল না। একদিন ওর বাবা শুনলেন যে গৌরী গর্কির লেখা *মা* পড়ে ভালো করে খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, স্কুলেও যাচ্ছে না। মেয়ের হাতে *দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন* বইটি তুলে দিলেন। বই পড়ার পর বাবার কাছে গৌরীর প্রশ্ন– এ দুনিয়ায় কি ভারতবর্ষ পড়ে না।? লংকেশ উত্তর দিয়েছিলেন– হজরত মহম্মদ বলেছিলেন– মজুরের ঘাম মাটিতে পড়ার আগে তার মজুরি দিতে হবে। খেতে বসার আগে খোঁজ নিও তোমার ঘরের চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ অনাহারে আছে কি না?

গৌরী-এর সরল স্বীকারোক্তিঃ– এরপর আমি হজরত মহম্মদ-এর প্রেমে পড়ে গেলাম। তাঁর জীবনী, কোরান, হাদিস পড়ে একটা গল্পও লিখে ফেললাম। আমার জীবনে প্রথম ছাপা রচনা। প্রচুর প্রশংসা এবং বিতর্কও হল গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে। বিষয়টা তেমন কিছু ছিল না তবুও আমার মতো এক কিশোরী হজরত মহম্মদ-এর কাছে প্রেম নিবেদন করছে আর একান্তে হজরদ মহম্মদ-এর স্ত্রীত্ব প্রার্থনা করছে, তা অনেকের কাছে বিস্ময়কর। গল্পটার জন্য আমি বিভিন্ন জায়গায় পুরস্কৃতও হয়েছি। তার চেয়ে আমার বড় পাওনা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেকটাই ওয়াকিবহাল হলাম যা পরবর্তীকালে আমার মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। গৌরী-এর বাবা আইনগত সাহায্য নিয়ে তাঁর পরিবারের সকলের পদবী লংকেশ রেখেছেন। এটা রামমনোহর লোহিয়ার জাতভেদ বিরোধী কর্মসূচির একটি পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে বিখ্যাত কবি হরবংশ রাই শ্রীবাস্তব তাঁর ছোট ছেলের 'ডাকনাম' বচ্চনকেই পারিবারিক পদবী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অমিতাভ বচ্চন অ্যান্ড কোং হরবংশ রাই শ্রীবাস্তব-এর পরের প্রজন্ম। বাবা মারা যাবার পর গৌরী সাংবাদিকতার দায়িত্বপালন করেও ইংরাজি ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকায় অতিথি লেখক হিসেবে পাঠককুলে সমাদৃত হয়। ওর সম্পাদিত পত্রিকার দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়। ১৬ পাতার পত্রিকায় চারপাতা জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতা ও ভাষাগত সমস্যা নিয়ে গবেষকদের রচনা অবশ্য মুদ্রিত হত। পত্রিকার প্রথম পাতার 'হেডিং সব সংখ্যায় চমকপ্রদ থাকত। উদাহরণ দেওয়া যাক। পাথর বাঁচাতে পারলে না দেব গৌড়াকে– এ শিরোনাম যে কোনও পাঠককে রচনাকে পড়তে বাধ্য করবে। প্রারম্ভিক অংশে ক্ষমতা অলিন্দে থাকার জন্য দেবগৌড়ার নানা কুকর্মর (দল ভাঙ্গা, উৎকোচ, প্রাণনাশের হুমকি ইত্যাদি) বর্ণনা, শেষ অংশটিই আসল কথা, দেবগৌড়া-এর হাতের আঙ্গুলে ১৬টি পাথরসহ কত দামী পাথর কে জানে। জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিশ্বাসী দেবগৌড়াকে 'গডম্যানদের' দেওয়া পাথর কোনও সাফল্য এনে দিতে পারেনি। অনেকেই বলেন, দাম্পত্যজীবনে ভাঙ্গন ধরার পর গৌরীর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রেম লংকেশ প্রকাশনা

সংস্থা। ঘটনা তা নয়। কর্ণাটকের খরাপীড়িত জেলা রাইচুরের অজগ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসে এক দলিত মহিলা গায়িকাকে ব্যাঙ্গালোরে এনে তাঁর (কোঞ্জাম্মা) গানের 'অ্যালবাম' তৈরি করা এবং তাঁকে জনপ্রিয় করা গৌরীর জীবনে এক অতুলনীয় কাজ। সারা দেশ জুড়ে অপারেশন গ্রিন হান্ট নাম দিয়ে আদিবাসীদের উপর যে নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে মিছিলে সংগঠক ছিল গৌরী। কর্ণাটকের কোথাও দলিতদের উপর নির্যাতন হলে, যা বাজারে দৈনিক কাগজে খবর হত না, তা নিখুঁত বর্ণনাসহ প্রকাশিত হত গৌরীর কাগজে। তার সম্পাদকীয় বা উত্তর সম্পাদকীয়তে থাকত আগুনের ফুলকি। ব্যাঙ্গালোরের বিনি কটন মিলস দীর্ঘদিন বন্ধ। জমি হাঙরদের নজরে পড়ে ২৫০জন শ্রমিকবস্তির বাসিন্দারা বিপন্ন। প্রাপ্য টাকা তো তারা পাননি তারপর ওই উচ্ছেদের আশঙ্কা। শ্রমিক পরিবারের সাথে বেশ কয়েকটি দলিত ও মানবাধিকার সংগঠনের ডাকে লাগাতার অনশনে বসলেন অনেকেই। পত্রিকার তৎকালীন সংখ্যার কাজ সেরে দ্বিতীয়দিন অনশনে বসলেন গৌরী। ১৫দিনের মাথায় রক্তবমি করতে করতে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সুস্থ হয়েই এই লড়াইয়ের রিপোর্ট লিখল গৌরী। ওর রচনার শিরোনামঃ- অনাহারে থাকা শ্রমিক পরিবারের অনশন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

নারীবাদ নিয়ে গৌরীর চিন্তাগত অবস্থান অনন্য। পশ্চিমী নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ, ভারতীয় নারীবাদের তুলনায় গৌরীর মতে ভারতের দলিত নারীবাদ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও সম্মিলনে গৌরী বলতঃ- আপনারা শ্রমজীবী মহিলা শব্দটির ব্যবহার বন্ধ করুন। মহিলা মাত্রই শ্রমজীবী। একই সাথে তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক যৌন হেনস্থার শিকার। এমনকি তা তাঁদের স্বামীদের দ্বারাও। ঘরে রান্না করা, ঘর পরিষ্কার রাখা, সন্তান জন্ম দেওয়া, সন্তানদের পালন করা সহ যতরকম গৃহশ্রম আছে তার সবটাই ভোগ করেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। গৌরীর এত ধরনের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড সংঘ পরিবারের পছন্দ ছিল না। বহুবার তাকে হুমকি শুনতে হয়েছে। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও সুফল না পাওয়াতে গৌরীর অসাধারণ সম্পাদকীয়- শাসক হইতে হইলে তোমাকে মূক হইলে হইবে না। কারণ বাচালতা তোমার ক্ষমতার চাবিকাঠি, দৃষ্টিহীন হইলে চলিবে না কারণ, শ্যেনদৃষ্টি তোমার অস্ত্র, বধির হইতে হইবেই কারণ জনতার কণ্ঠস্বর শোনা তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটাইবে।

ডাফোড্রাম-এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলনে (ইন্দোর - মধ্যপ্রদেশ) Brahmyanism is most modern form of facism in India today (আজকের ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদ হলো আধুনিকতম ফ্যাসিবাদের কাঠামোর দর্শন)। গৌরী এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে যা জানিয়েছিলেন তার নির্যাসঃ হিন্দু শব্দটি বয়সে নবীন। বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ্যবাদ-ই আসল শত্রু। এ অনেকটা ফল বা কয়েকরকম সব্জির মতো।

খোসাটা যতই চকচকে হোক না কেন আসল ভালো বা মন্দ রয়েছে খোলার নিচে। ব্রাহ্মণ্যবাদ-ই হিন্দুত্ববাদের প্রাণভোমরা। বেদান্ত প্রচারক বিবেকানন্দ যতই বলুন যে মুচি মেথর আমার ভাই, তা আসলে হিন্দুত্ব কাঠামোকে বৃহত্তর করার ষড়যন্ত্রজাত। ব্রাহ্মণ্যবাদের দাসত্ব করো কিন্তু হিন্দু থেকেই করো। হিন্দুত্ব ত্যাগ করা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে খুবই প্রাথমিক স্তরের বিদ্রোহ।

কর্ণাটকে লিঙ্গায়েত নামে একটি অবদমিত জনগোষ্ঠী আছে। তা অনেকটা অবিভক্ত বাংলার মতুয়া, বলাহারি, সাহেবধ্বনি, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মতো বেদবিরোধী এবং অব্রাহ্মণ্য। মতুয়াদের একাংশ নিজেদের আর হিন্দু বলতে চাইছেন না। যা অত্যন্ত ইতিবাচক পথ, তেমনই কর্ণাটকের লিঙ্গায়েতরা প্রায়শই মিছিল করে জানান দিচ্ছেনঃ- উই আর নো মোর হিন্দুস (আমরা আর হিন্দু নই)। গৌরী এদের সম্পর্কে নিজের পত্রিকায় তো বটেই এবং ইংরিজি পত্রিকাতেও সমর্থনসূচক রচনা ছাপতো। যার বেশিরভাগই গৌরীর নিজের লেখা। সংঘ পরিবার এরপর আর গৌরীকে খুন না করে অন্য কোনও পথে চুপ করাতে পারল না। প্রাথমিক পর্যায়ে গৌরীর ভাইয়ের সাথে বিরোধ, লংকেশ পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করার হুমকি, গৌরীর দাম্পত্য জীবন নিয়ে কুৎসা, সবই বিফল হয়েছে। যত আক্রমণ এসেছে গৌরীর দৃঢ়তা বেড়েছে তার বেশি। তসলিমা নাসরিনের রচনা সম্পর্কে গৌরীর মত– তসলিমার রচনা হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। তসলিমার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া– গৌরী মুসলিম তোষণকারিনী। তুমি বড় বলে কার মতো হতে চাও– এ প্রশ্নে ছাত্ররা স্কুলের ক্লাসে লিখেছে– আমি গৌরী আন্টির মতো সাহসী সাংবাদিক হতে চাই। নবীন কবি আনুহা বিশ্বনাথ গৌরীকে প্রেম নিবেদন করে কবিতা লিখছেন। তথ্যচিত্র নির্মাতা গোষ্ঠী পেডেস্ট্রিয়ান গৌরীকে নিয়ে তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন। শেষ যাত্রায় সর্বোচ্চ মাত্রায় পুলিশ পাহারার মধ্যে রাখলেও গৌরীর কমিউনিস্ট বন্ধুরা তার দেহে লাল পতাকা দিতে পেরেছিলেন। আম্বেদকরবাদী সাথীরা তার দেহের চারদিকে নীল পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিল।

একটু বড় ভুল হয়ে গেছে। অবাঞ্ছিত সরকারি হস্তক্ষেপ, নানারকম নিষেধাজ্ঞায় নিকটজন ভুলে গিয়েছিলেন যে গৌরী চেয়েছিল যে তার মৃতদেহ কোনও সরকারি হাসপাতালে দান করতে। ভুল তো হতেই পারে। গৌরী তো বিদেশে সুখী দাম্পত্যজীবন কাটাতে পারত, স্বদেশের দরিদ্র, দলিত, মহিলা, সংখ্যালঘুদের পক্ষে কলম চালানোটাও কারও কারও কাছে ভুল। আমার জীবনে গৌরী-এর মতো বন্ধুর স্মৃতি অমলিন থাকবে। আজ আমি কোনও হরিণ নয়না নারীর চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে বলতে পারি– তুমি তো তেমন গৌরী নও।

—পথসংকেত

প্রবাদ নিয়ে বিবাদ

ছড়াকে সাহিত্যচর্চার অন্তর্ভুক্ত করলেও প্রবাদকে লোকজন কথা চালাচালি বা লেখালেখির মধ্যে একটু অন্যধরনের (রান্নার মশলা) হিসেবেই ব্যবহার করেন। প্রবাদ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে, হচ্ছে। কেউ কেউ এর মধ্যে সমাজচিত্রের হাল হকিকত জানবার চেষ্টা করেন। কিন্তুপ্রবাদগুলি বহুদিন যাবৎ বহু লোকের মুখে মুখে ঘোরার পরও কে বা কারা এর রচয়িতা, সমাজের কোন স্তরের মানুষ এইগুলি আওড়ান, কেন এগুলি কারণে অকারণে ব্যবহৃত হয় তার খোঁজ নেওয়া হয়ে ওঠে না। এ রচনায় কয়েকটি প্রবাদ নিয়ে কথা চালাবো যা বাতিল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয়নি।

যার সঙ্গে মজে মন

কি বা হাঁড়ি কি বা ডোম

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জাতভেদ ব্যবস্থায় পুরুষ বা নারীর অন্য সম্প্রদায়ের কারুর সাথে প্রেম বা বিবাহ করার মান্যতার বিপক্ষে এই প্রবাদ। ইন্টারকাস্ট ম্যারেজের আইনি সম্মতি থাকলেও এতো 'খাপ পঞ্চায়েতের' ভিত্তি আখ্যান। 'ঝালে ঝোলে অম্বলে প্রগতিশীল বাঙালি' কি হরিয়ানা থেকে কিছু পিছিয়ে আছে?

বলরাম হাঁড়ি-এর মতো এক অবৈদিক, অব্রাহ্মণ্য লোকধর্মের প্রভাব কি অবিভক্ত বাংলায় বিলীন হয়ে গেছে? বলরাম হাঁড়ি বলেছিলেনঃ এখানে দান করিলে যদি স্বর্গে থাকা লোকের তৃপ্তি হয় তবে প্রসাদের ওপরে যাঁরা আছেন তাঁদের অন্ন এখানে দেওয়া হয় না কেন? (*বলাহাঁড়ি সম্প্রদায় এবং তাদের গান*– সুবীর চক্রবর্তী-কলকাতা-পুস্তক বিপণী-১৯৮৬)

আগে ছাড়ো বৈদিক বিধি

তবে মিলবে রত্ন নিধি– বলরাম হাঁড়ি

রবার্ট রেডফিল্ড-এর ভাষায় ছোট ঐতিহ্য (দি লিট্ল ট্র্যাডিশন)-এর এক মহাজ্ঞানী

বলরাম হাঁড়ি ১৮৩০ সালে ২০ হাজার অনুগামীদের নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। প্রায় ২০০ বছর বাদে বঙ্গ নবজাগরণের সন্তানদের কাছে হাঁড়ি ডোমরা আজও প্রেমের অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

বামুন গেল ঘর
লাংগল তুলে ধর

এই কয়েকটি শব্দে ক্লাস-কাস্ট সম্পর্ক বোঝা যায়। মাঠে কাজ করছেন অন্তত দু-জন কৃষিমজুর যাঁরা ব্রাহ্মণ নন। জমির মালিক ব্রাহ্মণ সম্ভবত ছাতা মাথায় দিয়ে সকাল থেকে মজুরদের 'ওয়ার্ক কালচার'-এর তদারকি করছিলেন। সূর্য মাথার ওপরে উঠলে ব্রাহ্মণ মালিক স্নান আহার দিবানিদ্রার জন্য বাড়িমুখো হলেন। ক্লান্ত চাষা এই ফাঁকে লাঙল টানা বন্ধ করে বিড়ি ধরাবার সুযোগ পেলেন। অনু গল্পটিকে কি কষ্টকল্পিত রচনা বলা যায়?

সোনার টুকরো সোনার চাঁদ
দেশকে করছে বরবাদ

১৯৪৭ সালের পর যে কয়েকটি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা সকলে জানেন তার মধ্যে কোনও এসসি বা এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি দেশকে বরবাদ করেছিলেন কি? মধু কোড়া বা শিবু সোরেনের নাম হয়তো আসতে পারে কিন্তু এঁরা চক্রের পাণ্ডা ছিলেন না। রামের বাহিনীর ক্ষুদে বাঁদর মাত্র।

চুরি-চামারি

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে নান্দীকার আয়োজিত নাট্যোৎসবে 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। পরিচালক শ্যামল চক্রবর্তী। নাটককার তীর্থঙ্কর চন্দ। নাটকের শেষে দর্শকাসন থেকে দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী চিৎকার করে পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতাদের অনুরোধ করলেনঃ- নাটকের এক দৃশ্যে চুরিচামারি শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে। চুরি নিশ্চয়ই অপরাধ কিন্তু চামারি একটি পেশা। চুরির সাথে চামারি জুড়ে দিলে একটি দলিত সম্প্রদায়কে অপমান করা হয়— বিবেচক ঘরানার পরিচালক নাটককার মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সমালোচনা মেনে নিয়ে পরের পালা থেকে 'চুরি-বাটপাড়ি' ব্যবহার করলেন। সংস্কৃতির দুনিয়ায় কজন এমন উদার? নাটক সিরিয়াল সিনেমা তো ভদ্দরলোকেদের মৃগয়াক্ষেত্র।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত

এখানে মোল্লার মানে মুফতি, মৌলানা, ইমাম শুধুমাত্র নয়, সমগ্র মুসলিম

সমাজকেই ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জনসংখ্যা ২৯ শতাংশ। কলকাতায় ১৯ শতাংশ। ধরে নেওয়া যায় মুসলিম মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন না তবে কলকাতার পুরুষ মুসলমানরা, যাঁদের সংখ্যা ২০ লক্ষের কিছু বেশি হবে, এই মানুষরা রোজ না হোক, শুক্রবার (জুম্মা বার) মসজিদের দিকে দৌড়বেন। কলকাতার ডিসি ট্রাফিক সি কে গুহ এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন যে, এই ২০লাখ মুসলমান যদি তাদের কর্মস্থান বা বাসস্থানের কাছের মসজিদে নামাজ পড়তে যান তবে মসজিদের বাইরের এতজনকে নামাজ পড়তে হবে তাতে প্রত্যেক শুক্রবার অন্তত একঘণ্টা কলকাতার জ্যামজট ছাড়ানো যাবে না। তবু সব 'মোল্লাদের' মসজিদ পর্যন্ত না-দৌড়নোর স্বপ্নটার কারণটা কী? পেশায় পুলিশ নেশায় কবি-গায়ক-তথ্যচিত্র নির্মাতা আয়ান রশিদ খান-এর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র সেভেন্থ্ ম্যান নিয়ে আলোচনা করা যায়। রশিদ খান দেখাচ্ছেন যে, কলকাতার প্রতি সাতজন নাগরিকের একজন (তথ্যচিত্র নির্মাণকালে) মুসলমানরা এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পেশার সাথে যুক্ত যে তারা সাতদিন শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ বন্ধ করে দিলে কলকাতা অচল হয়ে যাবে। রশিদ খানের মতোই আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে। বইটির শেষ পাতা ছাড়া যা লিখেছিলেন তা এককথায় অপাঠ্য। বেলেল্লাপনাকে কত নিম্নপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার বিবরণ যা তসলিমার লেখার সাথে মিলে যায়। কলকাতা কর্পোরেশনের একজন প্রাক্তন কর্মী সন্দীপন আত্মজীবনী অসাধারণভাবে শেষ করেছেন এই কথায়– গয়া আর বহরমপুর (গঞ্জাম) থেকে আগত কর্পোরেশনের সাফাই কর্মীরা যদি কলকাতা পরিষ্কার রাখার কাজ বন্ধ করে দেন তবে কফিহাউসে আঁতলামি, নন্দনে এ-মার্কা ফিল্মচর্চা, বাংলা অ্যাকাডেমিতে ন্যাকা কবিদের ভিড়, মন্ত্রীসভায় কোঁদল, নটুয়াদের কৃত্রিম কণ্ঠস্বর, ময়দানে গোপন প্রেম, লালবাজারের তোলাবাজী, ইস্টমোহনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কেরানিদের ডি.এ. বাড়ানোর দাবীমিছিল, পার্ক স্ট্রিটে ইংলিশ পানীয় সেরেফ ভোগে যাবে।

সেদিন স্তালিন

প্রুদোমস্কিভিচ

ভাষান্তর- রুশ-ইংরাজি-বিজয় সিং, ভাষান্তর- ইংরাজি-বাংলা-অনন্ত আচার্য

আমি তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে কর্মরত। মাতৃভাষা রুশ ছাড়াও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির ভাষাগুলি জানি। ইংরাজি সহ ইউরোপের আরও কয়েকটি ভাষা ও অল্পবিস্তর শিখে নিয়েছি। কর্ম দফ্‌তরে অনুবাদকের কাজ ছাড়াও আমাকে দোভাষীর কাজ করতে হতো। স্তালিন-এর সাথে তাঁর অতিথিদের বাক্যালাপের সময় আমাকে দোভাষীর কাজ করতে হয়েছে। মুখে না বললেও স্তালিন তাঁর আচার ব্যবহারে আমাকে পছন্দ করতেন ব'লে আমার মনে হতো। একটি দিনের অভিজ্ঞতা জানাই– দফতরে খবর এল যে আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, ইউক্রেন, জর্জিয়া থেকে বেশ কয়েকজন মুসলমান ধর্মগুরু স্তালিন-এর সাথে দেখা করতে আসছেন– তারিখটা আমার দিনপঞ্জি অনুসারে ২৭ জুন, ১৯২৬। স্তালিন অতিথিদের সাথে নৈশভোজেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নৈশভোজের আগে আলোচনা হবার কথা। নির্দিষ্ট সময়ে অতিথিরা স্তালিন-এর অফিসঘরে উপস্থিত হলেন। সংখ্যায় তাঁরা ১১জন। স্তালিন উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সাথে করমর্দন করলেন এবং পরিচয় বিনিময় হল।

এরপর প্রতিনিধিদের কথা বিনিময় শুরু হল। প্রতিনিধিদলের নেতাঃ– প্রথমেই আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে বর্তমান সোভিয়েত সরকার আমাদের অংগরাজ্যগুলির ছাত্রদের মাতৃভাষায় পড়বার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে অনেকের আশংকা ছিল যে আমাদের উপর রুশ ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।

স্তালিনঃ– আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার কথাই ওঠে না। এরজন্য আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত সরকারের পরিকল্পনা মাফিক ওই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সত্যি কথা বললে এই বলতে হবে যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আমার সংশয় ছিল এইরকম যে আমাদের রুশ কমরেডরা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। ধন্যবাদ প্রাপ্য তাঁদের। আমার নয়।

প্রতিনিধি ২য়ঃ– এই আলোচনার সময় এবং নৈশভোজের আমন্ত্রণ আমাদের কিছুটা বিস্মিত করেছে।

স্তালিনঃ– (অফিসের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আমার যদি ভুল না হয় আপনাদের

এখন থেকে ৪৫মিঃ আগে আজকের শেষ পর্বের প্রার্থনা (নামাজ-অনুবাদ -লেখক) করার কথা। আজকের আলোচনা কত সময় নেবে তার ধারণা আমার ছিল না। আপনাদের সাথে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করলে আমি আনন্দই পাব। তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে খাদ্য তালিকায় মাংসের ব্যবস্থা করা হয়নি কারণ মাংসের পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে আপনাদের সংশয় থাকতে পারে। ভদ্‌কা (মদ) পানীয় তালিকায় স্থান হয়নি। রুটি সহযোগে শাক-সবজি, আলু ও ডিমের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রতিনিধিদলের নেতাঃ– সত্যি আমরা বিস্মিত হচ্ছি। কিছু মনে করবেন না আমরা স্তালিন সম্পর্কে যা শুনি তাঁর সাথে আপনার আজকের আচরণ মিলছে না।

স্তালিনঃ– (হাস্য সহকারে) ঘটনা সময় আমাকেও পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে। এর জন্য আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের কাছে ঋণী। মূল আলোচনায় আসা যাক।

প্রতিনিধি নেতাঃ– জারের আমলের তুলনায় এখন অনেক বদলে গেছে। আমাদের রাজ্যগুলিতে বিলাসী ধনীদের দেখতে পাই না। অনাহারে জর্জরিত মানুষ একজনও নেই। আমাদের যা আয় তাতে আমরা খুশি। তবে সঞ্চয়ের কোনও উপায়ও নেই। 'হজের' সময় মক্কা-মদিনায় পুণ্যার্থে ভ্রমণের সময় আমরা সরকারি অনুদান পেতাম। এখন তা বন্ধ হয়েছে। আপনি যদি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করেন তবে তা বহু মানুষের শুভেচ্ছা আপনি পাবেন।

স্তালিনঃ– আমাদের দেশে ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। তার অর্থ– কোনও নাগরিক তার পছন্দমতো ধর্ম পালন করতে পারবে। যদি কোনও নাগরিক পারিবারিক ধর্ম পালনে আগ্রহ না দেখান সরকার তাঁকে অসুবিধায় ফেলবে না। রাষ্ট্র ও ধর্মের পথের মধ্যে কোনওটাই একটি অন্যটির উপর প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাতে পারবে না। ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ না হলেও বৈরিতামূলক নয়।

প্রতিনিধি ২ঃ– অনেক দূর থেকে আপনার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছি। আমাদের আবেদনপত্রে সব লেখা আছে।

স্তালিনঃ– দুদিন আগে আপনাদের আবেদনপত্র পড়ার সময় পেয়েছি। ইতিমধ্যে আমি আপনাদের দফতরের লাইব্রেরি থেকে বেশ কিছু ইসলামী গ্রন্থ পড়ে নিয়েছি। এর বেশ কয়েকটি আমি জর্জিয়া থাকাকালীন পড়েছিলাম। হজরত মহম্মদ আমার কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কারক। আপনাদের আবেদনপত্রে আমার মতামত লিখে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাবো। সকলের মতামত সোভিয়েত সরকারের কাছে শীঘ্রই পৌঁছবে। সরকারি সিদ্ধান্ত আপনাদের কাছে পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না।

প্রতিনিধিদলের নেতাঃ– অসুবিধা না থাকলে আপনার মতামত যদি এখন জানান।

স্তালিনঃ– (চেয়ারের পেছনে রাখা বই-এর স্তূপের মধ্যে তিনটি বই বের করলেন।) এই তিনটি ধর্মীয় পুস্তক সম্পর্কে আপনাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। এর মধ্যে কিছু নির্দেশ বা উপদেশ আমার নজরে পড়েছে। আপনারা প্রথম বইটির ৪৭নং পাতার নিম্নাংশে, ২য় বইটির ১৩নং পাতার মধ্যাংশে এবং ৩য় বইটির ১১৮ পাতার পুরো অংশই পড়ে দেখুন। আমি ইতিমধ্যে নৈশভোজের প্রস্তুতিপর্ব পর্যবেক্ষণ করে আসি।

[প্রতিনিধিরা বইগুলির নির্দিষ্ট অংশ পড়ে কিছুটা বিমর্ষ হলেন। স্তালিন ঘরে প্রবেশ করলেন]

স্তালিনঃ– আমার ইসলাম চর্চা দুর্বল। তুলনায় আপনারা এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এম এম সাইক্যাল-এর লেখা এই বহুল প্রচারিত গবেষণাধর্মী বই তিনটির (ইসলাম উইথ ডিফারেন্ট মেথড-- এম এম সাইক্যাল, নেও পাবলিসার্স-ইস্তানবুল-১৯০৯) বিরুদ্ধে কোনও ইসলামজ্ঞ সমালোচনা বা বিরোধ করেননি। বহু ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পরও কেউই সাইক্যাল-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। বই তিনটির যে অংশটুকু আজকের আলোচ্য এবং বিবেচ্য বিষয় তা হল, স্বউপার্জিত এবং সদুপায়ে অর্জিত অর্থে পূণ্যস্থানে ভ্রমণ না করিলে পূণ্যার্জন হবে না। একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এ ধরনের যাত্রাখরচ বাবদ অনুদান দেওয়া উচিত কাজ হবে না। তার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, কোনও পূণ্যার্থীও এ ধরনের অনুদান নিয়ে মক্কা মদিনা গেলেও পূণ্য অর্জন করতে পারবেন না। আমি নিশ্চিত যে আপনাদের কাছে অনেক ইসলামী ধর্মগ্রন্থ আছে। যদি আপনারা সাইক্যাল-এর এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য কোনও মত কোনও প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থে পান তবে আগামী জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে আমার সাথে দেখা করে বইগুলি আমাকে দেবেন। আমি আমার মত পরিবর্তন ক'রে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আপনাদের আবেদনের পক্ষে সওয়াল করব। আজকের আলোচনা নিস্ফল ভেবে নৈশভোজের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাবে না। চলুন আমাদের অন্য কমরেডরা আপনাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছেন।

প্রতিনিধি দলের নেতাঃ– আলোচনার ফল যাই হোক এটি আমাদের সকলের কাছে বিস্ময়কর যে আপনি ইসলাম সম্পর্কে এতটা আগ্রহ দেখাবার সময় পান কী করে?

স্তালিনঃ– বেশ কিছু মার্কিন-ব্রিটিশ সংবাদপত্র আমাদের দেশে নাস্তিক-আস্তিকদের দাংগা বাধাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে নাস্তিক হলেও লেনিন-এর শিক্ষানুসারে আস্তিকদের সাথে বন্ধুত্বমূলক বিতর্ক চালাতে পছন্দ করি। আস্তিকতার পরম্পরা বহুকাল যাবৎ। নাস্তিকতা এখনো কৈশোর পার হয়নি। ধর্ম আর্তের আত্ম র্তনাদ, অনাহারের সহায়, নিপীড়িতের দীর্ঘনিশ্বাস– এ কথা যিনি লিখেছিলেন তিনি অনেক দূরদর্শী।

—কবিমন - শরৎ সংখ্যা - ১৯৭৯

বদল

রেজাউল-এর জীবনটা বড়ই বৈচিত্রময়। সেই কোন ছোটবেলায় বাঁকুড়ার অজগ্রাম থেকে টেনিয়া (শিশুশ্রমিক) হয়ে কলকাতায় এসেছিল। কার রিপেয়ারিং শপে কাজও জুটেছিল। খাওয়া থাকা বিনা খরচে, মাঝে মধ্যে দেশের বাড়িতে কয়েকদিনের ছুটিতে গেলে মালিক ৫/১০ টাকা হাতে গুঁজে দিত। আজ রেজাউল কার রিপেয়ারিং কাজে মস্ত বড় ওস্তাদ। লোকজন বলেঃ– রেজাউল-এর হাতে পড়লে ঠ্যালাগাড়ি এরোপ্লেনের মতো উড়বে। ছোটবেলায় যেখানে কাজে ঢুকেছিলো এখনও সে সেখানেই কাজ করে। কারখানা বড় হয়েছে। মালিক মুখে না বললেও সবই রেজাউল-এর কল্যাণে। কাস্টমাররা মালিককে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে– রেজাউল ফাঁকা আছে তো? ইতিমধ্যে রেজাউল বিয়ে করেছে। দুটি সন্তান। বেনিয়াপুকুরে মাথা গোঁজার জন্য দুটো ঘর কিনেছে। রেজাউল ধর্মভীরু মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দাখিল করে, রোজা রাখে, 'হজ' ক'রতে যাবার ইচ্ছাও আছে। মইনুদ্দিন রেজাউল-এর প্রতিবেশী, বন্ধুও বলা চলে। মুসলিমপ্রধান ওই আধা বস্তিতে থেকেও মইনুদ্দিন রোজা নামাজের ধারে কাছে যায় না। পাড়ার কমবয়সী ছেলেমেয়েদের বিনা পারিশ্রমিকে অংক-ইংরাজি পড়ায়। একদিন রাতের বেলায় রেজাউল যখন কাজ সেরে ঘরে ফিরছে তখন রাস্তায় মইনুদ্দিন-এর সাথে দেখা। মইনুদ্দিন-এর প্রশ্নঃ– এত রাত পর্যন্ত কাজ করছো কেন? এমনিতে তোমার ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার হাই, তারপরও কেন এত কাজের চাপ নিচ্ছ? রেজাউল-এর উত্তরঃ– সামনে রোজার মাস। খরচ আছে। হাতে কিছু টাকা না থাকলে চ'লবে কী করে? মইনুদ্দিন-এর কথায় ''রোজা কেন চালু হয়েছিল জানো? মরুভূমিপ্রধান মধ্যপ্রাচ্যে খাদ্যসঞ্চয় বাড়াতে একবেলা উপবাসের উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছিল। ধর্মগ্রন্থ এও বলছেঃ- দরিদ্রদের অনাহারে থাকার শারীরিক কষ্ট উপলব্ধি করার জন্যও এই রোজার প্রচলন। এখন দেখছি রোজার মাসে দিনে তিনবার ভরপেট খাওয়া। অযথা খাদ্য, অর্থব্যয়।'' বুদ্ধিমান রেজাউল সব কথা শুনেও সেবার রোজা রেখেছিল। ক'দিন বাদে নার্সিংহোম রেজাউলকে দেখতে গিয়ে চিকিৎসকের (তিনিও মুসলমান) ধমক শুনতে হলঃ– কোন্ ধর্মগ্রন্থে অসুস্থ থাকা সত্বেও রোজা

রাখার বাধ্যতামূলক নির্দেশ আছে তা রোগী এবং তাঁর নিকটজনের কাছে জানতে চাই।

রেজাউল-এর কোন হেলদোল বোঝা গেল না। কুরবানী বা বকরি ইদের ৩/৪দিন বাদে কোনো একটা কাজে মইনুদ্দিন রেজাউল-এর ঘরে গেল। সাবিনা, রেজাউল-এর বউ, ওকে কুরবানীর গোস্ত আর পরোটা দিল। মইনুদ্দিন-এর সাফ কথাঃ— আমি তো এসব বাসি গোস্ত খাব না। তোমরা খেতে চাইলে খাও কিন্তু বাচ্ছাদের একদম দেবে না। গোসলখানা থেকে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বেরোবার মুখে রেজাউল-এর জবাব— দ্যাখো মাস্টার, সব ব্যাপারে মাথা গলিও না। ইদের গোস্ত পাক (পবিত্র)। নষ্ট হয় না।

পরের দিন স্কুলে মইনুদ্দিন দুঃসংবাদটি পেলো। বেলেঘাটা আই.ডি. হসপিটালে রেজাউল-এর ছেলের দেহটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। কাঁদতে কাঁদতে মইনুদ্দিনকে জানাল সাবিনাঃ— ভাইজান, তোমার কথা না মেনে আমাদের এই সর্বনাশ হোল। এরপর রেজাউল একটু একটু করে বদলাতে লাগলো। পাড়ায় পোলিও খাওয়াতে আসা সরকারি কর্মীদের সহায়তা করল। কোনও এক মসজিদের ইমাম, জেহাদ ছাড়া আর কোন কারণে রক্তদান, নাজায়েস ব'লে বেড়াতো। রেজাউল-মইনুদ্দিনের উদ্যোগে পাড়ায় রক্তদান শিবির বসলো, এবং সফলতা পেলো। দিন এগোয়, মইনুদ্দিন রেজাউল-এর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ধর্মাচরণের কোনও কথা উঠলে রেজাউলের সাফ জবাব— দ্যাখো বাপু, আমি তোমাদের মতো 'বইপত্তর' পড়ার সুযোগ পাইনি। 'টিপ সই' পার্টি বোলতে পারো। ইমাম-মুফতি-মৌলানারা যা বলেন তা তাঁদের বিশ্বাস-ভক্তি থেকে বলেন, তুমি যা বলো তাতে যুক্তি থাকে। বিজ্ঞানের কথাও থাকে। তোমাদের দুপক্ষের কথা উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। মানুষের কল্যাণে যা করার দরকার সে আমি বুঝতে পারি। নিজে লেখাপড়া শিখতে পারিনি তাই নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া আমাদের বাঁকুড়ার গ্রামের দুটো বাচ্চার পড়াশুনা-পোষাক-খাওয়া খরচ প্রতি মাসে পাঠাই। ওদের একজন মুসলমান, একজন আদিবাসী। এর বেশি আমার কাছে আশা কোর না। কদিন বাদে আবার এক দুঃসংবাদ। আরজিকর হাসপাতালে মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সাবিনার কথাঃ— কাল রাতে ও বুকে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হোল। আমাকে আর আমার ভাইকে বলেছিলঃ- মরে গেলে মাটি দিও না। মর্গে জমা দিয়ে দিয়ো। শুনেছিলাম কাঁটাছেড়া কোরলে ভালো ডাক্তারি শেখা যায়। মর্গের বাইরে রেজাউল-এর প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের ভীড়। সবারই এক প্রশ্ন, এরকম হয় নাকি? রেজাউল-এর শরীরের উপর থেকে সাদা কাপড়টা তুলতেই মইনুদ্দিনের মনে হল রেজাউল বলছেঃ- মাস্টার, তোমায় হারিয়ে দিলাম।

—অরিত্র - শরৎ সংখ্যা - ১৯৯৯

উত্তর আধুনিক শাখামৃগ

প্রাচীন দুনিয়ায় বনাঞ্চল বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে ছিল। শাখামৃগদের একাংশ শিম্পাঞ্জী হল। শিম্পাঞ্জীদের একাংশ হোমো স্যাপিয়েন্স। সব শাখামৃগ হোমো স্যাপিয়েন্স একই সময়ে হয়েছিল তা নয়। এ হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যে শাখামৃগরা হোমো স্যাপিয়েন্স হোতে পারেনি, তারা গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে লম্ফঝম্প কোরে দিন কাটাতো। শাখামৃগরা হোমো স্যাপিয়েন্সদের দুর্বোধ্য 'কিচিরমিচির' ভাষায় কথাবার্তা চালাতো। উচ্চস্থানে বসার কারণে পথচলতি হোমো স্যাপিয়েন্সদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাতো। ওই শাখামৃগদের একাংশ প্রকৃতির নিয়ম মেনে পরিবর্তীকালে হোমো স্যাপিয়েন্স হোলেও পূর্ব প্রজন্মের আচার আচরণ ভোলেনি। প্রাক্তন শাখামৃগরা যারা উত্তর আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্স হোল তাদের নিয়েই এই রচনা।

উত্তর আধুনিকতাবাদী হোমো স্যাপিয়েন্স (মানবাকৃতি দেহধারী প্রাণী) দের বিষয়ে লিখতে গিয়েই সাতকাহন জানাবার প্রয়োজন ছিল। একটু অন্য দিক দিয়ে বিষয়টিকে ধরা যাক। মার্কিন সরকার তখন ইরাক-আফগানিস্তানে ব্যাপক বোমা ফেলে চলেছে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ নোম্ চমস্কি শিক্ষাজগতের দুনিয়ার (অ্যাকাডেমিক ওয়ার্লড) ২০ হাজার বিদ্বজনের কাছে একটি আবেদনপত্রে সাক্ষরের জন্য পাঠান। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধানের কাছে আবেদনপত্রটি নেহাতই সরলপ্রকৃতির ছিল। মুল কথাঃ– ইরাক, আফগানিস্তানের বাসিন্দাদের বাঁচার অধিকার টিকে থাকা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে গণহত্যার বন্ধের প্রচেষ্টা না থাকলে রাষ্ট্রপুঞ্জ তার সদস্য দেশের নাগরিকদের আস্থা হারাবে।

বাংলাদেশের মহঃ ইউনুস এই আবেদনপত্রে সাক্ষর করেননি। কারণ অনুমান করা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপারঃ– অমর্ত্য সেনও নীরব নিষ্ক্রিয় থাকেন। চমস্কি-এর উদ্যোগে সাড়া দেওয়া শিক্ষাবিদের অভাব হয়নি। কিন্তু সারা পৃথিবীর জনমত বিপক্ষে গেলেও মার্কিন শাষকদের বিন্দুমাত্র হেলদোল হয় না। এরকম সময়ে (৭

জুলাই, ২০০৩) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়াবাসী ছাত্রছাত্রীরা ২দিনের আলোচনা সভার উদ্যোগ নেয়। শিরোনাম— ওয়ার অর পিস। নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘর ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করে। নিরুপায় অয়োজকরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের বাইরে সভার ব্যবস্থা করে। সব আলোচকদের বক্তব্য নিয়ে পরে লেখা যাবে। এখানে চারজন বঙ্গ সন্তানের 'উপদেশামৃত' নিয়ে আলোচনা করবো। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত কবিরাজদের নিয়ে কথা বলা যাক। যাঁরা এদের পরিচয় জানেন না (না জানলে মাথায় বাজ পড়বে না) তাদের জানাই, এদের পরিচিতির প্রথম পর্বে এরা রণজিত গুহ-এর সাব-অলটার্ন স্টাডিজ চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রবীণ অধ্যাপক রণজিত গুহ-এর গবেষণা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সুকুমারী ভট্টাচার্য-এর মতো দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে/হচ্ছে অধ্যাপক গুহকে। জাত-ভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সুকুমারী ভট্টাচার্য-এর কলম চলত তরবারীর মতো। অথচ তাঁর কাছে পি.এইচ.ডি.-র ডিগ্রি আদায়ের পাঠ নিয়েছে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, যাকে বিনা দ্বিধায় নরমপন্থী হিন্দু বললে অপরাধ হবে না। গায়ত্রী, দীপেশ, পার্থ, সুদীপ্তদের মতো উত্তর আধুনিকতাবাদীরা এদের গুরুদেব দেরিদা-এর অনুকরণে দুর্বোধ্য 'কিচির মিচির' ভাষায় লেখে, বলে, ভাবে পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হোলেই রচনা বা ভাষণ কালোত্তীর্ণ কাজ হয়ে উঠবে। এতো প্রাক আধুনিক, প্রাক হোমো স্যাপিয়েন্স পর্বের ভাবনা। আজ সকালের কোন মতামত পরের দিন বিকালে বদলে যেতে পারে কিন্তু না বদলালে তো জ্ঞান গরিমা প্রচারের সুযোগ ঘটে না। এই তো শাখামৃগদের এক গাছের ডাল থেকে আর এক গাছের ডালে লাফ মারা বা একই সাথে ২/৩ নৌকায় পা রেখে চলার চেষ্টা। এ সব 'হ্যাজানো' রচনা গৃহে সমৃদ্ধি ও গৃহের বাইরে পরিচিতি বাড়াতে সাহায্য করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকটা কমলকুমার মজুমদার-এর রচনার মতো। পাঠক বুঝলে ভালো, বুঝতে পারলো না তা আরও ভালো। সাব অলটার্ন স্টাডিজ সম্পর্কে দু-একটা কথা বোলে নেওয়া ভালো। ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর ইংল্যান্ডের পত্র পত্রিকায় সাব অলটার্ন শব্দটি মুদ্রিত হয়। অভিধানের পাতায় এর অর্থ নিম্নস্তরের কর্মী। ব্রিটিশ শাসকের মতে সিপাহিরা সাব অলটার্ন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ শব্দটি ঢুকে পড়ে আন্তোনিও গ্রামসি-এর *প্রিজন নোটবুক*-এর কল্যাণে। জেলখানার কুঠুরি থেকে নিরাপত্তার কারণেই গ্রামসি মার্কসীয় ঘরানায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে এড়িয়ে অন্য শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। মার্জিন শব্দটি আর একটি নমুনা। এখন সমস্যা হোলঃ— সাব অলটার্ন, মার্জিন শব্দগুলিকে সর্বহারা, শোষিতশ্রেণির বিপরিতার্থে ব্যবহারের শয়তানিতে নামে দেরিদা অ্যান্ড

কোং। এদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন যাঁরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হবে।

১) আলেক্স ক্যাল্লি নিকোন– এগেনস্ট পোস্ট মর্ডানিজমঃ এ মার্ক্সিস্ট ক্রিটিক - কেম্ব্রিজ-পোলিটি প্রেস, ১৯৮৯

২) মার্ক্সিজম অ্যান্ড দ্য পোস্ট মডার্ন এজেন্ডা- মান্থলি রিভিউ-ভল্যুম-৪৭-নং ৩-জুলাই-আগস্ট-১৯৯৫

৩) অ্যালান সোকাল অ্যান্ড জিজাঁ ব্রিকমঁ– ফ্যাসনেব্‌ল ননসেন্স-পোস্ট মডার্ন ইনটেলেকচুয়াল'স অ্যাবিউস অফ্ সায়েন্স। নিউ ইয়র্ক-পিকাডর-১৯৯৮।

৪) রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-- পোস্ট মডার্নিজম আনমাস্কড-ভারতীয় সামাজিক চিন্তন-ভল্যুম-১, নং-৪, জানুয়ারি ২০০৩

৫) রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য– ওরে বর্ণচোরা ঠাকুর এলো।

উত্তর আধুনিক এইসব শাখামৃগদের ধরা বেশ কঠিন কাজ। শাখামৃগরা যেমন এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডালে লাফ মেরে পালায় বা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর কথায় পাঁকাল মাছের মতো ধরা দিতে চায় না, তেমনই উত্তর আধুনিকতাবাদীরা বিপদ বুঝলেই বলেঃ– আমরা তো আর উত্তর আধুনিকতাবাদী নই। আমরা উত্তর গঠনমূলবাদী বা উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। শিকাগোর যুদ্ধ অথবা শান্তি বিষয়ক আলোচনা সভায় দেরিদা-এর চ্যালাদের কুকর্ম জানানোর আগে কমলকুমার মজুমদার-এর মতোই রচনায় অভ্যস্থ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-এর (সংবাদ প্রতিদিন, ১১/৯/২০১৩) দেরিদা বন্দনা শোনা যাকঃ- দেরিদা প্রথানুগত ভাষায় কোনও সরল তত্ত্বোপদেশ দিলেন না, এমনকি সরাসরি যুদ্ধাপরাধী ইয়াংকিদের আক্রমণ ক'রে একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। শুধু এক জায়গায় ডোনাল্ড রামসফেল্ডের গর্হিত একটি উচ্চারণের গুরোল্লেখ বাহিরে বলে উঠলেনঃ ''আমরা তো সেকেলে ইউরোপেই, তাতে কী হয়েছে''।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখছেনঃ আমরা (যারা অলোকরঞ্জন-এর ভাষায় অদীক্ষিত) বুঝিঃ– সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে হলে সেটা বলতে হয়, স্পষ্ট ভাষায়। না বোঝা বা কোনও ভুল-বোঝার অবকাশ না থাকে। শিকাগো সম্মিলনে কী ধরনের কেচ্ছা হোয়েছে তা জানা যায় www.asa.chik.info এ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে উত্তর আধুনিক শাখামৃগদের মধ্যে চার বঙ্গসন্তানদের বক্তব্য জানা যাক। আগ্রহীরা ওয়েবসাইটটায় যেতে পারেন। গায়ত্রী বলেনঃ- শিক্ষায়তনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মধ্যে বিশ্ব রাজনীতির চর্চা করা যায়। কিন্তু অ্যাকডেমিকরা তো অ্যাকটিভিস্ট হোলে চলবে না। এ সবে জড়িয়ে পড়লে অভিভাবকদের দুঃশ্চিন্তা বাড়বে।

পার্থ-এর কথাঃ এসব মার্কিন সরকারের সাথে অন্য দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির ফল। পররাষ্ট্রনীতি শিক্ষাক্রমে অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু তা শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশ করার জন্য। আমরা বড় জোর মানুষের মধ্যে হিংস্রতা কীভাবে কমানো যায় তার চেষ্টা করা উচিত।

সুদীপ্ত কবিরাজ-এর বক্তব্যঃ— সারা পৃথিবীর মানুষ শান্তি ও গণতন্ত্রের আঙ্ক বহাওয়ায় দিন কাটাতে চায়। কিন্তু কারণে অকারণে মার্কিন সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপানো অনুচিত কাজ।

দীপেশ-এর বক্তব্য সহজবোধ্যঃ— আমি আর পার্থ কোলকাতায় ছাত্রজীবনে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছি। কিন্তু সময় বদলেছে। পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরে জানতে পেরেছি যে একমাত্র আমেরিকায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশ বা মুসলমান প্রধান দেশগুলির শাসকরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধার ধারে না। কেউ কেউ মার্কস-এর বা হজরত মহম্মদ-এর নাম উচ্চারণ করতে করতে ভিন্নস্বরকে উচ্চারিত হোতে দেয় না। ক্ষমতার অপব্যবহারের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা জোসেফ স্তালিন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কাজে এখনো কোনও দেশের সরকার এগিয়ে আসেনি। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে হোলে দেরিদা-এর সাথে সংলাপ চালাতেই হবে।

অন্তিমপর্বে জানাই— দেরিদা-এর হাত ধরে যখন কোথাও যাওয়া যায় না বরং কোথাও পৌঁছতে দেরিদারও ইচ্ছা নয় তখন এতো বাজে বকা বা হিজিবিজি লেখা বা বলার দরকার কী? এসব ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কথা ১৯২৫ সাল থেকে বলা হচ্ছে। সবই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ছিদ্রান্বেষণের অপচেষ্টা।

সার কথা বলে দীপেশ তো নিজের বর্ণচোরা চেহারা বা শাখামৃগর আচরণ পরিষ্কার করে দিয়েছে। এজাজ আহমদ-এর *ইন থিওরি* বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে নীট্‌শেকে এ যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আখ্যা দিয়েছে। কে না জানে নীট্‌শে ছিলেন নাৎসিবাদের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যক্তি। সুদীপ্ত ভেবেছিল হাইডেগ্‌গার-এর নাম অনেকই জানেন না বা ভুলে গেছেন। ফলে তাঁর হাইডেগ্‌গার ভজনা মিশেল ফুকোকেও ছাড়িয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর অনুবীক্ষণ যন্ত্রে হাইডেগ্‌গার-এর নাৎসী দলের সদস্য কার্ড নং (৩১২৮৫১৯) পর্যন্ত ধরা পড়েছে। অতএব আমরা বরং ডারউইন-এর সাথে কথাবার্তা বলে এদের হোমো স্যাপিয়েন্স থেকে বিপরীতমুখী যাত্রাপথে পাঠিয়ে শাখামৃগদের দলে ভিড়িয়ে দিই। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে সুন্দর, শাখামৃগরা বৃক্ষশাখায়।

—তরাই-ডুয়ার্স - শরৎ সংখ্যা - ২০১৭

স্বামী মোহিতানন্দ মহারাজ সমীপেষু

(লেখক পরিচিতিঃ লেখক নিয়মিত গঞ্জিকা সেবন করেন। নেশার প্রভাবে তিনি নিজের সাথেই অসংলগ্ন কথাবার্তা চালান। নেশার প্রভাব কাটলে প্রায় স্বাভাবিক কথা বলেন। তাঁর একক প্রলাপ এবং আলাপ মুদ্রিত হল)

মহারাজ,

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি-বিস্ফোরণে আপনার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মতামতে বড়ই বিস্মিত বোধ করছি। পর্বান্তর এবং দেশকাল পত্রিকা বহুস্বরবাদে বিশ্বাস করে, ফলে ঐসব পত্রিকায় আপনার রচনা স্থান পায়। ঐসব পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী বড়ই উদার। উহারা বহুস্বর শুনিবার এবং শোনাইবার জন্য গুজরাট গণহত্যাকারী বা বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের মধ্য থেকে কোনো একজন লেখককে বাছাই করে আপনার রচনা প্রকাশ করলেন কেন?

রবিবার সকালে মাছের বাজারে চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক টুকরো বন্দীশ খুঁজতে পারেন। একটি খাঁচার মধ্যে কাক, চিল, কোকিল, ঘুঘু, শকুন ইত্যাদি প্রাণীকে আটকাইয়া রাখিয়া যদি তাদের সমবেত কণ্ঠস্বর হইতে কেউ (উত্তর) আধুনিক গানের সুর বাঁধতে চায় তাতে আপত্তি করার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁদের লেখক বাছাই-এ আপনাকে পছন্দ কী কারণেঃ

যাদবপুর হইতে মি. গুগুল জানায় যে আপনি ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বে মিহিবাম, অন্তিমপর্বে ইঞ্জিনিয়ার, ফান্ডেড এনজিও-র প্রশ্রয়ে পরিবেশবিদ হইয়াও পরিচিতির ব্যাপ্তিলাভের প্রত্যাশায় প্রগতি শিবিরে আগমার্ক হিন্দু অনুপ্রবেশকারী হইতে চাহিতেছেন।

ডারউইন সাহেব বিবর্তনের তত্ত্বে বানর জাতীয় প্রাণী হইতে মানব জাতির উদ্ভব ও যাত্রাপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনাকে তাঁহার কোনো গবেষক অনুগামীর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইলে উপরোক্ত যাত্রাপথের বিপরীতমুখী পথচারীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারে সারা বিশ্বজুড়ে আপনার নাম উচ্চারিত হইবে।

(নেশার প্রভাব কাটিতেছে)

Religious Demography of India নামক একটি বড় প্রবন্ধে মোহিতানন্দজীর সাথে সহমত হইবার যথেষ্ট উপকরণ আছে।

প্রাবন্ধিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ২০৫১ সালের মধ্যেই ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার সমান হইয়া যাইবে। এটি কি সেই ধরনের ভবিষ্যৎবাণী যেখানে বলা হয় ২০৩৭ সালে পৃথিবী ধ্বংস হবে বা সুভাষ ঘরে ফিরিবেই? অনেকগুলি সম্ভাবনার (প্যারামিটার) কথা মাথায় না রাখিয়া ওঠানামা সংখ্যাতত্ত্বের বিষয়ে অজ্ঞতা থাকার ফলে (এ জ্ঞান কেবলমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসানের হিসাব পদ্ধতিতে আটকাইয়া থাকলে) টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট খেলার শেষার্ধে যেমন প্রায় গ্রাফ আঁকিয়া প্রজেক্টেড রান দেখানো হয় সেই বিভ্রান্তিতেই ২০৫১ সালে দেশ রসাতলে যাইবার গপ্পো প্রাবন্ধিক মোহিত প্রচার করছেন। এটা ঘটনা যে ১৯৮০ সালে জনসংখ্যার হিসাব অনুসারে হিন্দু জংসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। গ্রাফের রেখার নিম্নাভিমুখী যাত্রাকে সরল স্বাভাবিক স্থির গতি ধরিয়া যদি কেউ ২০৫১ সালকে সিদ্ধান্ত সাল হিসাবে ঘোষণা করেন তাহলে নানা প্রশ্ন উঠতেই পারে। তাহলে ১৯৮০ সালে হিন্দু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পেল কেন? জরুরি অবস্থাকালীন জবরদস্তি নাসবন্দীর (ভেসেকটমী) কথা স্মরণে আনা যাক। বিভিন্ন কারণে হিন্দুদের একাংশ এই সরকারি উদ্যোগে সাড়া দেয় এবং মুসলমানদের অধিকাংশ সাড়া দেয় না (জরুরি অবস্থার পরে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের বিভিন্ন কারণের মধ্যে নাসবন্দী একটি কারণও বটে)। এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ— ঘটনা ঘটে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের মাধ্যমে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ তামিলনাড়ুতে নিরীশ্বরবাদী পেরিয়ারের অনুগামীগণ দীর্ঘকাল যাবৎ পারিবারিক হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মানবতাবাদকে ধর্ম হিসাবে নথিভুক্ত করিতেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মানবতাবাদ শব্দটি H দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে এবং (Humanism) হিন্দুর H অক্ষরটি সেন্সাস কর্মীদের 'দক্ষতার' কারণে একই গোষ্ঠীভুক্ত হিন্দু হয়ে যায়। পেরিয়ার অনুগামীদের তুমুল আন্দোলনের ফলে আদালতের রায় মানবতাবাদীদের পক্ষে এবং মোহিতানন্দ মহারাজের বিপক্ষে যায়। আতঙ্ক প্রচারের সূচনা নূতন পর্যায়ে পৌঁছয়। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র কে কোটারির (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট) Population and development in India বইটি মুসলিম বিদ্বেষীদের বোধোদয়ে সহায়তা করতে পারে।

সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ২১ শতকের শেষে ভারতের জনসংখ্যার ২০

শতাংশ মুসলিম পরিবারজাত হইবে অনুমান করা হচ্ছে। পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরোর সম্পাদক এরিক জুইখে ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখছেন পৃথিবীর কয়েকটি দেশ ব্যতিরেকে অনেক দেশে (ভারত সহ) মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে।

সাচার কমিটির রিপোর্ট, পপুলেশন ডায়নামিক্স-এর নিত্যনতুন গবেষণা, সেন্সাস কমিশনের রিপোর্ট এবং সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাইলে জানা যায় যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাকে স্পর্শ করিতে ৯টি শতক লাগিতে পারে। মুসলমানরা যদি ধর্মীয় বিধানের কোনো একটি গ্রহণ করেন, তবে এই হিসাবের পরিবর্তন হবে।

প্রথম বিধানঃ নারীদেহ একটি উর্বর উৎপাদন ভূমি, যত ইচ্ছা ইহাকে কর্ষণ করো।

দ্বিতীয় বিধানঃ শারীরিক মিলনকালে ফ্যাজল(আরবী ভাষায় - Faizal) / withdrawal (ইংরিজিতে) মানিয়া চলিবে।

অবশ্য পেরিয়ারবাদীদের ন্যায় সব নিরীশ্বরবাদীগণ যদি ইতিমধ্যে নিজেদের অ-হিন্দু হিসেবে নথিভুক্ত করিতে পারেন তবে সেই ভয়াবহ বিপদের দিন কিয়ৎকাল পূর্বেই আসিবে।

(পুনর্বার গঞ্জিকা সেবন এবং তার প্রভাব)

মাননীয় মোহিতানন্দ মহারাজ,

আপনার তুতো ভাই স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগ রচনায় জানাইয়াছেন যে নিয়মিত যোগাভ্যাস করিলে ৫০০ বছর আয়ু হইতে পারে। তাই আপনার কাছে সবিনয় আবেদন যে, ৮বি বাস স্ট্যান্ড-এর নিকট একটি হিন্দু যোগাসনের শিক্ষণকেন্দ্র খুলুন যাহাতে আপনি এবং আপনারা দীর্ঘজীবী হইয়া আসন্ন সর্বনাশের দিনটি দর্শন এবং ফলতঃ যন্ত্রণা পাইতে পারেন। ইনভেস্টমেন্ট লইয়া দুশ্চিন্তা করিবেন না। পশ্চিমী এনজিও কুল আজকাল ধর্মাঙ্গনেও ডলার ঢুকাইতেছে।

—চেতনা লহর

(বা)স্তববাদী > বাম
বাস্ত(ব)বাদী

আদালত কর্মী ঃ বলুন, যা বলিব সত্য বলিব। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

মন্ত্রী ঃ জয় তারা। গীতা আনুন, গীতা ছুঁয়ে বলব। আমি হিন্দু-ব াহ্মণ-কাশ্যপ গোত্র। গীতা মানি, পরম্পরায় বিশ্বাস করি।

বিচারক ঃ আপনার বিরুদ্ধে অভিয়োগ আপনি তারাপীঠের মন্দিরে...।

মন্ত্রী ঃ আমি কোনও ভুল করিনি। একটা মারাত্মক ভুল স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে আমি আমার নেতার নেতাকে কৃষ্ণের সাথে তুলনা করেছি। ব হ্মার সাথে তুলনা করা উচিত ছিল। ব হ্মা সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা। আমার নেতার নেতা দল সৃষ্টি ও ধ্বংসে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। কৃষ্ণের একটু 'লুজ ক্যারেকটার' (কৃতজ্ঞতা ঃ বাঞ্ছারামের বাগান- মনোজ মিত্র) বদনাম আছে তো, নেতা সংগত কারণে কুপিত হয়েছেন।

বিচারক ঃ মন্দিরে পূজা-ধর্মাচরণ কি বস্তুবাদী দর্শনের সাথে মানানসই ?

মন্ত্রী ঃ আমার রাজ্য সম্পাদক আমার পক্ষে সওয়াল করে যথার্থই বলেছেন যে আমরা বস্তুবাদী এবং সাথে সাথে বাস্তববাদী।

বিচারক ঃ ব্যাখ্যা করুন।

মন্ত্রী ঃ আমার দলে বস্তুবাদী কম, বাস্তববাদী বেশি। ত্রিবান্দম সম্মেলনে সময়ের সাথে খাপে খাপ মেলানো কর্মসূচি গ্রহণের ফলে আমরা কাগজ কলমে বস্তুবাদী, কাজে কর্মে বাস্তববাদী।

বিচারক ঃ বাস্তববাদের ব্যাখ্যা দিন।

মন্ত্রী ঃ আমাকে আনপড় ভাববেন না। যদিও দলের পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয় না, তবে অনেক পূজা কমিটির সুভেনিয়রে আমার রচনা ছাপা হয়। দমদমের জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির সভাপতি মদনবাবু আমাকে সম্বর্ধনাকালে মহাপণ্ডিত আখ্যা দিয়েছেন। উনি লেনিনের টাকের সাথে আমার টাকের তুলনা করেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের টুপির সাথে আমার টুপির তুলনা করেছেন। আমার সাদা পোষাকের জন্য সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টারদের সাথে তুলনা করেছেন।

বিচারক ঃ মূল বিষয়ে আসুন।
মন্ত্রী ঃ আমি কালচারাল প্লুরালিজমে বিশ্বাস করি। বাস্তববাদের ব্যাখ্যা জনে জনে পৃথক হতে পারে। আমি উঃ আঃ বা উঃ গঃ দৃষ্টিকোণে বাস্তববাদকে দেখতে চাই।
বিচারক ঃ উঃ আঃ ? উঃ গঃ কি ?
মন্ত্রী ঃ উঃ আঃ মানে উত্তর আধুনিকতাবাদী। উঃ গঃ মানে উত্তর-গঠনবাদী।
বিচারক ঃ তো ?
মন্ত্রী ঃ বাস্তববাদ শব্দটিকে দু'ভাগে ভাগ করে যদি দেখা যায় তবে (১) (বা)স্তববাদ (২) বাস্ত(ব)বাদ। ভাষাতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্ব-উচ্চারণতত্ত্বের উঃ আঃ বা উঃ গাঃ ব্যাখ্যায় এই কথাই বলে।
বিচারক ঃ তারপর ?
মন্ত্রী ঃ (বা)স্তববাদের পক্ষে যুক্তি হল যে যাদের ক'বছর আগে নজরে পড়ত না তারা রামনাম স্তব করে ক'বছরেই দিল্লির গদি দখল করতে পারল। আমরা এখানে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালাম।
ওদের (বা)স্তববাদঃ-
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
উঃ আঃ (উত্তর আধুনিক) প্রেসক্রিপসন অনুসারে আমাদের রামনাম এবং বামনামের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকসন-ডিসকোর্স চালাতে হবে। রামনাম এবং বামনামের মধ্যে এক মসৃণ যাতায়াতের পথ খুঁজে নিতে হবে। দলের বৈঠকে বাম, প্রকাশ্যে রামনাম (বা)স্তববাদের সময়ের সাথে খাপে খাপ খাওয়া বহিঃপ্রকাশ। রাম এবং বামের মধ্যে মাত্র ফুটকির ফারাক। ছুঁৎমার্গ থাকলে চলবে ?
বিচারক ঃ বাস্ত(ব)বাদ টা কি ?
মন্ত্রী ঃ এইটাই আসল কথা। বাস্ত(ব) শব্দটি শেষ বর্ণটি যদি উঃ গঃ মতানুসারে অনুচ্চারিত থাকে বা অস্পষ্ট উচ্চারিত থাকে তবে পড়ে থাকল বাস্তু, এই শব্দটির হাত ধরে বাস্তু-বাস্তুকার-বসতি-বাস্তুতন্ত্র-কতো প্রিয় জায়গায় চলে যাওযা যায়।
গাছ কাটা যায়-পুকুর বোজানো যায় - খেলার মাঠ দখল করা যায় - ছোট কারখানা বন্ধ করে দেওয়া যায়-কুঁড়েঘর ভেঙে দেওয়া যায়।
বিচারক ঃ মানে প্রোমোটিং বিজনেস ?
মন্ত্রী ঃ এস্টেট ডিলিং বলুন, শুনতে ভালো লাগে। কত জোয়ান ছেলেকে সাথে পাওয়া যায়। কাঁচা পয়সা ওড়ে। ফলে মদের ভাটি খোলা যায়। দলের ফান্ড বাড়ে। ভোটের কর্মী সংখ্যা বাড়ে। এটাই বাস্ত(ব)বাদ।
বিচারক ঃ আপনার বাস্তবাদের ব্যাখ্যা অভিনব। কিন্তু বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্কস যা বলেছেন তা হল...।

মন্ত্রী ঃ রাখুন ওদের কথা।

বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
মার্কসরা মলাটে সুন্দর
আমরা কোষাগারে।

আমরা ব াকেটে মাঃ কেন জানেন?

মাঃ মানে গপ্পগাছায় মার্কস।
মাঃ মানে মা-মাকালী, মা দুর্গা, (জয়) মা তারা,
মাঃ মানে মানি-টাকা- বৈভব,
মাঃ মানে মাল - চুল্লু - বাংলা- ইংলিশ,
মাঃ মানে - আরো এগোবো নাকি?

বিচারক - না, না - থাক।

(আদালতে কক্ষে শেষ সারিতে দুই অতিবৃদ্ধের কথোপকথন)।

১ম বৃদ্ধ ঃ ব্লাঙ্কি, তোমরা বোধহয় ঠিকই বলেছিলে। আমার এতো নরম হওয়া উচিত ছিল না।

২য় বৃদ্ধ ঃ না, না, একী বলছেন? আমরা না খোঁচালে চিরকালের জন্য কাজে লাগা এই রচনা পৃথিবীর মানুষের হাতে পৌঁছোত না।

১ম বৃদ্ধ ঃ হাতে পৌঁছেছে হয়তো, মাথায় পৌঁছেছে কি? না-না, ভুল লিখেছিলাম। তখন ইউরোপ জাগছে। সমস্ত কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে বিজ্ঞান নতুন চেহারা নিচ্ছে। আমি বোধহয় নবজাগ্রত শক্তির উপর বেশি ভরসা করেছিলাম।

২য় বৃদ্ধ ঃ সেটা তোমার নয়, সময়ের সীমাবদ্ধতা।

১ম বৃদ্ধ ঃ হয়তো তাই। বি টিশ ম্যুজিয়মে ভারত বিষয়ে মৌলিক বই-এর অভাব ছিল, তবুও যা পড়েছি ভারতীয়দের ধর্ম চেতনার উৎসস্থলে যেতে পারিনি। অত বই পাবই বা কী করে? মুদ্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কারের পর দুই শতাব্দী ধরে ওরা শুধু বাইবেল-ই ছেপে গেল। ভুল, ভুল-আফিম নয়, প্রাণঘাতী বিষ লেখা উচিত ছিল।

মন্ত্রী ঃ এবার আমায় যেতে দিন। আমার কাজ আছে।

বিচারক ঃ কী কাজ?

মন্ত্রী ঃ আগামী এক মাস আমার একমাত্র কাজ দলের সদস্যপদ বাড়ানো। যার সাথেই দেখা হবে তাকে সদস্য হতে আহ্বান জানাব। রাজ্য সম্পাদক পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন যে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা দলে থাকবে। জয় তারা।

—হেতুবাদী

গঞ্জিকা সেবনের কুফল

[লেখক নিয়মিত গঞ্জিকাসেবী, অতিরিক্ত নেশার ফলে তাঁর আচরণে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তিনি নিজের সাথেই বেশিরভাগ সময়ে কথা বলেন। নিকটজন যত্ন সহকারে তার কথা অনুধাবন করলে বোঝেন যা তাঁরা শুনছেন তাঁর আসলে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার। বর্তমান সাক্ষাৎকারে তিনি চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছেন তার নিজস্ব কায়দায়। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ মানে চলতি ভাষায় আই-স্পেশালিস্ট, লেখকের মতে কিন্তু আমি-বিশেষজ্ঞ।]

পুণ্ডরিকাক্ষ ঃ আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপনে দেখলাম যে আপনি নিজেকে আধুনিক যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃত হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন, এর কারণ কী?

সুবীর ঘোষ ঃ কারণ সহজবোধ্য, আমার আগে তো বটেই, পরেও যুক্তিবাদী আন্দোলনের কোন দর্শন সৃষ্টিকারী নেই— ভবিষ্যতেও সম্ভাবনা কম, কারণ এটা সরকারি নথিভুক্ত পেটেন্ট প্রাপ্ত। আমার ঠিকানা— ৩ নং শ্রীনিবাস রোড, কলকাতা - ০০০০০৭, রেজিস্ট্রেশন নং স/৪২০৪২০।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ আমাদের দেশে চার্বাক-কোভুর-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ইদানীংকালে সুকুমারী ভট্টাচার্য-রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবিষয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন শোনা যায়।

সুবীর ঘোষ ঃ সবাই ফালতু ভেজাল ভরা - আমি একমাত্র আগমার্কা। আমিই প্রথম-আমিই শেষ।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ মার্কস-লেনিন-মাওসেতুং তো নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁরা কি যুক্তিবাদী ছিলেন না?

সুবীর ঘোষ ঃ ওঁদের কথা বলে লাভ নেই। ওঁনারা বেঁচে থাকলে আমার বই পড়ে শিক্ষিত হয়ে উঠতেন। আমার বই চড়া দামে এখনো বিক্রি হয়।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ শুনেছি কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে জলের দামে আপনার বই পাওয়া

যায়।

সুবীর ঘোষ ঃ এটা নিন্দুকদের কুৎসা। আমি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছি।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আপনার বেশিরভাগ লেখা অন্যের লেখা থেকে টুকে মারা। ভাল ভাষায় যাদের কুম্ভীলক বলে আপনি কি তাই?

সুবীর ঘোষ ঃ অন্যের লেখা আমি পড়িই না— প্রয়োজন হয় না। আমার প্রতিভা আমাকে যে জায়গায় নিয়ে গেছে সেখানে চার্বাক-কোভুর-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-মার্কস-লেনিন চর্চার দরকার পড়ে না।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ প্রতিভার কথা উঠল যখন জিজ্ঞেস করি— আপনার ডক্টরেট উপাধি বিষয়ে নানাবিধ সংশয় আছে।

সুবীর ঘোষ ঃ আমার গবেষণার এতগুলি বিষয় যে প্রত্যেক বিষয়ে ডক্টরেট উপাধি ব্যবহার করতে পারি। ছাপাখানার কর্মী হাসিঠাট্টা করেছিল নতুবা আমি আমার কার্ডে নামের আগে সাতটা 'ড.' ব্যবহার করতাম।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ আপনি ব্যক্তিগত জীবনে কি কুসংস্কারমুক্ত?

সুবীর ঘোষ ঃ শুধু ব্যক্তিজীবনে নয় আমি সপরিবারে কুসংস্কারমুক্ত।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ শুনেছি আপনার ছেলের বিয়েতে শঙ্খ, উলুধ্বনি-পুরোহিত-মন্ত্রোচ্চারণ এসব ঘটেছিল?

সুবীর ঘোষ ঃ ওটা নাটক। আমার ছেলে আধুনিক মনস্ক। চুল রঙিন করে। কানে দুল পরে।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ আপনার বিরুদ্ধে মহিলাদের সাথে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ আছে।

সুবীর ঘোষ ঃ আমি মূলতঃ কবি। আমার কবিমন আমাকে কোন বাধা মানতে নিষেধ করে। নবকল্লোলে চীনের সাথে মীন জাতীয় ছন্দ মিলাইয়া আমি কবিখ্যাতি পাইয়াছি। মাকড়দহ সৎকার সমিতি আমাকে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি সম্মান দিয়াছে।

পুণ্ডরিকাক্ষঃ না— মহিলাদের নিয়ে বলুন।

সুবীর ঘোষ ঃ নারী-পুরুষ সম্পর্ক স্বাধীন। আমার খ্যাতির আকর্ষণে কত মহিলা আমার সঙ্গ কামনা করে তারই ইয়ত্তা নেই। আমি তাদের ফিরিয়ে দিতে ব্যথা পাই। সত্যি কথা বলতে সেক্স স্ক্যাণ্ডাল ছাড়া খ্যাতি বা পরিচিতির চূড়ায় ওঠা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের সদর দপ্তরে কামান দাগো

ডাফোড্বাম (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন ফোরাম অফ দলিতস, ওমেন এন্ড মাইনরিটিস) এর বাংলা ভাষায় মুখপত্র চেতনা লহর প্রকাশিত হল। নামেই ডাফোড্বামের পরিচয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে মনুবাদ প্রভাবিত রাষ্ট্রে দলিত, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পাশে থাকবে চেতনা লহর। পত্রিকার প্রচ্ছদে যে কজন শিক্ষকের স্থির চিত্র (জন্মসাল অনুসারে সাজানো) দৃষ্ট হচ্ছেন তাঁরা, চেতনা লহরের মতে, ভারতীয় জনগণের সার্বিক শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জাতভেদ ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্যও অর্জন করতে পারিনি, তা আমাদের লজ্জা। সারা দুনিয়ার অন্যপ্রান্তের তুলনায় ভিন্ন ধরনের ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে এবং তার স্তরে স্তরে কুৎসিত বিভাজন এবং বঞ্চনার উৎসবলীকে চিহ্নিত করতে না পারলে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাও মূর্খামী। সমাজ পরিবর্তনে নিবেদিত মার্কসবাদী ঘরানার কর্মীদের কাছে আমাদের আবেদন যে, ভারতীয় সমাজের সামান্য রং পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডেও আগ্রহীদের আম্বেদকর, পেরিয়ার, জ্যোতি বা ফুলে এবং বেগম রোকেয়ার রচনাবলী পাঠ করা প্রয়োজন। একইসাথে একথাও বলা দরকার যে আম্বেদকর, পেরিয়ার, ফুলে এবং রোকেয়ার অনুগামীদের সারা দুনিয়ার মানব-মুক্তির দর্শনের বস্তুবাদী পথ প্রদর্শক কার্ল মার্কসকেও প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে হবে। মনুসংহিতা হতে নির্গত ব্রাহ্মণ্যবাদ আজ ভারতের শোষক-শাসক শ্রেণির শক্তিশালী হাতিয়ার। চেতনা লহরের দ্বিধাহীন ঘোষণা যে ভারতীয় সমাজের স্তরে স্তরে মনুবাদী কর্তৃত্বের অবসান না ঘটলে প্রাথমিক স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় অটুট রেখে আমূল সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা গঠন করাও সম্ভব নয়। বর্ণহিন্দু রাষ্ট্রের সমস্ত ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক স্তরে বিভিন্ন ঘরানার চিন্তকদের সমন্বয় মঞ্চ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান রচনা পুনরায় পাঠের তাগিদে প্রকাশ করলাম। এটা সুস্পষ্ট হওয়া

প্রয়োজন যে জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে শ্রেণি-সংগ্রামের কোনো বৈরিতা নেই বরং তা পরস্পরের পরিপূরক কিন্তু সমান্তরাল নয়। চেতনা লহর আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন অবস্থান অথচ সবহারা মানুষের সাথীদের ভাবনা বিনিময়ের মঞ্চ গঠনের সমস্ত প্রক্রিয়ার সাথী হবে। ব্রাহ্মণ্যবাদের সদর দপ্তরে কামান দাগার জন্য এক ব্যাপক যুক্তমোর্চার প্রয়োজন। আসুন আমরা স্বপ্ন দেখি, দেখাই এবং স্বপ্নপূরণের প্রয়াসে সামিল হই যে এক নূতন ভারত জন্ম নেবে যেখ ানে শ্রেণি শোষণের সাথে সাথে জাতিগত বঞ্চনা, সম্প্রদায়গত হিংসা, নারী দমনের কোনোরকমের চিহ্ন থাকবে না।

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর...

—চেতনা লহর

মনুবাদের মরুভূমিতে শত দলিত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক

ডাফোড্বামের (ডেমোক্রেটিক অ্যাকসন্ ফোরাম অফ দলিতস ওমেন অ্যান্ড মাইনরিটিস) বাংলা ভাষার মুখপত্র চেতনা লহরের ২য় ও ৩য় সংখ্যা যুক্তভাবে প্রকাশিত হলো। যোগাযোগের দুর্বলতার কারণে চাহিদা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষী বহু পাঠকের কাছে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পৌঁছতে পারেনি। আমরা ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক হব। বেশ কিছু পাঠকের প্রতিক্রিয়া আমরা অন্য পাঠকদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। পাঠকদের বহুলাংশ মনে করেন যে ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তমন অথচ উচ্চবর্ণ উপাধিধারীরা বা/এবং মার্কসাবাদী দর্শনে বিশ্বাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, নিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও নেবেন। যদিও এ বিষয়ে নানা শিবিরে নানা মত আছে যার অনেকাংশ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। একাংশ মনে করেন দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠার, সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে বা পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেবলমাত্র প্রান্তবাসিন্দারাই অংশগ্রহণ করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন। আর একাংশ মনে করেন, এই ধরনের অধিকার আন্দোলনকে গুরুত্ব দিলে তা বহু আলোচিত শ্রেণি সংগ্রামের মর্মবস্তুকে দুর্বল করবে। আমরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করি যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর কারণেই মনুবাদ-ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিটি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের মাধ্যমেই একটি তুলনামূলক গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক স্তরে পৌঁছনো যায়, যা আমূল সমাজ পরিবর্তনের পথে যাত্রা সহায়ক।

সহানুভূতি (sympathy) বনাম সমানুভূতি (empathy) বিতর্ক চলুক। কিন্তু কার্ল মার্কস, ফুলে, পেরিয়ার, বেগম রোকেয়া, আম্বেদকর , ভগৎ সিংদের ন্যায় চিন্তকদের অস্বীকার করে ভারতে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখাও মূঢ়তা।

ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে শত চিন্তা প্রতিযোগিতায় নামুক ।

এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার।

—চেতনা লহর

যে দলিত তার সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায় তাকে ঘৃণা করি

চেতনা লহরের প্রতিটি সংখ্যায় দলিত শব্দটির বারংবার ব্যবহারে কিছুসংখ্যক পাঠকের ধারণা তৈরী হয়েছে যে আমরা দলিত শব্দটি কোনো এক বিশেষ জাতের জনগণের (S.C.) পরিচয় হিসেবে জানাতে চেয়েছি। এ ধারণা সত্যের অংশমাত্র। আমরা বর্তমান ভারত রাষ্ট্রকে একটি স্বল্পজনের পরিচালিত দলনকারী উচ্চবর্ণ হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই রাষ্ট্রের দ্বারা নির্যাতিত শ্রমজীবী দেশবাসী আমাদের ভাষায় দলিত। সেই কারণে দলিত শব্দটিকে সংকীর্ণার্থে ব্যবহারের বাসনা আমাদের নেই। আমরা সংরক্ষণের দাবীতে এখনও অটল কারণ আমাদের মতে সংরক্ষণ কোনো মতেই সুবিধা (Previlege), অধিকার(Right), করুণা(Sympathy) বা অনুগ্রহ (Favour) নয়, সমাজকাঠামোর প্রতিটি স্তরে প্রতিনিধিত্ব (Representataion) মাত্র, যা প্রাথমিক পর্যায়ের গণতন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম প্রতিফলন ছাড়া বেশি কিছুই নয়।

যারা প্রতিনিধিত্বের ধারণার বিপরীত ভাবনার ভুল অবস্থানে আছেন তাঁদের অধঃপতনের সম্ভাবনা প্রবল। সারা ভারতরাষ্ট্র এল.পি.জি.র (উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন) পথে মনুবাদী সামন্তবাদ, দেশী বিদেশী পুঁজিতন্ত্রের জোট দেশের অধিকাংশ মানুষের জল, জমি, জঙ্গল, শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, নাগরিকত্ব, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সর্বোপরি মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে। দেশবাসীকে বিভক্ত করার জন্য বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি নিত্যদিন ষড়যন্ত্র করছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকার প্রান্তে প্রান্তে প্রান্তবাসীদের হত্যার বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটছে। লিঙ্গবৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যসত্ত্বভোগী পরগাছা তথাকথিত ‘‘ভদ্দরলোক’’ সুশীল সমাজ এবং দিবারাত্র সংরক্ষণ পুজারীকুল সাইনিং ইণ্ডিয়া বনাম অন্ধকার ভারত-এর দ্বন্দ্ব ধরতে চাইছেন না। আসুন আমরা প্রতিদিন লড়তে লড়তে হারতে হারতে বিজয়ের পথ ধরি।

—চেতনা লহর

সবহারা দলিত মুক্তিসংগ্রাম
সূচি শিল্প বা ভোজসভা নয়

সংরক্ষণ শব্দটি উচ্চারিত হলেই ‘‘ভদ্দরলোক’’ সমাজ থেকে একটা গেল গেল রব উঠে আসে। যে অসংগঠিত নির্বোধ শিবির থেকে সংরক্ষণের বিরোধিতা করা হয় তাতে মেধা ও উৎকর্ষতার মানের অবনতির আশঙ্কা করা হয়। তারা ধরেই নেয় যে মেধা উৎকর্ষতায় ভরপুর গুণীজন রাষ্ট্র, সমাজকে বেশ ভালো ভাবেই পরিচালনা করছেন। সেখানে ‘‘অযোগ্য নিম্নবর্গ’’ জন কেবলমাত্র দৈহিক শ্রম ব্যবস্থার সাথেই যুক্ত থাকুক। বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের একচেটিয়া অধিকার বর্ণ হিন্দুদের। ফলে সারা ভারতের কোনও রাজ্যেই সরকারি নির্দেশানুসারে সঠিক সংরক্ষণ প্রয়োগ হয়নি।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বর পরেও পশ্চিমদেশের বহু বিজ্ঞানী প্রমাণ করতে পারেন নি যে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কম মেধার অধিকারি। আসলে মেধা উৎকর্ষতা বিষয়ে কবি মহাশয় ‘‘বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে’’ কবিতায় যা জানান দিতে চেয়েছিলেন ‘‘ভদ্দরলোক’’ বঙ্গ সন্তানদের অনেকেই তার অর্থ বুঝতে পারেননি।

মার্কসবাদের নামাবলী ধারণকারীরা সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন ভিন্নপন্থায়। মার্কসবাদকে বই-এর পাতার বাইরে এনে ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরের প্রভুত্ববাদী ভাবনার বিশ্লেষণী চর্চার সাথে না মেলালে ‘‘শ্রেণিসংগ্রাম’’, ‘‘শ্রেণি ঐক্য’’র আরাধনা হবে, বাস্তবে ভারতের সমাজজীবনে প্রাথমিক স্তরের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল তৈরি হবে না। অন্ততঃ ৩ হাজার বছরের একটি সুসংরক্ষিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ আন্দোলন একটি অতি দুর্বল কিন্তু ইঙ্গিতবাহক হাতিয়ার। ভারতের মতো দেশে যেখ ানে শিল্প বিপ্লব ঘটেনি এবং সমাজ কাঠামো প্রাক পুঁজিবাদী অনাধুনিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই তার প্রাণশক্তি খুঁজে পাচ্ছে, সেখানে যে কোনও গণতান্ত্রিক মূ ল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি বা সংগঠনকে জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কথা ও কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বি.আর. আম্বেদকর সারাজীবন নানা ধরনের টানাপোড়েনের মধ্যেও যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার জনক হিসাবেই

পরিচিত তিনিও আশঙ্কা করেছিলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পদাধিকারীগণ সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েও *পে ব্যাক টু দি সোসাইটি* উপদেশকে অগ্রাহ্য করে শাসন ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগীতে পরিণত হবে। এই সুযোগেই ভারতে মনুবাদী শাসকবর্গ আম্বেদকরকে সংবিধান রচয়িতা ছাড়া অন্য কোনও পরিচয়ে পরিচিত করাতে চায় না। দলিত নেতাদের অধিকাংশই জানেন না যে আম্বেদকর তাঁর তথাকথিত রচিত সংবিধানের অনেকাংশের সাথে সহমত ছিলেন না।

কেন্দ্র বা রাজ্যের শাসকবর্গ যেহেতু নতুন কোনও বিরশা মুন্ডা, সিধো, কানহু, ফুলে, পেরিযার, ভগৎ সিং, বেগম রোকেয়া, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিচাদ, গুরুচাঁদের চেহারা দেখতে চায় না, তাই আনুগত্য বিগলিত বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদদের মধ্যে দলিত, সংখ ্যালঘু, মহিলাদের বর্তমান অপমানকর রাষ্ট্রব্যবস্থার দাসত্বে বাঁধা হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন দৈহিকশ্রমবিমুখ পরগাছা মধ্যবিত্ত যেমন তাদের দোদুল্যমান মানসিকতা নিয়েই শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের নেতা হয়ে যায় এবং যার ফলে সমাজ বিবর্তন যাঁদের নেতৃত্বে হওয়ার কথা, যাঁদের নীতি নির্ধারক হওয়ার কথা তাঁরা নির্দেশপালকের ভূমিকায় থেকে যায়। তেমনই দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, মহিলাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য ভারতের শাসকবর্গ পরিচয়ের সংকটকে (Identity Crysis) কে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধান না করে পরিচয়ের রাজনীতিকে (Identity Politics) প্রশ্রয় দেয় যা পরবর্তীকালে পরিচয়ের উগ্রজাত্যাভিমানী (Identity Chauvnism) শক্তিতে পরিণত হয়, অবলীলাক্রমে দিল্লির পুতুলে পরিণত হয় এবং এইসব দাসানুদাসদের সাথে বিশাল ভারতবাসীর সম্পর্কের দূরত্ব অন্য যে কোনও দলের নেতাদের মতোই থাকে ।

দেশের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা যখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সর্বোপরি মর্যাদা থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত থাকছে তখন রাজক্ষমতার ক্ষুদ্র ভাগীদার হওয়ার প্রচেষ্টার পরিবর্তে সকলের জন্য ক্ষমতা তথা সমতাবাদের পথই গণতান্ত্রিক ভারতের সন্ধান দেবে।

—চেতনা লহর

দলিত সংস্কৃতির গ্রাম দিয়ে মনুবাদী অপসংস্কৃতির শহর ঘেরো

দুঃখজনক হলেও সত্য যে ভারতে দলিত (আমাদের ভাষায় সর্বরিক্ত) আন্দোলন আশানুরূপ স্তরে পৌঁছতে পারেনি, অথচ ভারতে শাসক সম্প্রদায় এবং ভিনদেশী প্রভুদের আক্রমণের লক্ষবস্তু এদেশের ভূমি সন্তান আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িকতার পরিমণ্ডল ক্রমশঃই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে প্রান্তবাসী করে তুলছে। নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক কোটি দলিত বাঙালি উদ্বাস্তু নাগরিকত্বহীন হতে চলেছে। বস্তুবাদী মতুয়া ধর্ম আজ ভাববাদের কাদায় মলিন। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের উত্তরপুরষরা ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসককুলের পায়ের তলায় অনুগ্রহপ্রার্থী।

এই সর্বরিক্ত ভারতবাসী, যার অধিকাংশই গ্রামীণ কৃষি জীবনে অভ্যস্ত, শহরবাসী তথাকথিত শিক্ষিত রাষ্ট্রনায়কদের কাছে মতদাতা নয়, বরং নির্দেশপালক মাত্র। মনুবাদের মধ্যে স্বৈরাচারের যে বীজ প্রোথিত ছিল তা আজ এমন বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে যে তা এমনকি দলিত সংখ্যালঘু নারী আন্দোলনের ‘মুক্তিদাতা’ বা ‘মুক্তিদাত্রী’দের গ্রাস করছে। তাই আজ প্রত্যেক মুক্তিকামী মানুষকে ঘোষণা করতে হবে যে আমিই বিকল্প। আনুগত্য আদর্শের প্রতি হোক যেখানে ব্যক্তি বা সংগঠন পথ চলার সহায়ক হতে পারে মাত্র। শর্তহীন দাসত্ব কাম্য নয়। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে।

আসুন জাতি ও শ্রেণিগত বৈষম্যের শিকার সবহারা নিজেদের বঞ্চনামুক্ত সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলি।

—চেতনা লহর

স্বল্পজনের আধিপত্য ভাঙতে হবে

যাঁরা সংরক্ষণ-এর পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলেন তাঁদের মধ্যে বিবাদ থাকলেও একটি বিষয়ে বেশ মিল পাওয়া যায়। উভয় পক্ষই সংরক্ষণকে সুযোগ (Chance) বা সুবিধা (Privilege) বা অধিকার (Right) বা দয়া (Favour) বা সহানুভূতি (Sympathy) হিসাবে দেখতে ভালোবাসেন। ইতিহাস অনুসারে ৩-৩১/২ হাজার বছরের বর্ণভেদ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক (Representation) সামান্য পদক্ষেপ মাত্র তা অনেকের ভাবনায় থাকে না। ইদানীংকালের রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory democracy) শব্দবন্ধটি বহু আলোচিত যা আম্বেদকর-এর পরিকল্পনার মধ্যেও ছিল। আম্বেদকর আশাবাদী এবং আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন তবুও তাঁর সমাজকে ফিরিয়ে দাও (Pay back to the society) উপদেশটি তাঁর অনুগামীদের এক শতাংশও মনে রাখেনি। তদুপরি যখন ভারতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেসরকারিকরণের ফলে দিনের পর দিন এত কম আসছে যে সমস্ত সংরক্ষণপন্থীরা একযোগে আন্দোলন করলেও সামাজিক অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশের চাকুরি মিলবে না। শিকড়ের সাথে সম্পর্কহীন সামান্য কিছু পরগাছা মধ্যবিত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে যারা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আজ্ঞাবহ দাস ছাড়া কিছুই হতে পারবে না। রাজনৈতিক জগতেও একই অবস্থা। অবদমিত দলিত, আদিবাসী, ও.বি.সি, সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের যে প্রতিনিধিগণ ক্ষমতার অলিন্দে যেতে পেরেছেন তাঁরা নিজ পরিবারে স্বাচ্ছন্দ এনে 'সাইনিং ইন্ডিয়া'য় ঢুকতে পেরেছেন কিন্তু 'অন্ধকার ভারত'-এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। স্বঘোষিত মার্কসবাদী বা সমাজবাদীদের অবস্থা আরও করুণাদায়ক। জাতভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা পুরুষতান্ত্রিকতা এঁদের কাছে এতই গুরুত্বহীন বিষয় যে প্রতিদিনের কর্মসূচিতে যে এই সমস্যাগুলিকে বিরোধ করতে হয় তা এঁদের মাথায় থাকে না। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা যখন প্রাক পুঁজিবাদী এবং নয়া ঔপনিবেশিক স্তরে আটকে আছে তখন সেই জগদ্দল পাথর

ভেঙে প্রাথমিক ধাপের গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করতে না পারলে আমূল সমাজ পরিবর্তনের লড়াই-এ প্রান্তবাসীদের নেতৃত্বদানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাবে না। ‘শহুরে ভদ্দরলোক’-দের হাত থেকে নীতি নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নিতে হবে। হিন্দুত্ববাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দূরত্ব যখন কমে এসেছে এবং এদের হাত ধরে স্বৈরতন্ত্র আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে তখন এদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম যুক্ত মোর্চা তৈরি করা এখনই পবিত্র কর্তব্য। ব্রাহ্মণ্যবাদ টিঁকে আছে আধুনিক বৈশ্যদের আর্থিক শোষণে, আধুনিক ক্ষত্রিয়দের সামরিক শাসনে। রাষ্ট্রের অর্থ-অস্ত্রের সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক ব্রাহ্মণ্যবাদ নির্বিষ সাপ মাত্র।

শ্রেণি শোষণকে অস্বীকার না করে জাতভেদ ব্যবস্থার (ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন ও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র প্রয়োগ ও বৈশ্যের উদ্‌বৃত্ত মূল্য ভোগ) বিপক্ষে যাঁরা নিয়মিত কলম ধরেছে বা এখনও ক্লান্ত হননি, তাঁদের নাম তালিকাটি দীর্ঘ। ডি.ডি. কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুকুমারী ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যসহ অনেকেরই রচনা আমাদের পথ দেখায়। জ্যোতি বা ফুলে, আম্বেদকর, পেরিয়ার-এর শিক্ষাকে বিফলে দেওয়া যাবে না।

—চেতনা লহর

স্বমৈথুন বিলাস বন্ধ হোক

বলা বাহুল্য ভারতবাসীরা এখন দুঃসময়ে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আদিবাসী, দলিত সহ অবদমিত জনগোষ্ঠীগুলি, সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলমানরা এবং মহিলা সমাজ মৌলিক অধিকার হারাচ্ছেন। সুশীল সমাজের বিদ্বজন 'অসহিষ্ণুতা'র বিরুদ্ধে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করছেন। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রইল। আমরা কিন্তু সুললিত শব্দ চয়ন করে সম্পাদকীয় রচনার উৎসাহ হারিয়েছি। এ স্বমৈথুন বিলাস ত্যাগ করে অন্য কিছু কাজ করতে চাই। প্রাথমিক স্তরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে এখন পথযুদ্ধের ডাক আসিয়াছে। নব্য হিটলারশাহী'র বিরুদ্ধে ব্যাপকতম যুক্তমোর্চা গড়ে আসুন পথে নামি।

নো পাসারণ

—চেতনা লহর

দলিত মুক্তি সংগ্রামের বিজয় পতাকা আজ ব্রাহ্মণ্যবাদের ধূলায় মলিন, সর্বরিক্ত সমাজকে সেই পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে

অন্ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃভাষা, বাসস্থান, জল, জঙ্গল সর্বোপরি মর্যাদা হতে ভারতবাসীর অধিকাংশকে দূরে রাখা হয়েছে এবং তা দিনের পর দিন অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। এই ভারতবাসী একইসাথে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে প্রান্তবাসী। যেসব নেতা-নেত্রীগণ জাতিভেদ ব্যবস্থা বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে বহুদিন সোচ্চার ছিলেন তাদের একাংশ মনুবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে একাত্ম হয়ে নিজেদের বিপথগামী করছেন। শ্রেণিসংগ্রামের পরিবর্তে বিপজ্জনক শ্রেণি সমঝোতা আজ আর নজর এড়ায় না। ব্যতিক্রমী শক্তি কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। আমরা এই ব্যতিক্রমী, আপাত দুর্বল অসংগঠিত শক্তির পাশে থাকতে চাই। বস্তুবাদী হৈতুক দর্শনের অভিমুখ সঠিক থাকলে আমাদের ভারত সামাজিক ভারসাম্যের সম্মানজনক স্তরে পৌঁছবে, যা সর্বার্থে মুক্ত ভারত-এর প্রথম ধাপ।

—চেতনা লহর

ব্রাহ্মণ্যবাদের শৃঙ্খল ছাড়া দলিতদের হারাবার কিছুই নেই- জয় করবার জন্য আছে সারা দুনিয়া

আমরা যখন দলিত শব্দটি বারংবার ব্যবহার করি, তা কখনোই সংকীর্ণ অর্থে নয়। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার ভারতের জনসংখ্যার ব্যাপক অংশের পরিচয় শুধুমাত্র দলিত নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যে সর্বরিক্ত অথচ কর্তব্যসাধক মাত্রই আমাদের মতে দলিত। মানুষখেকো দলনকারী রাষ্ট্রের পীড়নের শিকার মাত্রই দলিত। এই সমগ্র দলিত সম্প্রদায় যখন কেবলমাত্র নির্দেশপালকের ভূমিকার পরিবর্তে রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনায় প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব দান করবে, তখনি তা হবে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইতিমধ্যে শিবির পরিবর্তনের ব্যাপক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটেই চলেছে। বহু মার্কসবাদী যেমন পূর্বাবস্থায় না থেকে আদর্শচ্যুত হয়েছেন, তেমনই বহু আম্বেদকর-পেরিয়ার অনুগামীর আদর্শহীনতা ক্ষমার অযোগ্য। হৈতুক দর্শনের পুরোধা চার্বাক (গোষ্ঠী), মুতাজ্জেলাবাদীদের পরম্পরায় যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ আমরা পেয়েছি, তা আজ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আরজ আলি মাতুব্বর, আশিষ লাহিড়ী'র হাতে মশাল হিসেবে জ্বলছে। এই মশাল থেকে দাবানল সৃষ্টি হতে আর দেরি নেই।

হতাশার কাছে নেই ঋণ

আমরা করব জয় নিশ্চয়।

—চেতনা লহর

স্বপ্ন বেচো না

আমরা ভালো নেই। এই সময়ে ‘‘আচ্ছে দিন’’ আসার সম্ভাবনা অতি আশাবাদীরাও দেখছেন না। আর্য রক্তের মিথ্যা অহমিকা প্রচার করে গত শতাব্দীর যে স্বৈরাচারী শক্তি সারা পৃথিবীতে তাণ্ডব চালিয়েছিল, তাদের ভারতীয় মানস সন্তানদের রমরমা এখন। জাতীয়তাবাদ (ন্যাশনালিজম) ও সমাজবাদ (সোস্যালিজম)-এর জয়গান গেয়ে নাৎসীবাদ পৃথিবীর এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরের মুখ্য আতঙ্কবাদীদের জন্ম দিয়েছিল। বর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের নামে উন্নয়নের বাক-চাতুরী আজ ভারতীয় নাৎসীদের ক্ষমতা দখলের চাবিকাঠি। অপরদিকে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ প্রতিদিন শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সর্বোপরি মর্যাদা হারাচ্ছেন, প্রান্তবাসীদের আন্দোলনের যাঁদের থাকার কথা সেই মার্কসবাদী, আম্বেদকরবাদী, পেরিয়ারবাদী এমনকি সংখ্যালঘু সমাজের নেতাগণ নিজেদের দায়িত্ব পালনে সঙ্গত কারণেই ব্যর্থ হচ্ছেন।

আমরা যারা অতি ক্ষুদ্র পরিসরে সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালের কাজ করছি তাদের হতাশ করা সহজ নয়। সরকারি মার্কসবাদীরা ‘‘শ্রেণিসংগ্রামেয় নমঃ’’ উচ্চারণ করতে করতে একদিন শ্রেণিসংগ্রামই ভুলে যাবে — এ আমরা জানি। আম্বেদকরবাদীদের ক্ষমতালিপ্সু অংশ মনুবাদীদের লেজুরবৃত্তি করবে তা আমরা জানি। জাতভেদ ব্যবস্থা, বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য না পেলে সমাজ বিবর্তনের মৌলিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অল্পজনের কুশাসন বহুজনের নিদ্রাহীনতার কারণ ঘটায়। বর্ণব্যবস্থা (Caste System) ও বর্গব্যবস্থা (Class System) উচ্ছেদের সংগ্রাম একইসাথে চালানো যায়। এই স্বপ্নই আমাদের পাথেয়। ‘আলু’ ‘পটল’ বেচা যায়, স্বপ্ন বেচা যায় না।

—চেতনা লহর

অনু নাটক

[নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়েছিল এক প্রার্থী। সাথে ডজন দুই কর্মী। রেল লাইনের ধারে 'কলোনী'র বাসিন্দাদের সাথে কথা বিনিময় চলছে।]

কোরাস - ১— আপনি তো আমাদের প্রার্থীকে চেনেন, গত নির্বাচনে উনি জয়ী হয়েছিলেন। এবারও আমাদের প্রার্থী জিতবেন। প্রার্থীর নাম প্রাণকৃষ্ণ ব্যানার্জি।

ভোটার— তাই নাকি?

কোরাস - ২— উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবার জিতলে আপনাদের রেল লাইনের ধারে কষ্ট করে থাকতে হবে না। আপনাদের নিজস্ব ঘর হবে।

ভোটার— তাই নাকি?

কোরাস - ১— শুধু থাকার ব্যবস্থা নয়, জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবই আপনারা পাবেন। শুধু প্রাণদাদার জেতার অপেক্ষা।

ভোটার— তাই নাকি?

কোরাস - ২— তাহলে এই ঠিক থাকল, আপনি এবং আপনার পরিবার পরিজনরা আমাদের দলকে জেতাবেন।

ভোটার— আমার একটা সমস্যা আছে। আমার আঙুল কাটা। কী করে ভোট দেব?

কোরাস - ১— তাতে কী? রামরাজ্য গড়তে যাচ্ছি। এদেশে গণেশের মাথায় সার্জারি করে হাতির মাথা বসানো হয়েছিল। এটা কোন সমস্যা নাকি?

ভোটার— রাম নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

কোরাস - ২— আপনার আঙুল কাটা গেল কী করে?

ভোটার— অনেকদিন আগের ব্যাপার। ঠিক মনে করতে পারি না, বয়স কম ছিল।

কোরাস - ১– আঙুল কাটল কে বা কারা?

ভোটার– নাম মনে নেই, তবে যে কাটতে বলেছিল তার মাথায় মোটা টিকি গলায় মোটা পৈতে ছিল।

কোরাস - ২– রামরাজ্যে অপরাধীরা শাস্তি পাবেই।

ভোটার– রাম নামটাই চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আমার মাসতুতো দাদাকেও উনি খুন করেছেন।

কোরাস - ১– আরে সে রামবাবু তো খড়গপুরের গুণ্ডা, এখন জেলে আছে।

ভোটার– তাই নাকি?

প্রার্থী– তবুও নামগুলো নোট করে নাও। তোমরা তো কিছুই পারো না, ভোটে জিতে আমার খাটনি বাড়বে।

কোরাস - ১– যারা আপনার আঙুল কেটেছে আর আপনার দাদাকে মেরেছে তাদের নাম বলুন।

ভোটার– বললাম তো আমার দাদার মাথা কেটেছে রাম। যে আমার আঙুল কেটেছে তার নাম মনে নেই।

কোরাস– ঠিক আছে আপনার আর আপনার দাদার নাম বলুন।

ভোটার– আমার নাম তো একলব্য, আর আমার দাদার নাম শম্বুক।

কোরাস– এসব কী বলছ ভাই?

ভোটার– রামরাজ্য হলে আমার দাদার জীবন আর আমার আঙুল ফেরত পাবো তো?

—তিস্তা তোরসা - বিশেষ সংখ্যা- ২০০১

নাটক

একটি মাঝারি মাপের ঘর। ঘরে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাপ। একটি চেয়ার, সামনে একটি টেবিল, টেবিলে একটি ল্যান্ড ফোন। টেবিলের পেছনে দেওয়ালে ভগৎ সিং, পেরিয়ার এবং এক মধ্যবয়স্কা মহিলার, কোলে শিশু সহ ছবি, পাশে একটি বইভর্তি র‍্যাক

[সুকান্ত খবরের কাগজের পাত্রপাত্রী চাই বিজ্ঞাপন পড়ছে। সুকান্তর পরনে কমদামি কদিনের না কাচা পোষাক, চুল বড়, দাড়ি বহুদিন না-কাটা]

সুকান্ত ঃ গৌরবর্ণা, ২৬, গৃহকর্ম নিপুণা, শাণ্ডিল্য গোত্র, উচ্চবিত্ত পরিবার। উপযুক্ত পাত্র চাই— ধুৎ, এটা চলবে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সঙ্গীতে কুশলী, এম.এ. পাশ, শাণ্ডিল্য গোত্র, বয়স ২৮, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (উচ্চস্বরে) মা, একটু বাদে চা খাব। এখন তোমার বৌমাকে খুঁজছি। পাত্রী বয়স ৩৯, একটি কন্যাসহ ডিভোর্সী,কে.স.অ. (২৯ হাজার টাকা), গোত্র, বর্ণ, আয়, বয়স, ধর্ম বিচার্য নয়, সততাই কাম্য। মা পেয়ে গেছি। তোমার বৌমাকে পেয়ে গেছি। দেখে যাও। ভাবা যায়, এই সময়ে লিখছে— গোত্র, ধর্ম, আয়, বয়স, ধর্ম বিচার্য নয়। কিন্তু কে.স.অ.— টা কী? মা বলতে পারো কে.স.অ. টার মানে কী? (কিছুক্ষণ সময় নিয়ে) .... এইবার বুঝেছি— কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার, কে.স.অ. — মা পেয়ে গেছি তোমার বৌমাকে। আজই যোগাযোগ করতে হবে। দেরি করা সম্ভব নয়। কে.স.অ. আমাদের বাড়িতে বৌ হয়ে আসবে। ধর্ম, বর্ণ, বয়স, আয় তার কাছে গুরুত্বহীন। হা হা হা হা হা হা (ফোন বেজে উঠল)। কেন ফোন করছে আমাকে? (ফোন তুলে) — বলছি

অপর প্রান্ত থেকে - (মঞ্চের ডানদিকের সামনের দিক থেকে)

সুছন্দা ঃ সুছন্দা বলছি। তোমার হয়েছে কী বলো তো? আজ ২২ দিন হলো

দেশে ফিরেছি আর তোমার পাত্তা নেই। তোমার সেলফোনটাও বোধহয় নষ্ট হয়েছে। Does not exist বলছে। অনেক কষ্টে তোমার Land Line এর নম্বর টা পেলাম। ভেবেছ কী? Relation টা কি ভেঙে দিতে চাও? তোমার কোনও নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে?

সুকান্ত ঃ থাম থাম সুছন্দা।এমন প্রশ্নের ঝড় তুললে আমি কথা হারিয়ে ফেলবো। তুমি একবার এসো। সব কথা হয়তো বলবো।

সুছন্দা ঃ হয়তো মানে? আমার কাছে গোপন রাখার মতো কোন্ কথা তোমার কাছে জমা আছে?

সুকান্ত ঃ না-না, তা বলছি না। প্রায় দেড় বছর বাদে তোমাকে দেখতে পাব-এর থেকে আনন্দের কথা আর কী আছে?

সুছন্দা ঃ কবিদের নিয়ে এই সমস্যা। অন্যমনস্ক থাকাটাই তাদের একমাত্র অসুখ। ভানও হতে পারে।

সুকান্ত ঃ তুমি কি আসছো?

সুছন্দা ঃ আসবো তো বটেই। তোমার সাথে একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার।

সুকান্ত ঃ আমার একটা অনুরোধ রাখবে? আসার সময় কিছু খাবার আর দু-এক বোতল জল নিয়ে আসতে পারবে?

সুছন্দা ঃ খাবার? জল? তোমার হয়েছে টা কী? মাথা ঠিক আছে তো?

সুকান্ত ঃ এসো আগে, সব কথা জানতে পারবে।

[(মঞ্চের আলো নিভে যায়) (আবার আলো জ্বলে ওঠে)]

সুছন্দা ঃ (পোষাক সামান্য পরিবর্তিত। হাতে খাবার এবং জল। খাবার আর জল টেবিলে রেখে সুকান্তকে জড়িয়ে ধরে) আমার সোনামনি। ১৫ মাস বাদে দেখা, মনে হচ্ছে ১৫ বছর পার হয়ে গেছে। চিকাগো থেকে কতবার কল করেছি, ধরনি কেন সোনা আমার? ভেবেছ কি তোমার সুছন্দা কোনও এক সাহেবের সাথে প্রেম করছে? তোমার মতো এক মানুষ কবিমন নিয়ে যখন আমায় ভালোবেসেছে তা তো আমার কাছে এক বিরাট পাওনা।

সুকান্ত ঃ খাবার কী এনেছ দেখি? (খাবার গোগ্রাসে খাওয়ার আগে অনেক

পরিমাণে জল খায়)

সুছন্দা : তোমার কী হয়েছে বল তো? এমনভাবে জল খাচ্ছো যেন অনেকক্ষণ জল খাওনি। এমনভাবে খাবার খাচ্ছ যেন সকাল থেকে কিছুই খাওনি। তোমার লুকটাও কেমন বদলে গেছে। চুল-দাড়ি কাটোনি। গায়ে এমন গন্ধ পেলাম যাতে মনে হয় কদিন স্নান করোনি। ব্যাপারটা কী?

সুকান্ত : না তেমন কিছু না। তোমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

সুছন্দা : অবশ্যই ভাবতে হবে কারণ তোমার সাথে আমার রিলেশনটা আমি ব্রেক করতে চাই না।

সুকান্ত : রিলেশন? এইরকস অসম সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা বড় কঠিন কাজ। নানা সমস্যা নানা সময়ে মাথা চাড়া দেয়।

সুছন্দা : পরিস্কারভাবে কথা বলো। তুমি কদিন স্নান করোনি?

সুকান্ত : বেশ কদিন হলো।

সুছন্দা : কেন?

সুকান্ত : বেশ কদিন বাড়িওয়ালাকে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়নি। জলের লাইন কেটে দিয়েছে। ঘর ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে।

সুছন্দা : ঘর ভাড়া দাওনি কেন? তোমার চাকরি টা কি গেছে?

সুকান্ত : সেভাবে যায়নি। তবে বেশ কদিন যাইনি তাই উইদাউট পে তে আছি।

সুছন্দা : অফিস যাওনি কেন?

সুকান্ত : সে অনেক কথা।

সুছন্দা : অনেক কথাই জানতে চাই।

সুকান্ত : আর একটু জল খাই। খাবারও আছে, সিগারেটও দেখছি। এটুকুও খেয়ে নি।

সুছন্দা : তোমার তাড়াতাড়ি খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ কদিন ভালোভাবে খাওনি।

সুকান্ত : ছাড়ো এসব কথা। তোমার বিদেশে পড়াশুনার কতদূর এগোলে? এর পরে দেশেই থাকবে না এন.আর.আই হবে?

সুছন্দা ঃ তুমি প্রশ্ন এড়াতে চাইছ তো?

সুকান্ত ঃ বলো না তোমার কথা। তারপর আমি না হয় আমার কথা বলবো।

সুছন্দা ঃ বাড়িতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকব। তার ৬ মাসের মধ্যে ওখান থেকে এদেশে চলে আসবো। এখানে বেশ কয়েকটি ইনস্টিটিউট চাকরির আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিয়েছে। সম্ভবত আগামী শীতে দেশে এসে আমি চাকরি করবো আর তোমার সাথে বাকি জীবন কাটাবো।

সুকান্ত ঃ (স্বগতোক্তি) সে গুড়ে বালি।

সুছন্দা ঃ এবার বলো তোমার কথা।

সুকান্ত ঃ কী বলি বলো তো? গত পরশু রাতে ৩টে বিস্কুট আর জল খেয়েছি। ঘরে জল আর খাবার ছিল না। হোম ডেলিভারিতে যার কাছ থেকে খাবার নিতাম টাকা না দিতে পারায় সে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

সুছন্দা ঃ তোমার ১০টা কবিতার বই বাজারে রয়েছে তার রয়ালটি পাও না?

সুকান্ত ঃ কবিতার বইয়ের আবার রয়ালটি! সামান্য কিছু মাঝেমধ্যে আসতো এখন সম্পূর্ণ বন্ধ।

সুছন্দা ঃ তোমার বন্ধুরা কোথায়? বেশ কয়েকজন অনুগ্রাহী আছে জানতাম।

সুকান্ত ঃ কেউ আর শুকনো আধমরা গাছে জল দিতে চায় না। তাদের অনেকের চোখে আমার সাহচর্য বিপজ্জনক।

সুছন্দা ঃ ঠিক আছে। এ সমস্যাগুলো কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি বেশ কিছু পরিমাণ টাকা জমিয়েছি। সবই ওখানে পড়াশুনার ফাঁকে কাজ করে। তোমাকে দিয়ে যাব।

সুকান্ত ঃ কেন?

সুছন্দা ঃ কেন নয়? আমাদের যা সম্পর্ক বা সম্পর্ক হতে যাচ্ছে তাতে তোমার সমস্যা কি আমার বা আমাদের সমস্যা নয়?

সুকান্ত ঃ নাটক বা সিরিয়ালে এরকম হয়। তুমি কি বাড়িতে আমার ব্যাপারে কিছুই শোন নি?

সুছন্দা ঃ বাড়ির লোকজন বলতে তো কেবলমাত্র বাবা। আমি আসার কদিন বাদে দিল্লি গেল। শুনলাম লোকসভার টিকিট পাবার জন্য তদ্বির করতে গেছে। শিট্

সুকান্ত ঃ আর কিছু না?

সুছন্দা ঃ না। আর কিছু না। কী ব্যাপার বলো তো?

সুকান্ত ঃ তবে থাক। শুনে আর লাভ কী হবে?

সুছন্দা ঃ (বেশ রেগে গিয়ে) না-না, আমি শুনবোই। এখানে এসে রাতদিন কম্পিউটারে বসে কয়েকটা রিসার্চ পেপার তৈরি করছিলাম। আর তোমার কল-এর অপেক্ষায় ছিলাম। আমাদের এলাকা তো জানো। কেউ কারও খবর রাখতে চায় না। বড়লোক পাড়ায় নেইবারহুড গড়ে ওঠে না। শুধু তোমাদের গলির মুখে মনুদার সিগারেট-এর দোকান থেকে যখন সিগারেট -দেশলাই কিনছিলাম উনি প্রশ্ন করলেন— সুকু-র কাছে যাচ্ছ? আমি হ্যাঁ বলতে উনি বললেন— ছেলেটাকে দেখিস মা। ও আমাদের গর্ব। আমরা গরীব তো তাই ওর দেনা মেটাতে পারছি না, পারবোও না।

সুকান্ত ঃ মনুদা মানুষটা ভালো। বেশ কয়েকদিন ওর ছেলেকে দিয়ে আমাকে রোজ বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই পাঠিয়ে দিত। টাকা নিতো না। আমি ওর ছেলেকে ধমক মেরে ওসব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। অনেকদিন বাদে তোমার আনা সিগারেট খেলাম।

সুছন্দা ঃ অনেক আজেবাজে কথা বলে তুমি আসল কথাটা চেপে যাচ্ছ।

সুকান্ত ঃ কী কথা শোনাবো বলো?

(কবিতা পাঠ)

তখন সময়টা উত্তাল, বহুদ্বার খণ্ডিত হচ্ছে

ক্ষমতার পক্ষে যতটা নির্মমতা স্বাভাবিক তার বেশিই

লক্ষিত হচ্ছে দিকে দিকে।

[অন্ধকার অংশে সুকান্ত-সুছন্দা। দর্শকাসন থেকে কোরাসের দল মঞ্চে ঢুকছে। মঞ্চে ওঠার আগে তাদের মুখে স্লোগান]

সমস্বর ঃ সোনার টুকরো সোনার চাঁদ দেশকে করবে বরবাদ

[মঞ্চে নীরব থেকে শরীরি ভাষায় নিঃশব্দ স্লোগান দিতে থাকে। মঞ্চের ডানদিকে একটা টবে পোস্টার পুঁতে দিয়ে যায়। লেখা— সংরক্ষণ মানে মেধাহীন সমাজ]

কোরাস ঃ সোনার টুকরো সোনার চাঁদ

দেশকে করবে বরবাদ

[মঞ্চে একইভাবে নিঃশব্দ মিছিল। শরীরি ভাষা আগের মতোই।
পোস্টারটি তুলে নিয়ে যায়]

[একই পদ্ধতিতে হয় মিছিল দর্শকাসন থেকে মঞ্চে ওঠে। পোষাক সামান্য পরিবর্তিত]

কোরাস ঃ (স্লোগান) গরব্ সে কহো হাম হিন্দু হ্যায় - জয় শ্রীরাম।

(মিছিল একই কায়দায় মঞ্চে ওঠে। নিঃশব্দ শরীরি ভাষায় স্লোগানের ভঙ্গিমা বজায় থাকে। টবে পোস্টার লাগায়।)

কোরাস ঃ কোরান ছাড়ো নইলে ভারত ছাড়ো।

[২য় বার মিছিল একইভাবে মঞ্চে ওঠে। টব থেকে পোস্টার সহ টবটি নিয়ে চলে যায়]

[সম্পূর্ণ চটের বস্তার মধ্যে একটি দেহ নিয়ে ৪জন ঝুলিয়ে দোলাচ্ছে। দুজন লাঠি, রড় দিয়ে চটের বস্তায় ঝোলানো দেহটিকে মারছে।]

রামানুজ মুখার্জীঃ মার। যত জোরে পারবি মার। এমন মারবি যাতে সারাজীবন বেঁচে থাকবে অথচ নড়তে চড়তে পারবে না। যা পাপ করেছে আরও করতে চাইছে সব সুদে আসলে জমা দিক আজ। মার, মার।

কোরাস(১) ঃ মাথায় মারতে তো বারণ করেছেন স্যার।

রামানুজ ঃ না-না, মাথায় এক ঘাও মারবি না। মরে যেতে পারে। ও বেঁচে থেকে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে লোককে জানান দিকে যে একটা বেজাতের ছেলে রামানুজ মুখার্জীর মতো একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের একমাত্র

মেয়েকে ভালোবাসার গপ্পো শুনিয়ে ফুসলিয়ে বিয়ে করতে চাইছে। আর তার শাস্তি এরকমই হবে। (পিটুনি চলতে থাকে— হাতে একটি মদের বোতল এবং ন্যাপলা নিয়ে এক স্বাস্থ্যবান-এর প্রবেশ। মঞ্চের সামনের ডানদিকে ন্যাপলাটি রেখে মদ খাওয়া শুরু করে)

কোরাস(২) ঃ স্যার, কখন একে ছাড়বেন? কোথায় ফেলবেন?

রামানুজ ঃ তোদের ভাবতে হবে না। এসব কাজ অনেক করিয়েছি। শুনে রাখ তোরা– আমার শরীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রক্ত বইছে। যতদিন বেঁচে থাকবো আমি আমার, আমাদের হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ্যত্বের পরিচয় অমলিন রাখবো। তার ওপর আমি বাঙলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জীর বংশধর। বাঙলার বাঘ (কোরাসের ব্যাঘ্র গর্জন), ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছে আমার মেয়েটা। কত কষ্ট করে ওকে বড় করেছি। বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছি। আর এই ছোকরা নিজেকে কবি হিসাবে পরিচয় দেয়। নিজেকে প্রান্তিক বলে। মনুস্মৃতি, বেদ, গীতা, উপনিষদ-এর সমালোচনা করে। রামের রাজধর্ম এর মৃত্যুদণ্ড দেবে। আমরা তার পথ দেখাচ্ছি মাত্র। এবার মার বন্ধ কর। ঝুলিয়ে রাখ। শেষ কাজটা লালু করবে। ওর কাজ নিখুঁত।

[সামনে বসে থাকা লালু গ্লাসের মদ শেষ করে ন্যাপলা দিয়ে দেহটির পায়ে আঘাত করে]

লালু ঃ জয় শ্রীরাম

[মঞ্চের ওই অংশের আলো নিভে যায়। অপর অংশে আলো জ্বলে ওঠে]

সুকান্ত ঃ (একটা ক্রাচে ভর দিয়ে চেয়ার থেকে ওঠে) আমার পা'টা শ্রীরাম বন্দনায় চলেগেল। এটা কৃত্রিম। এটাকে জয়পুর লেগ বলা হয়। ৬ মাস হাসপাতালে ছিলাম। সারা শরীরে কতবার সার্জারি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

সুছন্দা ঃ আই উইল কিল হিম। ঐ লোকটা আমার বাইয়োলজিকাল ফাদার ছাড়া আর কিছুই না। আমি তখন ছোট। মা বাড়িতে থাকতেও বাবা কোনও কোনওদিন বাড়ি ফিরত না। মাকে বলতো দলের কাজে বাইরে যাচ্ছে। পরে জানা গেলো বহু মহিলার সাথে দলীয় ক্ষমতার জোরে রিলেশন রাখতো। এসব কথা মার সুইসাইড নোটে থাকতেও বাবাকে পুলিশ

ধরেনি। এরকম জঘন্য চরিত্র ক্রিমিনালকে পুলিশ, আইন-আদালত ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু আমি ছাড়বো না।

সুকান্ত ঃ ছাড়তে তোমাকে হবেই। তোমার জন্মদাতা বলে নয়। ক্ষমতা নামে এক অচলায়তনকে ভাঙ্গা অসম্ভব না হলেও কঠিন, বেশ কঠিন। নিজের অনুকে ভেঙ্গে পরমাণু তৈরি করে সুইসাইড স্কোয়াড বানাতে হবে। হাজার হাজার সুইসাইড স্কোয়াড।

সুছন্দা ঃ আমার পদবী মুখার্জী আর তোমার পদবী মণ্ডল— এটাই দুজনের সম্পর্ক স্থাপনে বাধা?

সুকান্ত ঃ এটাই প্রধান বাধা। কিন্তু এই বাঙলায় একথা জোরগলায় বলা যাবে না। ফিস্ ফিস্ করে বলতে হবে। প্রগতিশীল মানুষে ভরা রাজ্য তো, বলা হবে এসব উত্তরভারতে বা অন্য রাজ্যে হয়। এরাজ্যে জাতভেদ নেই। তুমি আসার আগে পাত্র-পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের পাতাটা দেখছিলাম। শুধু জাত নয়, দেবগণ, নরগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, কাশ্যপ গোত্র এইসব রাবিশে ভরা পাতা।

সুছন্দা ঃ এসব আগে তো কখনো ভাবিনি!

সুকান্ত ঃ ভাবা উচিত ছিল। ভাবতে দেওয়া হয়নি। নবজাগরণের অতিকথন আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। বিনয় ঘোষ লিখেছিলেনঃ কী এমন ঘটল যে নবজাগরণের দ্যুতি কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে পৌঁছল না!

সুছন্দা ঃ পশ্চিমে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গদের একটা ফারাক দেখতে পেয়েছি।

সুকান্ত ঃ ওদেশে কালো মানুষেরা লড়েছে ফলে আংশিক সফল হয়েছে। এদেশে লেনসন ম্যাণ্ডেলার জন্য চোখের জল ফেলা যায়, খাপ্ পঞ্চায়েতের জন্য বেশি কথা বলা হয় না।

সুছন্দা ঃ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নামে একটি ব্যবস্থা ছিল। তা কি এখনো আছে? গান্ধী বলেছিলেন— এ ঈশ্বরের দান।

সুকান্ত ঃ আছে, অনেক বেশিভাবেই আছে।

সুছন্দা ঃ কেউ কি লিখেছেন এ বিষয়ে?

সুকান্ত ঃ শিবরাম চক্রবর্তী শূদ্র না ব্রাহ্মণ প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদের নরখাদকদের সাথে

তুলনা করেছিলেন। ডি.ডি. কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য, বহু রচনা লিখেছেন। খুব একটা সুফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

সুছন্দা ঃ এই মডার্ন সময়ে, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এইসব চলা উচিত?

সুকান্ত ঃ তোমার আমার উচিত অনুচিত বোধ তো রাষ্ট্রনায়কদের বোধ না হতে পারে।

সুছন্দা ঃ তাহলে রাষ্ট্রনায়কদের নিরপেক্ষ বলা যাবে না।

সুকান্ত ঃ কাগজ-কলমে ওরা নিরপেক্ষ। কাজে একেবারেই নয়।

সুছন্দা ঃ ধুৎ। এসব তত্ত্বকথা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই অত্যাচারের পর তুমি বাঁচলে কীভাবে!

সুকান্ত ঃ সুছন্দা, একে বাঁচা বলে না। নিজের মৃতদেহ বয়ে বেড়ানো যে কী কঠিন তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই বোঝে না।

সুছন্দা ঃ আমি সারাজীবন তোমার পাশে থাকব।

সুকান্ত ঃ অবাস্তব চিন্তা। জেনে নিও আমি অক্ষম। সব অর্থে অক্ষম।

সুছন্দা ঃ শরীরটাই সব! মন বলে কিছুই নেই?

সুকান্ত ঃ জানি না। এ অবস্থায় কোনোদিন তো পড়ি নি।

সুছন্দা ঃ ওসব কথা পরে হবে। হাসপাতালে কতদিন ছিলে?
খরচ সামলালো কারা?

সুকান্ত ঃ সত্যি এখনো তা জানি না। পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে ছিলাম। ১০-১৫ দিন অন্তর ওটি তে কয়েক ঘণ্টা আমার শরীরে ডাক্তারদের কাটাছেঁড়া আর তারপর আধা ঘুম সাথী করে কেবিনে ফিরে আসা—এই চলল ৫ মাসের মতো।

সুছন্দা ঃ খরচ? যতদূর জানি এখানে সরকারি হাসপাতালগুলো কম খরচের নার্সিং হোম।

সুকান্ত ঃ নার্স-ডাক্তারদের কাছে জানতে চেয়েছি। তারা উত্তর দেননি। বেশ কিছুদিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম।

সুছন্দা ঃ তারপর?

সুকান্ত ঃ ঘরে ফিরেই পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ আর সাংবাদিক সম্মেলন।

সুছন্দা ঃ সে কি!

ব্রজ মুখার্জী

(পুলিশ অফিসার) ঃ কনগ্রাচুলেশন সুকান্ত বাবু। আপনি সুস্থ হয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরেছেন এ তো আনন্দের কথা।

সুকান্ত ঃ কতটা সুস্থ হয়েছে আমি জানি, তবে নিরাপদে আছি একথা বলি কী করে?

ব্রজ ঃ মানে?

সুকান্ত ঃ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের ভয়ঙ্কর দুঁদে অফিসার যার থার্ড ডিগ্রির অত্যাচার ভুক্তভোগীরা চিরজীবন মনে রাখে, সেই লোকটি যখন আমার ছায়ার দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে তখন নিজেকে নিরাপদ ভাবা বোকামী নয় কি?

ব্রজ ঃ পেটের জ্বালায় পুলিশের চাকরি নেওয়ার পর এধরনের গালাগালি অনেক শুনতে হয়েছে।

সুকান্ত ঃ চামড়া মোটা তাই গায়ে লাগেনি। দাঁড়ান– সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন। ওঁদের সাথে কথা বলতে দিন।

সাংবাদিকগণ ঃ কনগ্রাচুলেশনস সুকান্ত বাবু।

সুকান্ত ঃ ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকুন।

সাংবাদিক ১ ঃ আপনি প্রায় ৫ মাস হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সাথে লড়াই করে জিতে ফিরলেন। এই সময়ে আপনি কেন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে চান নি?

সুকান্ত ঃ যদিও আমি জানতাম না যে সাংবাদিকরা আমার সাথে কথা বলতে চাইছিলেন তবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বোধহয় এই দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন।

সাংবাদিক ২ ঃ পুলিশ মহলের বক্তব্য যে আপনি আপনার উপর হামলাকারীদের

সম্পর্কে কিছুই পুলিশকে জানাতে অস্বীকার করেছেন!

সুকান্ত ঃ এটা ঠিক খবর।

সাংবাদিক ৩ ঃ পুলিশের উপর আপনার ভরসা নেই এটাই কি কারণ?

সুকান্ত ঃ আপনি ঠিকই ধরেছেন।

সাংবাদিক ১ ঃ কারা আপনার উপর এই মারাত্মক হামলা করেছিল তাদের আপনি চেনেন?

সুকান্ত ঃ কমবেশী সবাইকেই চিনি।

সাংবাদিক ১ ঃ তাদের নাম জানতে পারি কি?

সুকান্ত ঃ না— একেবারেই না।

সাংবদিক ঃ আশ্চর্য, আপনি কি চান না যে অপরাধীরা শাস্তি পাক!

সুকান্ত ঃ হ্যাঁ, চাই।

সাংবাদিক ঃ পুলিশ ছাড়া ওদের শাস্তি দেবে কে বা কারা?

সুকান্ত ঃ আমি এবং আমরা।

সাংবাদিক ঃ এই আমরা বলতে আপনি কাদের মনে করছেন?

সুকান্ত ঃ রোজ যাঁরা এই ধরনের বা এই কারণে মার খায়।

সাংবাদিক ঃ আপনি কি আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন?

সুকান্ত ঃ নিত্যদিন নেতা-নেত্রীরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। দু-একদিন আমরাই বা তুলব না কেন?

সাংবাদিক ঃ আপনি কি বিপ্লবের পরিকল্পনা করছেন? বিপ্লবী দল খুলবেন?

সুকান্ত ঃ আমার সাধ আছে, সাধ্য নেই।

সাংবাদিক ঃ আপনার ঘরে ভগৎ সিং, আপনার মা এবং এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের ছবি আছে। ঐ দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটি কে?

সুকান্ত ঃ ওনার নাম রামস্বামী পেরিয়ার। তামিলনাড়ুতে গত শতাব্দীতে অস্পৃশ্যতা, জাতভেদ ব্যবস্থা, ঈশ্বর বিশ্বাস-এসবের বিরুদ্ধে এবং আত্মমর্যাদা এবং সমাজবাদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। মাফ করবেন,

আমি পেরিয়ারকে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলে ২ ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে। তার থেকে ভালো হয় আপনারা গুগল বা উইকিপিডিয়ায় পেরিয়ার-এর নাম লিখে সার্চ করলে কমবেশি সঠিক তথ্য পেয়ে যাবেন।। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আজকাল শুনছি নেট থেকে ডাউনলোড করে কপি পেস্ট করেই পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী পাওয়া যাচ্ছে।

সাংবাদিক ঃ নাইস জোক।

ব্রজ ঃ রিয়েলি, নাইস জোক।

সুকান্ত ঃ বিস্ময়ের ব্যাপার, পুলিশও রসিকতা বুঝছে!

সাংবাদিক ঃ আপনার দু-একটি ছবি নিতে চাইছি। বিশেষত আপনার যে পাটা বাদ গেছে।

সুকান্ত ঃ দুঃখিত, নিজের শরীরে ক্ষত বিক্রি করে জীবন কাটাতে পারব না।এটা আমার পরাজয়ের চিহ্ন। যেদিন জিতব সেদিন আসবেন। যত পারবেন ছবি তুলবেন।

(ব্রজ ও এক সাংবাদিকের চুপিসাড়ে কথা)

সাংবাদিক ঃ আপনি কিন্তু পুলিশকে অপরাধীদের হোয়ার অ্যাবাউট টা না বলে আইন বিরুদ্ধ কাজ করছেন।

সুকান্ত ঃ সেটা আমি, আমরা আইনের সাথে বুঝে নেব। তবে প্রশ্ন হবে যে পুলিশ সাধারণত কোনও জনহিতকর কাজ করে না।

ব্রজ ঃ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিল এটা কি আপনি জানেন?

সুকান্ত ঃ জানি। এটাও জানি যে ওরা ডেথ সার্টিফিকেট আর মরে গেলে যাতে পোস্টমর্টেম না হয় তার চেষ্টা চালাচ্ছিল। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, গ্রুপ ডি কর্মচারিরা বাধা না দিলে আমি এখানে আজ আসতে পারতাম না। ব্যস- শেষ করলাম। আর কোনও প্রশ্ন নয়।

ব্রজ ঃ আজ যে অপমান করলেন তার ফল কিন্তু আপনাকে ভোগ করতে হবে।

সুকান্ত ঃ মৃত্যুর দরওয়াজা থেকে ফিরে এসে বুঝেছি জীবন কত সুন্দর। বেঁচে

থাকলে আপনাদের মুখে পেচ্ছাপ করতে পারি।

সুছন্দা ঃ পুলিশ আর সাংবাদিকদের তো চটালে, ফল কী হলো?

সুকান্ত ঃ সাংবাদিকরা যা দৈনিক পত্রিকায় ছাপলো তার মূল কথা— পুলিশের সহায়তা নেব না- সুকান্ত। পুলিশ-দুষ্কৃতির আঁতাত প্রভৃতি।

সুছন্দা ঃ পুলিশ হাল ছেড়ে দিল?

সুকান্ত ঃ না-না, যাকে অর্থনৈতিক অবরোধ বলে তাই করলো। আমার অফিসে গিয়ে ছুটি থাকা সত্ত্বেও উইদাউট পে করলো। প্রকাশকদের কাছে গিয়ে রয়ালটির টাকা যাতে না দেয় তার হুমকি দিল। বাড়িওয়ালাকে থানায় ডেকে আমাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করলো, আমার কয়েকজন বন্ধুকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসালো, সবার কাছে জানতে চাইলো কে বা কারা আমার চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছে?

সুছন্দা ঃ সত্যি তুমি জান না যে কারা এত টাকা দিয়েছে?

সুকান্ত ঃ আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চিত না হয়ে বলি কী করে?

(দরজায় দুজনের প্রবেশ)

বৃদ্ধ ঃ আসতে পারি?

২য় বৃদ্ধ ঃ আসতে পারি?

সুকান্ত ঃ এসেই যখন পড়েছেন অনুমতির কি প্রয়োজন?

বৃদ্ধ(মিলন মুখার্জী)ঃ আমি মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি।

সুকান্ত ঃ আপনার পরিচয় এবং আসার কারণ জানাবেন

মিলন ঃ আমি আইনজীবী। জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের দশ বছর সভাপতি ছিলাম।

সুকান্ত ঃ আমার তো কোনও উকিল দরকার নেই!

২য় বৃদ্ধ (মুহুরী)ঃ উনি দুবার বিধায়ক হয়েছিলেন।

সুকান্ত ঃ তাতে আমার কী হবে?

মিলন ঃ আমি শ্রীমতী মল্লিকা মুখার্জীর সাথে দেখা করতে এসেছি।

সুকান্ত ঃ (সময় নিল) ওই নামে এখানে কেউ থাকেন না।

সুছন্দা ঃ কী হচ্ছে কি? ওনাকে বলতে দাও।

মিলন ঃ তুমি কে মা?

সুছন্দা ঃ আমি সুছন্দা, ওর বন্ধু।

মিলন ঃ সুছন্দার পুরো নাম কী মা?

সুছন্দা ঃ সুছন্দা মুখার্জী।

মিলন ঃ আবার মুখার্জী?(মাথায় হাত)

সুকান্ত ঃ পরিস্কার করে বলুন তো আপনি কী কারণে এসেছেন?

মিলন ঃ মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত জমিদার সদাশিব মুখার্জী আমার অগ্রজ বন্ধু। অভিভাবকের মতো ছিলেন। আইনজীবী হিসাবে আমি তাঁর সম্পত্তি বিষয়ক মামলা আর সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশুনা করতাম। মহৎ হৃদয় মানুষ ছিলেন তিনি।

সুকান্ত ঃ আপনার ঐ সদাশিবের জীবনী শুনে আমার কী উপকারটি হবে?

মিলন ঃ শ্রীমতী মল্লিকা মুখার্জীর সাথে দেখা হলে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেত।

সুকান্ত ঃ বলেছি তো মল্লিকা মুখার্জী নামে এখানে কেউই থাকেন না।

সুছন্দা ঃ আমি একটু বলি। এখানে মল্লিকা মণ্ডল থাকতেন। উনি কয়েকবছর আগে মারা গেছেন।

মিলন ঃ আহা রে !

সুকান্ত ঃ মল্লিকা মণ্ডল জীবিত আছেন। আমার বা আমাদের কবিতার মতো তিনি অমর। আমার প্রতিদিনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে আমি আমার মা মল্লিকা মণ্ডলকে খুঁজে পাই। যখনই কেউ বলে মল্লিকা মণ্ডল মারা গেছেন তখন আমি মা-এর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ঐ বোকা লোকগুলোকে ব্যঙ্গ করি। যখন কোনও ঘটনায় বিমর্ষ হয়ে পড়ি মাকে জিজ্ঞাসা করলেই বলেন— এর থেকে কত বড় সমস্যায় তুই আর আমি পড়েছিলাম, উৎরে গেছি তো।

মিলন ঃ মল্লিকা দেবীর ছবি? এই ব্যাগ থেকে সেই ছবিটা বের করো তো

মুহুরি ঃ এই যে স্যার, যত্ন করে আলাদা খোপে রেখে দিয়েছি।

মিলন ঃ (দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখে) যাক সমস্যার সমাধান হলো। বাপরে, মাথা থেকে বোঝা নামল।

সুকান্ত ঃ ও মশাই, আপনি কিন্তু আপনার এখানে আসার কারণ জানান নি।

মিলন ঃ একটু সময় দিতে হবে বাবা। আগেই বলেছি মহৎ হৃদয় সদাশিব মুখার্জী মুর্শিদাবাদের বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মায়া মুখার্জী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তিনি জীবৎকালেই আমাকে তাঁর সম্পত্তির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করেন এবং দুই পুত্র এবং দুই কন্যার মধ্যে সমান পরিমাণে ভাগ করে দেন। যেহেতু তার এক পুত্র সন্তানের অপঘাতে মৃত্যু হয় ...

সুকান্ত ঃ অপঘাতে?

মিলন ঃ হ্যাঁ, অপঘাতে। ঐ পুত্র সুরজিৎ মুখার্জীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মল্লিকা মুখার্জী ওরফে মল্লিকা মণ্ডল সম্পত্তির ঐ অংশের মালিক হন। ঐ ওয়ারিশনের মধ্যে যে কারোরই অবর্তমানে (মৃত্যু হলে) তাঁর সন্তান বা সন্তানদের মধ্যে সমান পরিমাণে সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যর প্রাপ্য অংশের অধিকারী বা অধিকারিণী হইবেক। সেই কারণে মল্লিকা মুখার্জী/মণ্ডলের অবর্তমানে তাঁর সন্তান সুকান্ত মণ্ডলকে তার প্রাপ্য অর্থ দেওয়া হউক।

সুকান্ত ঃ আপনি এখন কী করতে চাইছেন?

মিলন ঃ তোমার— বাবা, তোমাকে তুমিই বলি?

সুকান্ত ঃ হ্যাঁ, বলুন।

মিলন ঃ আমারও বয়স হয়েছে। হার্টের ব্যামো আছে। আমি আর কতদিন বাঁচব? এই দায় থেকে আমাকে মুক্ত করো।

সুকান্ত ঃ ঐ সম্পত্তির অন্য ভাগীদাররা টাকা পেয়ে গেছেন?

মিলন ঃ হ্যাঁ।

সুকান্ত ঃ তাঁরা এই টাকা পাওয়ার আগেই আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন ছিলেন?

মিলন ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এরা সকলেই সম্পন্ন ছিল। উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত। এই

টাকা তাদের আরও সম্পন্ন করে দিল।

সুকান্ত ঃ আর মল্লিকা মণ্ডল কী করেছিলেন? শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার পর একটি ১ বছরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাবুদের বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে পেট চালাতেন। যৌবনে পা রাখা একটি মেয়ে চারিদিকের নোংরামির হাতছানিকে এড়িয়ে একমাত্র সন্তানকে বড় করতে গিয়ে নিজের খাবার না খেয়ে সন্তানকে দিতে দিতে রোগে আক্রান্ত হলেন এবং একদিন চলেও গেলেন। তাঁর যুবক পুত্রের কাছে তখন না ছিল বংশমর্যাদা না ছিল বেঁচে থাকার রসদ।

মিলন ঃ আমি বাপু আইনের লোক। পারিবারিক জটিলতা আর আবেগে আমার জড়িয়ে পড়া ঠিক না।

সুকান্ত ঃ জটিলতা? মল্লিকা মণ্ডল তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন এটা জানেন?

মিলন ঃ হ্যাঁ, আমি সে সময় সদাশিবদার সাথে সদরে একটা মামলার জন্য গিয়েছিলাম।

সুকান্ত ঃ ফিরে এসে কী হয়েছিল?

মিলন ঃ জানি না।

সুকান্ত ঃ জানেন সবই। ঐ বাড়ির নাড়িনক্ষত্র জানেন আর এই কথা জানেন না? শুনুন সে কথা আবার। সুছন্দা তুমিও শোনো।

সদাশিব ঃ গিন্নী! এটা তুমি কী করলে? সুরজিৎ আমাদের কাছে গোপন করে এক শূদ্রর মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে রাজনীতি করে, অজ্ঞাতবাসে থাকে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে তার বিরোধ আছে। সে আমার সন্তান সেটা মানুষজনকে বলতে আমার লজ্জা হয়। সে আবার 'নমো'র মেয়েকে বিয়ে করে একটি সন্তান সহ তোমার কাছে পাঠিয়েছে ছেলের নাম দেওয়ার জন্য? তুমি নাম দিয়েছিলে সুকান্ত! বাঃ বাঃ। তুমি কি আশা করো ওর হাতের রান্না আমি খাব? সমস্ত জেলায় আমার মান ইজ্জত একটা ঘটনায় ডুবে গেলো। ৪/৫দিন আমি বাড়ি ছিলাম না। এর মধ্যে এই অঘটন! কাল বামুন ঠাকুরকে ডাকছি। একটি প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে। কাল সুর্যোদয়ের পর যেন

ঐ মেয়েটিকে এই বাড়িতে না দেখি। আমার মতো ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ব্রাহ্মণ এ জেলায় কম আছে এটা মনে রেখো।

সুকান্ত ঃ মিলন মুখার্জী মশাই— আপনি এসব জানতেন না?

মিলন ঃ না, মানে এতটা তো শুনিনি। তবে বৌদি তো মহৎ হৃদয়ের মত কাজ করেছেন। কোন পক্ষপাতিত্ব করেন নি।

সুকান্ত ঃ মায়েদের, মেয়েদের হৃদয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহৎ-ই হয়।

মিলন ঃ এরপর কী করবে বলো বাবা?

সুকান্ত ঃ আপনি, শুনলাম বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। এম.এল.এ.ও ছিলেন। যাই হোক মার কল্যাণে বর্তমান না হোক একজন প্রাক্তন বিধায়কের পায়ের ধুলো এ বাড়িতে পড়লো। আপনি তো দেশ-দুনিয়ার খবর রাখেন। কোন্ যুক্তিতে ব্রাহ্মণ সন্তান মুখার্জী সুরজিৎ-এর সাথে শূদ্র মণ্ডল মল্লিকার বিয়ে হলে মল্লিকা মণ্ডলকে সারাজীবন লোকের বাড়িতে নোংরা পরিষ্কার করতে হবে? কোন যুক্তিতে মুখার্জী সুছন্দার প্রেমিক মণ্ডল সুকান্তকে সারাজীবন হুইলচেয়ারে বসে থাকতে হবে? আপনাদের আইন নাকি পক্ষপাতহীন? সকলের, সব মানব মানবীর সমান অধিকার। শুনুন, আপনি যত তাড়াতাড়ি আপনার কাজ সেরে এখান থেকে বিদায় হতে পারেন ততই ভালো। আপনাদের চা-ও খাওয়াতে পারলাম না বলে মার্জনা চাইছি।

মিলন ঃ তোমার রাগ বা অভিমানের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। বেশি কিছুই কাজ নয়। আমার কাছে কয়েকটি লিগ্যাল পেপার আছে তাতে সই করতে হবে। (সুছন্দা) মা— তোমাকে সাক্ষী হিসাবে সই করতে হবে।আর সম্পত্তির অর্থ মূল্য হিসাবে কিছু টাকার চেক আছে তা নিয়ে নিলেই আমার দায়মুক্ত।

সুকান্ত ঃ লিগ্যাল পেপারে কী লেখা আছে? টাকার পরিমাণটাই বা কতো?

মিলন ঃ কিছুই না। এই যে, আমি সুকান্ত মুখার্জী/মণ্ডল পিতা স্বর্গত সুরজিৎ মুখার্জী, মাতা মল্লিকা মুখার্জী/মণ্ডলের একমাত্র পুত্র সন্তান উত্তরাধিকার

সূত্রে পাওয়া ৮৮ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলাম।

সুকান্ত ঃ (কাগজগুলো চেকটা হাতে নেয়, সুছন্দাকেও দেখায়) আপনাদের কাগজপত্র দেখলাম। আমার বায়োলজিক্যাল ফাদার মুখার্জী সুরজিৎ অজ্ঞাতবাস থেকে গোপন চিঠিতে তাঁর মাকে মল্লিকা মণ্ডল এবং তাঁর সন্তানের কথা লিখেছিলেন। এরপরেও তাঁর সাথে কয়েকবার মল্লিকা মণ্ডল-এর দেখা হয়। এরপর তিনি গ্রেফতার হন। জেলের মধ্যে পুলিশের অত্যাচারে তাঁর প্রাণ যায়। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কিন্তু আমার সর্বজনপ্রিয় ফাদার মুখার্জী সুরজিতকে বলি— ও মুখার্জী মশাই, সারাজীবন বামপন্থী রাজনীতি করলেন, ত্যাগ আন্তরিকতায় খামতি ছিল না। জেলের মধ্যে জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন আপ্ত পনার কথা ও কাজের মধ্যে দূরত্ব ছিল না। কিন্তু মণ্ডল-মুখার্জীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাঝখানে যে বিরাট দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে, মণ্ডল, বিশ্বাস, কিস্কু, সোরেন, মাহাতো, রহমৎ, শাকিনা রা যে দিনের পর দিন এ সমাজের প্রান্তের দিকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের দিকে নজর না দিয়ে কোন্ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনারা? শুনুন উকিল মশাই, সুরজিৎ মুখার্জী আমার জন্মদাতা তা আমি অস্বীকার করি না কিন্তু একইসাথে মল্লিকা মণ্ডল আমার মা ও বাবা। পিতামাতা সন্তানের দায়িত্ব নিলে যা করে থাকেন মল্লিকা মণ্ডল একাই তাই করেছেন। আমি মুখার্জী সুরজিৎ-এর পিতৃত্বকে অস্বীকার করছি। সুরজিৎ মুখার্জীর প্রতি আমার অভিমান আছে। দু-একটা জায়গায় মতভেদ আছে তবুও তিনি বেঁচে থাকলে, আমি নিশ্চিত যা করতেন আমি তাই-ই করছি। সে কাজ করার আগে তিনি যা বলতেন আমি তাই বলছি— মণ্ডল, বিশ্বাস কিস্কু, সোরেন, মাহাতো, রহমত, শাকিনা সহ অসংখ্য গরীব চাষির রক্ত চুষে বানানো জমিদারির টাকার কোনও অংশ ছুঁতে আমার ঘৃণা হয়।

[লিগ্যাল পেপার, চেক, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উপরে দিকে ছুঁড়ে দিল সুকান্ত]